Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সেক্যুলারিজম নাকি শারীয়াহ কোনটা উত্তম? কেনো উত্তম?

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সালসাবিল আনজুম

রোলঃ 227020061

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সেক্যুলারিজম নাকি শারীয়াহ কোনটা উত্তম? কেনো উত্তম?

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সালসাবিল আনজুম

রোলঃ 227020061

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সেক্যুলারিজম নাকি শারীয়াহ কোনটা উত্তম? কেনো উত্তম? " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সালসাবিল আনজুম, আইডিঃ 227020061 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ সেক্যুলারিজম নাকি শারীয়াহ কোনটা উত্তম? কেনো উত্তম? ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

সালসাবিল
আনজুম

(স্বাক্ষর)

সালসাবিল আনজুম

আইডিঃ 227020061

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

ওয়ার্ল্ডভিউ 7

মর্ডানিটি..9

সেক্যুলেরিজম কী ও কেনো? 11

সেক্যুলারিজমের ইতিহাস 14

সেক্যুলারিজমের মৌলিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য.. 15

সেকুলারিজমের তিনটি মারণঘাতী অস্ত্র.. 15

সেক্যুলারিজম প্রসারতায় উপায়-উপকরণ 15

বিশ্বব্যাপী সেক্যুলারিজম চর্চার ফল 25

বাংলাদেশে সেক্যুলার ধর্মচর্চার ফল 34

সেক্যুলারিজমের আদলে দুই মতবাদ:সমকামিতা ও ফেমিনিজম.................................... 35

সমকামিতা.. 35

ফেমিনিজম বা নারীবাদ 46

দুইয়ে দুইয়ে চার নাকি পাঁচ?.. 52

ধর্মের অপব্যাখ্যা' - ব্যাখ্যা দেবে কে? 55

সেক্যুলারিজমের নামে ভণ্ডতা 56

শারীয়াহ.. 58

শারীয়াহর উৎস.. 59

শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলাম 59

শারীয়াহ শাসন ও শাসনব্যবস্থার মূলনীতি 65

প্রথম মূলনীতি : সার্বভৌমত্ব আল্লাহর 67

আল্লাহর আইনের বিপরীত বিচার করার বিধান.. 74

কাফির, ফাসিক ও জালিম বিচারক কারা? 77

দ্বিতীয় মূলনীতি: শুরা ও পরামর্শ 78

শুরার গুরুত্ব 79

শুরার শরয়ি হুকুম 81

নবুওয়াতের যুগে ও খুলাফায়ে রাশিদার যুগে পরামর্শ.. 85

পরামর্শ করার পদ্ধতি 87

তৃতীয় মূলনীতি : ন্যায়পরায়ণতা.. 88

চতুর্থ মূলনীতি: সাম্য ও সমতা 92

দাস-দাসীর ব্যাপারে ইসলামের সাম্যনীতি 96

মিরাসি সম্পত্তিতে নারীদের অধিকার 105

নারীদের সাক্ষ্যের মূল্যায়ন.. 106

পঞ্চম মূলনীতি : আনুগত্য ও মান্যতা.. 109

ষষ্ঠ মূলনীতি : বাইআত 116

বাইআতের গুরুত্ব 118

ইসলামি রাষ্ট্রপ্রধান.. 119

মুসলিম শাসকের দায়িত্বসমূহ.. 119

ইসলামের দন্ডবিধি 122

একটি বিশেষ মাসআলা 124

শরীয়াহ আইন কী অমানবিক নাকি সকলের জন্যই কল্যাণকর?.. 144

শরীয়াহ নিয়ে ছয়টি ভুল ধারণা.. 146

শারীয়াহ'ই জরুরত!.. 159

সমগ্র বিশ্বে ইসলাম প্রচার-প্রসার করা.. 169

ইসলাম প্রচার-প্রসারের বিভিন্ন মাধ্যম.. 170

بسم الله الرحمن الرحي

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি আসমান ও জমিনের একচ্ছত্র অধিপতি, যিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু, যিনি এক ও ও অদ্বিতীয়, অমুখাপেক্ষী, অপ্রতিরোধ্য, সার্বভৌম। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই। আমরা তাঁর কাছ থেকেই এসেছি এবং তাঁর কাছেই আমাদের চূড়ান্ত গন্তব্য। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবার ও তাঁর সাহাবিদের ওপর।

প্রত্যেক যুগেই ইসলামের বিধান মেনে চলার পথে নানান প্রতিবন্ধকতা এসেছে এবং আসবে। বর্তমান যুগে ইসলাম পরিপূর্ণরূপে মেনে চলার পথে অন্যতম বড় প্রতিবন্ধক হিসেবে আবির্ভাব ঘটেছে সেক্যুলারিজম। ধর্মের সাথে এক দীর্ঘ ঐতিহাসিক যুদ্ধের পর সেকুলার সংস্কৃতি বর্তমান পশ্চিমা বিশ্বের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। পশ্চিমা সমাজের রাজনীতি ও আইন-কানুনের উপর সেকুলারিজমের প্রাধান্য একচ্ছত্র। এমনকি খ্রিস্টধর্মের উপরও সেকুলারিজমের নিয়ন্ত্রণ। বিজয়ী এ সংস্কৃতি কেবল ধর্মকে দূরে সরিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, বরং মানুষকে ধর্মত্যাগে, ধর্ম থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে এবং ধর্মের ব্যাপারে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনেও ভূমিকা রেখেছে।

ধর্মের উপর সেকুলারিজমের আক্রমণ এতই বেড়ে গিয়েছে যে, মানুষ ধারণা করতে শুরু করেছে, পশ্চিমা সমাজে ধর্মের অস্তিত্ব চলে যাওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র। সেকুলারিজমের এই উত্থানের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হবে ধর্ম বিলীন হয়ে যাওয়া।

পশ্চিমে ধর্মের সাথে সেকুলারিজমের এ সংঘাত এখনও বন্ধ হয়নি। বরং সমগ্র বিশ্বে সম্ভাব্য সকল উপায়ে ছড়িয়ে পড়েছে এবং মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র প্রভাব বিস্তার করেছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলিমদের উপর এর বড় মাত্রার প্রভাব দেখা গিয়েছে। কিছু মানুষ মনে করে, পশ্চিমা বিশ্বে সেকুলারিজম যে ভূমিকা রেখেছে, মুসলিম বিশ্বেও একই ভূমিকা রাখবে।

কিন্তু ইসলাম তো খ্রিস্টধর্ম নয়। মুসলিমদের হৃদয়ে দ্বীনের অবস্থা পশ্চিমা সমাজের মতো নয়। ইউরোপের ইতিহাসে ধর্মের যে সংকট তার সাথে মুসলিমরা পরিচিত নয়। তাই মুসলিম বিশ্বে এসে সেকুলারিজম একটা সংকটে পড়ে গিয়েছে।

এখানে সংকটটা মূলত ইসলামের সাথে সেকুলারিজমের দ্বন্দ্বের জায়গা থেকে। সেকুলারিজম এমন এক নমুনা যা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। এ দুইয়ের মাঝে সমন্বয় করা সম্ভব নয়। একটা সেক্যুলার নীতির অধীনে ইসলাম ব্যক্তিগত বাছাইয়ের বিষয় হওয়া সম্ভব নয়। ইসলামে এটি অকল্পনীয়। জীবনের ব্যবহারিক দিকগুলো থেকে ইসলামকে সরিয়ে দিয়ে মুসলিমরা দীন থেকে দূরে জীবনযাপন করবে এমনটা ভাবাও যায় না।

মুসলিম সমাজ থেকে বিরোধ এবং প্রত্যাখ্যান বেশি পরিমাণে পাওয়ার পর সেক্যুলারিজমের এ সংকট আরো তীব্র হয়েছে। সেকুলাররা মুসলিম সমাজে এটি উপলব্ধি করেছে। এই সংকটে তারা কী ভূমিকা রাখবে তা নিয়ে তাদের নানা রকম অবস্থান দেখা যায়। কোনো কোনো চিন্তাবিদ তো সেকুলারিজম পরিভাষা বাদ দিয়ে ভিন্ন পরিভাষা গ্রহণেরও আহ্বান জানিয়েছে।

এ সংকট থেকে উত্তরণের জন্য সবচেয়ে ফলপ্রসূ যে ভূমিকা সেক্যুলাররা নিয়েছে তা হলো সরাসরি ইসলামের বিধি-বিধান অস্বীকার করা থেকে দূরে থাকা। এই প্রচেষ্টায় তারা চালিয়ে যাচ্ছে।মুসলিমদের এ সংকট থেকে মুক্তির জন্য আবারো ফিরে যেতে হবে ইসলামী সোনালী যুগে। যে যুগে মুসলমানরা শান্তি ও ন্যায়নিষ্ঠার জীবনযাপন করছিল।আমাদের ফিরে যেতে হবে শরীয়াহ'র কাছে।শুধু মুসলিম নয়, অমুসলিমদের জন্যও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় আমাদের ফিরে যেতে হবে শারীয়াহ’র দিকে।

'সেক্যুলারিজম নাকি শরীয়াহ? কোনটি উত্তম?' আমাদের এই শীর্ষক আলোচ্য বিষয়টি ভালোভাবে বুঝার জন্য দুইটি পরিভাষা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা জরুরি। পরিভাষা দুটি হলো 'ওয়ার্ল্ডভিউ' এবং 'মডার্নিটি'। তাই মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে নিম্নে এই দুইটি বিষয়ে প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা তুলে ধরা হলো।

ওয়ার্ল্ডভিউ

ইসলামের আবির্ভাবের আগে মক্কার কুরাইশদের একটা দ্বীন ছিল।বিশ্বাস ছিল।মানুষ সম্পর্কে, জীবন সম্পর্কে, মহাবিশ্ব সম্পর্কে, স্রষ্টা সম্পর্কে।তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করত কিন্তু তারা আখিরাতে বিশ্বাসী ছিল না। তাদের কিছু নির্দিষ্ট বিশ্বাস ও জীবনযাপনের নির্দিষ্ট পদ্ধতি ছিল।সমাজ ও শাসনের নির্দিষ্ট কাঠামো ছিল। মূল্যবোধ, ভালো-মন্দের সংজ্ঞায়ন, জীবন বিধান বিশ্বাসের নির্দিষ্ট কাঠামো।তাদের এই বিশ্বাসগুলোর ব্যাপারে আমরা কোন শব্দ ব্যবহার করতে পারি? আকিদাহ।যদিও তাদের আকিদাহ ভুল ছিল কিন্তু আকিদাহ ছিল।

তাদের বিশ্বকে দেখার একটি দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। এটাকেই বলে **“ওয়ার্ল্ডভিউ”**।

শব্দটার ভালো কোন বাংলা হয় না। **“বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি”** এটি ভালো অনুবাদ না। ওয়ার্ল্ডভিউ শব্দটি ইংরেজি অর্থ থেকেও ভালো করে প্রকাশ পায় না। এটির বেসিক্যালি অর্থ হলো মানুষের ওইসব মৌলিক বিশ্বাস এবং পূর্ব ধারণা যেগুলো সে স্বতঃসিদ্ধ মনে করে। মানুষের এমন কিছু বিশ্বাস থাকে এমন কিছু ধারণা থাকে যেগুলো স্বপ্রমাণিত মনে করে এবং এগুলোর ভিত্তিতে সে বাকিগুলোকে বোঝার চেষ্টা করে,বাকি সব কিছুকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। আমার সব কাজ এবং সিদ্ধান্তের ভিত্তি হয়, আমাদের এই ওয়ার্ল্ডভিউ।

ওয়ার্ল্ডভিউ হল এমন একটি চশমা বা এমন একটি লেন্স যেটার ভিতর দিয়ে আমরা দুনিয়াকে দেখি। এটি এমন একটি লেন্স যেটির মাধ্যমে আমরা নিজেকেও দেখি।এই লেন্সের মধ্য দিয়ে আমরা যখন ইসলামকে দেখি তখন অনেক কিছু মেনে নেওয়া আমাদের জন্য কঠিন হয়ে যায়। ইসলামের অনেক কিছু আমাদের কাছে ‘যৌক্তিক’, ‘আধুনিক’, কিংবা ‘উপযুক্ত’ মনে হয় না। ইনফেক্ট, ইসলামের মধ্যে এমন অনেক কিছু আমরা দেখি যেগুলোকে মনে হয় ছোটবেলা থেকে মুখস্ত করা ধ্যান-ধারণা গুলোর সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক।এ মনে হওয়াটা স্বাভাবিক। ইসলামের প্যারাডাইম, পশ্চিমা প্যারাডাইমের চেয়ে আলাদা।ব্যাপকভাবে আলাদা। কুরআন ও সুন্নাহ থেকে বাস্তবতা, জ্ঞান এবং নৈতিকতার যে শিক্ষা আমরা পাই সেটা পশ্চিমের ব্যাখ্যার সাথে মেলে না।বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ দুটো অবস্থান সাংঘর্ষিক। এ সংঘাতের সমাধান না করা হলে দুটো বিপরীত ধর্মী বিশ্বাস একসাথে ধারণ করতে গিয়ে আমাদের মধ্যে তৈরি হয় কগনিটিভ ডিযোন্যান্স। এমন অবস্থায় কেউ ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে,কেউ চেষ্টা করে পশ্চিমের সাথে নিজেই ইসলামের নতুন ব্যাখ্যা দিতে।ইসলামের বিভিন্ন বিধান নিয়ে আজ যে আমরা খটকাই থাকি তার কারণ হলো এই দুই প্যারাডাইমের

সংঘর্ষ।আর যাদের উপর আল্লাহ তায়ালা রহমত করেছেন তারা পশ্চিমা লেন্সটা খুলে ফেলে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করতে শেখে আল্লাহর কাছে।

আল্লাহ যখন রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুরআন দিলেন, তিনি তখন নতুন দ্বীন নিয়ে আসলেন। এই দ্বীনের একটা নির্দিষ্ট কাঠামো ছিল, নির্দিষ্ট ফ্রেমওয়ার্ক ছিল। পৃথিবীকে বুঝার, ভালো-মন্দ বিচার করার, পৃথিবীকে ব্যাখ্যা করার, মানুষের অস্তিত্ব কী? উৎস কী? জ্ঞান কী? এই সব কিছুকে বুঝার একটা ফ্রেমওয়ার্ক ইসলাম নিয়ে আসলো।এই ফ্রেমওয়ার্কটা জাহিলিয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক ছিলো।ইনফ্যাক্ট ইসলাম জাহিলিয়াতের ওয়ার্ল্ডভিউকে চ্যালেঞ্জ করলো এবং পরাজিত করল।এক সময় সেটাকে রিপ্লেস করল। আর এই চ্যালেঞ্জটা কিয়ামত পর্যন্ত। আমরা জানি কিয়ামত পর্যন্ত একমাত্র সত্য দ্বীন হল ইসলাম। একমাত্র সত্য আকিদা হলো ইসলাম।কাজেই যত দ্বীন আসুক, আকিদা আসুক, নতুন বা পুরাতন, ইসলাম সব ওয়ার্ল্ডভিউ কে চ্যালেঞ্জ করে যাবে।

যেকোনো সভ্যতার বুনিয়াদ হলো আকিদা ও ধর্মবিশ্বাস। এবং সমস্ত সভ্যতাই তা ছোট হোক বা বড়, দীর্ঘমেয়াদি হোক বা স্বল্পমেয়াদি, তা গড়ে ওঠে একটি বিশ্বাসগত কাঠামোর উপর। কোনো সভ্যতার আকিদা-বিশ্বাস - যদি গভীর থেকে উপলব্ধি করা যায়, তা হলে দূর থেকেও খুব সহজেই সে জাতির জীবনের ছক পূরণ করা যায়। তাই কোনো সভ্যতা তা বাহ্যত - যতই উন্নত হোক, তার মূল্যায়ন হবে তার ওয়ার্ল্ডভিউ/আকিদা-বিশ্বাস দিয়ে। কুরআন - অতীতের সভ্যতাগুলোকে এভাবেই মূল্যায়ন করেছে। যাতে কুরআনের -অনুসারীরা কোনো আধুনিক সভ্যতার বাহ্যত উন্নতি ও অন্তরীণ বিজয় দেখে নিজেদের প্রতারিত না করে; বরং যেন তার হাকিকত সম্পর্কে খোঁজ নেয়, সভ্যতাকে বোঝে এবং সে বিষয়ে ঈমানি দিক থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

ইসলাম পরিপূর্ণ দ্বীন,পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা।ইসলামই একমাত্র সত্য দ্বীন, সত্য ধর্ম।ইসলাম ধর্ম সকলের জন্য,সকলের সকল সমস্যার জন্য ইসলামে সমাধান আছে।ইসলাম মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য শাশ্বত আদর্শ দান করেছে এবং তা স্বয়ং সর্বজ্ঞ সর্বজ্ঞাতা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রেরিত, মানব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল ও ভারসাম্যপূর্ণ আদর্শ।ইসলামে শুধু পারিবারিক বা সামাজিক বিধি-বিধান ই নেই,রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধানও আছে।যা অন্য কোন ধর্মে নেই।তাই ইসলামে ধর্মনিরপেক্ষতার কোন অবকাশ নেই। কোন মুসলমান আদর্শ হিসাবে ধর্মনিরপেক্ষতাকে গ্রহণ করতে পারে না। আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর প্রদত্ত ওহীকে দ্বীনে ইসলামের মূল সূত্র বানিয়েছেন,যা মানবীয় জ্ঞানের অনেক

উর্ধ্বে। আল্লাহ সুবাহানু ওয়া তায়ালার জ্ঞান অসীম।আর মানুষের জ্ঞান সীমিত।মুসলমানরা শুদ্ধ-অশুদ্ধ ও বৈধ-অবৈধ সবকিছুর মাপকাঠি হিসেবে কুরআন ও সুন্নাহকে গ্রহণ করে।আর সেক্যুলাররা মানবীয় জ্ঞানকে সবকিছুর মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করে।যিনি সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা তিনি ই আমাদের জন্য কোনটা ভালো,কোনটা মন্দ বুঝতে পারেন।তিনি উত্তম পরিকল্পনাকারী ও সুবিচারক।মানুষ নিজের আকল দিয়ে কখনো তার ভালো-মন্দ নির্ধারণ করতে পারেনা।তাই আমাদের মূল ভিত্তি তথা মাপকাঠি সঠিক নির্ধারণ করা চাই।মাপকাঠি ত্রুটিপূর্ণ হলে পুরো বিশ্বকে এর ফল ভোগ করতে হয়,হচ্ছে।সেক্যুলাররা নিজেদের সীমিত আকলকে মাপকাঠি নির্ধারণ করেছে।আকল যখন মাপকাঠি হবে তখন যৌক্তিকভাবে তা ত্রুটিপূর্ণ।তাই তো আজ বিশ্বের এতো আধুনিকায়ন সত্ত্যেও আমাদের মধ্যে কোনো উন্নতি নেই,নৈতিকতা নেই।চারিদিকে বিশৃঙ্খলা,অন্যায়-অত্যাচার বেড়েই চলছে।এই সেক্যুলার ব্যবস্থা আমাদেরকে সঠিক বিচার-ব্যবস্থা দিতে পারছেনা।বিশ্ব ধ্বংসের দিকে এগুচ্ছে।তাই আমাদের এমন কোনো ব্যবস্থার দিকে যেতে হবে যা আমাদের সর্বোচ্চ শান্তি, সুরক্ষা,ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে।এমন ব্যবস্থাই আছে একমাত্র দ্বীনে ইসলামে।তাই আমাদের ফিরে যেতে হবে সঠিক মাপকাঠির দিকে।মুসলিম হিসেবেও আমাদের সকল কাজকর্মের ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহকে মাপকাঠি মেনে চলতে হবে। তবেই আমরা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সফলতা দেখতে পাবো। শুধু দুনিয়াতেই নয়,আখিরাতেও ইনশাআল্লাহ।

মর্ডানিটি

শাব্দিকভাবে এর অর্থ হল-আধুনিকতা। কিন্তু আধুনিকতা বলতে কি বুঝাচ্ছে?

অর্থ-১ - আধুনিক হওয়ার বৈশিষ্ট্য

অর্থ-২ - ইতিহাসের এক নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক সময়কাল

কিন্তু আমরা আসলে এই অর্থে এখানে এটি ব্যবহার করছিনা।আমাদের অর্থ হলো-জীবনকে দেখার,জীবনযাপনের, জীবনকে ব্যাখ্যা করার একটি নির্দিষ্ট সিস্টেমকে।

সহজভাবে বলতে মডার্নিটি বলতে বোঝায়,ব্যক্তি সমাজ, শাসন ও মহাবিশ্ব সম্পর্কে একটা নির্দিষ্ট ধরনের চিন্তা।মানব সভ্যতাকে সংঘটিত করার এবং বেঁচে থাকার একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি। একটা নির্দিষ্ট ধরনের দ্বীন,আকিদা এবং সভ্যতা।

১৬ শতাব্দী থেকে শুরু করে ইউরোপে এর উৎপত্তি। বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের মধ্য দিয়ে পরের কয়েক শতাব্দীতে ধাপে ধাপে এর বিকাশ হয়। সামাজিকভাবে অর্থনৈতিক দিক থেকে এর বিকাশ হতে থাকে একপর্যায়ে এটি ইউরোপের মৌলিক চিন্তাধারা হয়ে যায় এবং এই চিন্তার ভিত্তি ধরে সমাজ শাসন ও অর্থনীতির এক নির্দিষ্ট কাঠামো গড়ে ওঠে।

পৃথিবী এবং পৃথিবীর মানুষকে ব্যাখ্যা করার একটা নির্দিষ্ট ধারা গড়ে ওঠে।
বেঁচে থাকার,জীবনকে বুঝার এবং ব্যাখ্যা করার একটা নির্দিষ্ট ধরন গড়ে ওঠে।

মডার্নিটির এই আকিদাহ বা ওয়ার্ল্ডভিউ এর জন্ম মূলত ইউরোপে। মডার্নিটি পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে কলোনিয়ালিজম বা উপনিবেশবাদের মাধ্যমে।

আজ সারা পৃথিবীতে, মানুষ ছোট থেকে শুরু করে যে ওয়ার্ল্ডভিউটা শেখে তা হচ্ছে মডার্নিটি। স্কুল-কলেজ, সমাজ,মিডিয়া, সংস্কৃতি, রাষ্ট্র,পরিবারে মডানিটির ওয়ার্ল্ডভিউ শেখানো হচ্ছে।

মানুষ নামেই মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান। কিন্তু সবার ওয়ার্ল্ডভিউ হচ্ছে মডার্নিটি।আমরা সবাই পশ্চিম থেকে আসা এই লেন্সটা দিয়ে বিশ্বকে দেখি। এই লেন্সটা দিয়ে আমরা নিজেকে দেখি। এমনকি ইসলামকেও দেখি। এই লেন্সের মধ্য দিয়ে আমরা কুরআন এবং সুন্নাহকেও পড়ার চেষ্টা করি।

ধরা যায়, একটি গ্রামে একটিমাত্র কুয়া/পুকুর আছে। যেই কুয়া থেকে সবাই পানি পান করে। এখন সেই কুয়াতেই বিষ মিশ্রিত করে দিলে এবং সেই পানি পান করলে সবারই ক্ষতি হবে। তেমনি পশ্চিমা সভ্যতা তাদের ওয়ার্ল্ডভিউ/আকিদাহ বা বিশ্বাস আমাদের সবার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে। আর এটি ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক।

পাশ্চাত্য সভ্যতা থেকে আসা এই বিশ্বাস এবং ধারণাগুলো নিজেদের অজান্তেই আমাদের ভিতরে ঢুকে গেছে। এটি থেকে আমাদের বের হতে হবে।আমরা সবাই এই নির্দিষ্ট চশমার মধ্যে দিয়ে পৃথিবীকে দেখি। ইসলামকেও আমরা এই চশমার মধ্যে দিয়ে বিচার করি, বুঝার চেষ্টা করি।

সহজ ভাষায় বলতে গেলে এই আধুনিক সভ্যতা হলো একটি নতুন জাহিলিয়াত। পশ্চিমাবাদ/মর্ডানিটি=জাহিলিয়াত।এই জাহেলিয়াতের একটি নিজস্ব বিশ্বাস, জীবনব্যবস্থা, দর্শন, সিস্টেম আছে। শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে এটিকে পুরো পৃথিবীতে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।এই জাহেলিয়াতে বেড়ে ওঠার কারণে আমাদের মধ্যে এর আকিদাহ ঢুকে গেছে এবং আমরা এটি বুঝতেও পারছিনা যে এটা আমাদের মধ্যে কত গভীরে ঢুকে গেছে।মুসলিমরাও এই ব্যবস্থার অধীনস্ত।ফলাফল,আমরা জাহিলিয়াতের আকিদা এবং দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে নিয়েছি।

এখন আমাদের এই জাহিলিয়াতের চিন্তার খাঁচা থেকে বের হতে হবে।কিন্তু কীভাবে?কুরআন ও সুন্নাহ দিয়ে রুকইয়াহ করে সেগুলোকে বের করে আনতে হবে। ইহসান, যুহুদ,তাসাউফ,সালাফদের মাধ্যমে এই চিন্তার খাঁচা থেকে আমাদের বের হতে হবে।

মডার্নিটির বিভিন্ন কম্পনেন্ট বা অংশ আছে। তার মধ্যে সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ একটি। আর আমাদের মূল আলোচনা সেক্যুলারিজমকে ঘিরেই।

সেক্যুলেরিজম কী ও কেনো?

শাব্দিক অর্থ:

১. পার্থিববাদী অথবা বস্তুবাদী।
২. ধর্মভিত্তিক বা আধ্যাত্মিক নয়।
৩. দ্বীনপালনকারী নয়, দুনিয়াবিমুখ নয়।

‘ব্রিটিশ বিশ্বকোষ’-এ সেক্যুলারিজম অর্থ, “সেক্যুলারিজম একটি সামাজিক আন্দোলন, যার একমাত্র লক্ষ্য মানুষদেরকে পরকালমুখী থেকে ফিরিয়ে এনে দুনিয়ামুখী করা”।

Encyclopedia Britanica নামীয় ব্রিটিশ বিশ্বকোষে Atheism বা ‘নাস্তিকতা’ শিরোনামের অধীন secularism এর আলোচনা এসেছে। তাতে Atheism তথা নাস্তিকতাকে দু’ভাগে ভাগ করা হয়েছে:

১. তাত্ত্বিক নাস্তিকতা

২. ব্যবহারিক নাস্তিকতা

পারিভাষিক অর্থ:

পরিভাষায় ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ, সমাজ, রাষ্ট্র, আইন ও বিচার এবং শিক্ষাকে ধর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা।

দর্শনগতভাবে, সেক্যুলারিজম হল ব্যক্তিপরিসর, ব্যক্তিজীবন ছাড়া মানুষ আর যতগুলো জায়গায় বিচরণ করে অন্য সবগুলো জায়গাকে ধর্মমুক্ত করে ফেলা।অথবা একজন মানুষ তার জীবনে যত কাজ করে সমস্ত কাজ থেকে ধর্মকে সরিয়ে শুধুমাত্র তার ব্যক্তি জীবনের মধ্যে ধর্মকে বন্দী করে দেওয়া। এটাই সেক্যুলারিজমের মূল কথা, মূল দাবি।সেক্যুলারিজম এর মানে ধর্মনিরপেক্ষতা নয়, এর মানে হচ্ছে ধর্মমুক্তকরণ।

সংজ্ঞাগতভাবে, সেক্যুলারিজম হলো রাষ্ট্র সব ধর্ম ও মতের প্রতি নিরপেক্ষ থাকবে। রাষ্ট্র নিজে কোনো ধর্ম গ্রহণ করবে না। রাষ্ট্র রাষ্ট্রের সংবিধান মোতাবেক চলবে আর ব্যক্তি তার মতো করে ধর্ম পালন করবে। রাষ্ট্রের কাজে ধর্মের কোনো হস্তক্ষেপ থাকবে না। উল্লিখিত সংজ্ঞার বিচারে সেক্যুলারিজমের আবার দুটি দিক বেরিয়ে আসে।

১। ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা।

২। সব মতের প্রতি সমান ও নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করা।

এক. ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করার অর্থ হলো ধর্মীয় নির্দেশনা প্রত্যেকের ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকা। ব্যক্তিগত জীবন কেবলই ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট। যদি ব্যক্তির জীবনাচারের পরিধি নিজ সত্তা পেরিয়ে সন্তান, বউ, মা-বাবা, ভাই-বোনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়, তখন তা আর ব্যক্তিগত জীবন থাকে না; সমষ্টিগত জীবন (public life) হয়ে যায়। এই সীমা অতিক্রম করলেই ব্যক্তির উপর হিউম্যান রাইটস-এর বিধান প্রয়োগ হওয়া শুরু করে। যার ফলে সে তার স্ত্রী-সন্তানদের বিষয়েও কোনো প্রকার হিউম্যানিজমবিরোধী হস্তক্ষেপ করার অধিকার হারিয়ে ফেলে। মোদ্দকথা, ব্যক্তিগত জীবন শুধুই 'আমি'র মাঝে সীমাবদ্ধ। 'আমি'-এর বাইরে গেলেই শুরু হয়ে যায় পাবলিক লাইফ।

বুঝতেই পারছেন ধর্মকে এরা কোথায় নিক্ষেপ করতে চায়। বাস্তবতা হলো, সেক্যুলারিজম ব্যক্তি- জীবনকেও প্রভাবিত করে। কারণ, সেক্যুলারিজমের মূল সংঘর্ষ স্রষ্টা কিংবা ধর্ম অস্বীকার করা নয়। এটা গৌণ বিষয়। সেক্যুলারিজমের মূল উপাদান হলো আল্লাহ এবং দীনের প্রভাব ও কর্তৃত্ব অস্বীকার করা। ধর্মীয় প্রভাব অস্বীকারের ব্যাপারটি জীবনের যেকোনো ক্ষেত্রেই হতে পারে। মুসলিমদের অনেকেই নিজেদের প্রফেশনাল লাইফকে দীনের প্রভাব থেকে মুক্ত মনে করে। ফলে দেখা যায় কোনো কাজকে ব্যক্তিগতভাবে কিংবা সত্তাগতভাবে হারাম মনে করলেও পেশা হিসেবে বৈধ মনে করছে।এটা মুসলিম জীবনে সেক্যুলারিজমেরই প্রভাব। অভিনেতা-অভিনেত্রী, ক্রিকেটারসহ অনেক হারাম ক্যারিয়ারিস্ট মুসলিম ব্যক্তি-জীবনে নামাজ- রোজা পালন করছে; কিন্তু পেশা হিসেবে সুস্পষ্ট হারাম কাজগুলো বৈধ মনে করছে। এমন আচরণ সেক্যুলারিজমেরই প্রভাব। আবার এই অস্বীকৃতি একান্ত ব্যক্তি-জীবনেও হতে পারে। ব্যক্তির চিন্তা ও মনন থেকে যদি আল্লাহর কর্তৃত্বের ধারণা হারিয়ে যায়, ধর্মের প্রভাব প্রত্যাখ্যাত হয় তবে তা সেক্যুলারিজমেরই অংশ। ধর্মীয় বিধানাবলিকে নিছক ওহির টেক্সট থেকে গ্রহণ না করে নিজস্ব আকল কিংবা বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে গ্রহণ করার মতো ব্যক্তিগত প্রবণতা ধর্মীয় কর্তৃত্বকে প্রত্যাখ্যান করারই ভিন্ন চিত্র। এজন্য কেউ নিয়মিত কিছু ধর্মীয় আচার পালন করেও ধর্মীয় কর্তৃত্বের জায়গায় অস্বীকারকারী হতে পারে। মুসলিম সমাজে এমন লোকের অভাব নেই বর্তমানে। সুতরাং সেক্যুলারিজম কেবল রাষ্ট্র, অর্থনীতি এবং সমাজের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। ব্যক্তি-জীবনে হস্তক্ষেপ করাও এর বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কেউ সেগুলোর অনুসরণ করতে পারবে না।

সংজ্ঞাগতভাবে সেক্যুলারিজমের দ্বিতীয় দিক হলো সকল মতের প্রতি উদার ও নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করা। ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রত্যেকে ভালো-মন্দ নির্ধারণ করার যেই মাপকাঠি গ্রহণ করবে, তা মেনে নেওয়া। অন্যভাবে বললে, টলারেন্স এর উদ্দেশ্য হলো, ভিন্নমতকে শুধু মেনে নেওয়াই নয়; বরং ভালো-মন্দের ধারণাগুলোর ভিন্নতাকে গুরুত্বহীন এবং অনর্থক মনে করা। স্বাধীনতা, সমতা ও উন্নতিকে মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করার দাবি হলো, কেউ নিজের কল্যাণের ধারণার ভিত্তিতে অন্যকারো সমালোচনা করার কিংবা পরিবর্তন করার অধিকার রাখে না। এমনকি একজন পিতা তার সন্তানকেও নামাজ পড়ার জন্য জোরজবরদস্তি করতে পারবে না। জীবনপরিচালনার প্রতিটি পদ্ধতি সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সমানভাবে মেনে নেওয়ার নাম টলারেন্স। যখন প্রত্যেকের ব্যক্তিগত খায়েশ পূরণ এবং জীবনপরিচালনার সমস্ত পদ্ধতি ও ধারণা সমান মর্যাদার, তখন প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক হলো অন্যের খায়েশ ও প্রবৃত্তি মেনে নেওয়া এবং তাকে সম্মান করা।

শাসন, সার্বভৌমত্ব, আইন প্রণয়ন, বিচার, প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে ইসলামকে হটিয়ে দিয়ে সেক্যুলার রাষ্ট্র নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। সেক্যুলার রাষ্ট্র অগণিত বিষয়ে সরাসরি ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক অবস্থান গ্রহণ করে। এমনকি ইসলামের যে অবস্থান সেটাকে 'অবৈধ' কিংবা 'বেআইনি' সাব্যস্ত করে। সেক্যুলার রাষ্ট্র বাই ডিফল্ট ধর্মহীনতার অবস্থান থেকে কাজ করে। এমন রাষ্ট্রের ঘোষিত আদর্শ, মূল্যবোধ, আইন, কোন কিছুর সাথে ইসলামের দূরতম কোন সম্পর্ক থাকে না।

সেক্যুলারিজমের ইতিহাস

সেক্যুলারিমের ইতিহাস হচ্ছে ইউরোপিয়ান ইতিহাস।ইউরোপীয় সমাজ একটি বিশেষ অবস্থায় ছিল।তাদের একটা বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে ধর্ম নিয়ে। ইউরোপের ধর্ম মানে খ্রিষ্টধর্ম।খ্রিষ্টধর্ম নিয়ে তাদের একটা খারাপ অভিজ্ঞতা আছে।ইউরোপীয় সমাজ,ইউরোপীয় রাষ্ট্র, ইউরোপীয় জনগণের ধর্ম নিয়ে তাদের একটা খারাপ সময় গেছে।তারা তাদের সেই খারাপ অভিজ্ঞতা থেকে পেয়েছে ধর্মকে যদি পাবলিক স্পৃহা থেকে প্রাইভেট স্পৃহায় নেওয়া হয় তাহলে তাদের সমস্যাটা সমাধান হবে। ইউরোপে এটা দেখে সেকুলারিজম কে সমস্যার সমাধান হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে। ১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবের মাধ্যমে সেক্যুলারিজম রাজনৈতিক অস্তিত্ব অর্জন করে। উনবিংশ শতাব্দীতে গোটা ইউরোপ জুড়ে সেক্যুলারিজম বিস্তার লাভ করে। বিংশ শতাব্দীতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও মিশনারীর প্রভাবে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে রাজনীতি ও শাসনকার্যে সেক্যুলারিজম ছড়িয়ে পড়ে। ইউরোপে ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের অব্যবহিতকাল পরেই সেকুলার মতবাদের উদ্ভব ঘটে। ইউরোপ লক্ষ করে, খ্রিষ্টধর্মের অযৌক্তিক দীক্ষাসমূহ জীবন-বাস্তবতার সাথে তাল মিলিয়ে চলার উপযোগী নয়। এরই ফলে তারা দীন ও দুনিয়াকে একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। একইভাবে বৌদ্ধমত, হিন্দুধর্মসহ অপরাপর সকল ধর্মানুসারীরই বুঝতে বাকি থাকে না যে, তাদের ধর্মগুলো যাপিত জীবনের বস্তুনিষ্ঠ সংজ্ঞাদানে অসমর্থ। ফলে তারা সেকুলার মতবাদ গ্রহণ করতে পিছপা হতো না।

কিন্তু ইসলাম জীবন-বাস্তবতার পরিমণ্ডল হতে কখনোই পলায়নপরতাকে সমর্থন করে না; বরং ঘর-গৃহস্থালি থেকে নিয়ে প্রশাসনিক অবকাঠামো পর্যন্ত জীবনের সকল সমস্যার সমাধান করার অঙ্গীকারে বদ্ধপরিকর। অধিকন্তু তা পৃথিবীর যেকোনো অংশে বাস্তবায়িত হওয়ার যোগ্যতায় বিশেষিত। একারণে পশ্চিমা বুদ্ধিজীবীরা ইসলামিবিশ্বে সেকুলারিজম প্রতিষ্ঠা করতে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

সেকুলারিজমের প্রচারকারীরা ভুল বুঝের শিকার হয়ে মুসলমানদের মন-মস্তিষ্কে একথা বসিয়ে দিচ্ছে যে, দীন এবং দুনিয়া দুটি ভিন্ন বিষয়। একইভাবে অপরাপর ধর্মাদর্শের মতো ইসলামও যাপিত জীবনের চাহিদাসমস্ত পূরণ করতে সক্ষম নয়। উদ্দেশ্যটি চরিতার্থ করতে পশ্চিমাবিশ্ব প্রাচ্যতত্ত্ববিদদের মানস-সন্তানদের, বিশেষভাবে ব্যবহার করেছে-যারা ইসলামি শরিয়ত, ইতিহাস এবং জীবনীসাহিত্যে বিকৃতি ঘটিয়ে সেকুলারিজমকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার অপবিত্র চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

সেক্যুলারিজমের মৌলিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ইসলামী বিশ্বের সেকুলারিজমের মৌলিক উদ্দেশ্য গুলো নিম্নরূপ :

১.মুসলমানদের আকিদার বিশ্বাসের সন্দেহ এবং সংশয় সৃষ্টি করতে হবে

২.পশ্চিমাবিশ্বের ধর্মদ্রোহী চিন্তাভাবনা এবং বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণা সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকিয়ে দিতে হবে।

৩.ইসলাম ধর্মকে শাসনব্যবস্থা, রাষ্ট্রনীতি এবং সমাজ জীবন থেকে বের করে পশ্চিমা রুচি ও মর্জিমাফিক সেক্যুলার শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

সেকুলারিজমের তিনটি মারণঘাতী অস্ত্র

১.জাহিলিযুগের সাম্প্রদায়িকতা উসকে দেওয়া।

২.মুসলমানদের যোগ্য নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত রাখা।

৩.তথাকথিত নারী স্বাধীনতা।

সেক্যুলারিজম প্রসারতায় উপায়-উপকরণ

সেক্যুলাররা তাদের মতবাদকে সবার মধ্যে বিশেষ করে মুসলিমদের দিলদেমাগে ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্যে ও তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য নানা উপায়-উপকরণ ব্যবহার করে থাকে তা নিম্নরূপ:

১.শিক্ষাব্যবস্থা

২.প্রচার মাধ্যম/মিডিয়া

৩.শিক্ষামাধ্যম

৪.রাজনৈতিক অঙ্গন

৫.আইন

৬.অর্থনীতি এবং ব্যবসায়

৭.জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান,এনজিওসমূহ
৮.তথাকথিত আধুনিকমনা ইসলামি চিন্তাবিদ
৯.শিল্প এবং চারুকলা
১০.সাহিত্য
১১.খেলাধুলা এবং বিনোদন
১২.সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব
১৩.এলাকা ও অঞ্চলভিত্তিক ঐতিহ্য-সংস্কৃতি
১৪.জাহিলি যুগীয় সাম্প্রদায়িকতার বিস্তার
১৫.যোগ্য নেতৃত্ব হতে ফিরিয়ে রাখা
১৬.(তথাকথিত) নারীস্বাধীনতা।

এক. শিক্ষাব্যবস্থা (Education)

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা বাতিলপন্থিদের ঘৃণ্য পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে ঝর্নার উৎসধারার সাথে তুলনীয়। বিভ্রান্তিকর ধ্যানধারণার ব্যাপকায়নে শিক্ষাব্যবস্থা এবং শিক্ষাসিলেবাসের ভয়াবহতা অনস্বীকার্য। এই প্রচলিত আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার কারণে ইসলামি দুনিয়ায় নিম্নযুক্ত পরিবর্তনগুলো সূচিত হয়েছে:

১. শিক্ষার ভাষা বদলে যাচ্ছে।
২. লিখনপদ্ধতি বা বানানরীতি বদলে যাচ্ছে।
৩. বিদেশি ভাষাশিক্ষা আবশ্যক করা হচ্ছে।
৪. ধর্মের ব্যাপারে শ্রদ্ধাবোধ মিটিয়ে ফেলা হচ্ছে।
৫. ধর্মদ্রোহিতামূলক লেখাজোখা দিয়ে শিক্ষাসিলেবাস ভরে তোলা হচ্ছে।
৬. আলেম এবং দীনি শিক্ষার ছাত্রদের ঘৃণিত সাব্যস্ত করা হচ্ছে।
৭. ধর্মবিদ্বেষী শিক্ষকদের নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে।
৮. সহশিক্ষার বিস্তার ঘটানো হচ্ছে।
৯. দীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে কোণঠাসা করে তোলা হচ্ছে। এবং
১০. ধর্মীয় বিদ্যাঙ্গন ও প্রচলিত শিক্ষাধারার মধ্যে আড়াল তৈরি করা হচ্ছে।

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার কিছু গর্হিত দিক

১. পশ্চিমা মূল্যবোধের ব্যাপকায়ন

২. ধর্মদ্রোহ এবং বস্তুবাদমুখী মগজধোলাই
৩. ইসলামি ইতিহাস-ঐতিহ্য পাশ কাটিয়ে কপোলকল্পিত ইতিহাসের পাঠদান
৪. পাশ্চাত্যজগৎ এবং তাদের এজেন্টদের দোষত্রুটি গোপন রাখা।
৫. ইসলামি শিক্ষা-দীক্ষাকে কেবল একটা মতবাদরূপে উপস্থাপন করা।
৬. ভৌগোলিক এবং রাজনৈতিক প্রভেদবলয় পাকাপোক্ত করা।

শিক্ষাব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণপ্রতিষ্ঠা:

মুসলিমবিশ্বের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে নিম্নযুক্ত পদক্ষেপগুলো গৃহীত হায়েছে।
১. আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইউনেসকো' (Unesco) এবং ইউনিসেফ' (Unisef)-এর মতো শিক্ষা ও সংস্কৃতিবিষয়ক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।
২. মুসলিমবিশ্বে পশ্চিমা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অধীনে শিক্ষক প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা।
৩. শিক্ষাখাতে বিদেশি সহায়তা গ্রহণ করা।
৪. মুসলিমদুনিয়ার শিক্ষামন্ত্রণালয়ের উপর ভিনদেশি বিশেষজ্ঞদের ইজাদারি প্রতিষ্ঠা করা।
৫. ইসলামধর্মীয় ক্লাসগুলোতে ফরেনার প্রফেসর এবং বিশেষজ্ঞদের যাতায়াত অব্যাহত রাখা।
৬. মেধাবী মুসলিম ছাত্রদের জন্য বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা রাখা, ইত্যাদি।

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ফল:

১. আমাদের মুসলিম ছাত্ররা কেবল নামেই মুসলমান থেকে গেছে।
২. তারা দীনি শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে পলায়নপর মানসিকতা লালন করছে।
৩. দুনিয়াবি শিক্ষা এবং দীনি শিক্ষা; দুটি ভিন্ন ভিন্ন ধারা বলে পরিগণিত হচ্ছে।
৪. ক্ষমতাশালীরা দিনে দিনে দীন থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন।
৫. মুসলমানরা নিজেদের ইলমি ঐতিহ্যের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে উঠেছে।
৬. শৈক্ষিক সাভ্যতিক এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব পশ্চিমাদের হাতে চলে গেছে।
৭. দীন এবং দীনদারদের নিয়ে জনসম্মুখে উপহাস-বিদ্রুপ করা সাধারণ রীতি হয়ে উঠেছে।
৮. নতুন প্রজন্ম মন-মস্তিষ্কে পাশ্চাত্যের গোলামে পরিণত হয়েছে।

দুই. মিডিয়া

সার্বিক বিবেচনায় বিরোধীপক্ষের সবচেয়ে ভয়ংকর এবং বিস্ফোরক অস্ত্রের নামটি হল মিডিয়া। মিডিয়ায় যেই ভাবধারার প্রাবল্য থাকে জনসাধারণ তাই গ্রহণ করে নেয়।

প্রতিটি যুদ্ধই সুদৃঢ় স্নায়ুবিক দ্বন্দ্বের উপর ভিত্তি করেই সংঘটিত হয়ে থাকে। আমাদের বিরোধীপক্ষ মিডিয়ার মধ্যস্থতায় আমাদের আদর্শ এবং স্নায়ুবিকতার উপর উপর্যুপরি হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। আর ব্যাপকভাবে আমাদেরকে হতাশা, দুর্বলতা এবং ভুল চিন্তার শিকারে পরিণত করছে।

দুই প্রকার মানুষ এবং মিডিয়ার সংশয় ও রিপুতাড়নার জাল:
মানুষজন সাধারণত দুই প্রকার। যথা:

১. দায়ভারপ্রাপ্ত মানুষ
২. দায়ভারহীন মানুষ

মিডিয়া দায়ভারপ্রাপ্ত (অর্থাৎ নেতৃস্থানীয়) মানুষজনকে সংশয় সৃষ্টির মাধ্যমে ফাঁদে ফেলে। সংশয় ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যম হচ্ছে, সংবাদপত্রের দপ্তরগুলো, যেখানে শত শত খবর এবং প্রতিবেদন জমা হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে দায়ভারহীন (অর্থাৎ গর নেতৃস্থানীয়) মানুষদেরকে ভোগলিপ্সার শিকারে পরিণত করে। এতে সফল হতে মিডিয়াগুলো বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান (Entertainment)-কে জাল হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। নৃত্য, গানবাদ্য কিংবা নাটক-সিনেমা সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

ইহুদি লবি এবং মিডিয়া:

বর্তমানে ইহুদিরা মিডিয়ার উপর নিজেদের ইজাদারি প্রতিষ্ঠা করে রেখেছে। অধুনা ফাঁস হয়ে যাওয়া তাদের প্রসিদ্ধ প্রটোকলের দ্বাদশতম পরিকল্পনায় যে নীতি গৃহীত হয়েছে, তা হল পৃথিবীর যত সংবাদ মাধ্যম আছে তা ইহুদিদের করতলগত থাকবে। বিশ্বের প্রসিদ্ধতম সংবাদ মাধ্যম যেমন- রয়টার্স, এসোসিয়েটেড প্রেস, ইউনাইটেড প্রেস, ইন্টারন্যাশনাল এন্ড ফ্রান্সিসি নিউজ এজেন্সির স্বত্বাধিকারী তারাই। মিডিয়াজগতে ইহুদি পুঁজিপতিদের বিনিয়োগের হার শতকরা নব্বইভাগ পর্যন্ত বিদ্যমান রয়েছে। মিডিয়াজগতের দণ্ডমুণ্ডের অধিকারী ইহুদি এবং খ্রিষ্টান নীতিনির্ধারকেরা তিনটি ব্যাপারে একমত। যথা:

১. খ্রিষ্টান এবং ইহুদি ঐক্যে কোনোরূপ ফাটল তৈরি হতে দেওয়া যাবে না।
২. সবসময় মার্কিনি রাজনীতির শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরতে হবে।
৩. সর্বদা পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার পক্ষশক্তি হিসেবে ভূমিকা রাখতে হবে।

তিন. জ্ঞান ও তথ্যোপকরণ

পশ্চিমারা দুনিয়ার প্রয়োজনীয় শিক্ষামাধ্যমগুলোর উপর কর্তৃত্ব স্থাপনে একচ্ছত্র আধিপত্য লাভ করেছে। যেকোনো বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত খুঁজতে গেলে দেখা যায়, আমরা পশ্চিমা লেখক, পশ্চিমা গ্রন্থাগার, পশ্চিমা বিশ্বকোষ এবং তাদেরই পরিচালনাধীন ওয়েবসাইটগুলোতে পেয়ে থাকি। ফলে লোকজন ধর্মহীন লেখক, সাংবাদিক, গবেষকদের কীর্তি এবং যোগ্যতায় প্রভাবিত হয়। এমনকি পরবর্তীতে তারা অন্যান্য ধ্যানধারণার সাথেও মতৈক্য পোষণ করতে শুরু করে।

চার. রাজনৈতিক অঙ্গন

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা, পশ্চিমা ধ্যানধারণা এবং আদর্শ বাস্তবায়নের একটা উল্লেখযোগ্য বড় মাধ্যম। গণতন্ত্রের' বিস্তার ঘটিয়ে ইসলামের নির্ভেজাল রাষ্ট্রব্যবস্থায় আস্থাপোষণকারী মুসলিম নেতৃবৃন্দকে রাজনৈতিক অঙ্গনে অপাঙক্তেয় করে রাখা হচ্ছে। গণতান্ত্রিক রাজনীতির ময়দানে পলিটিকাল পার্টিগুলো দেশের নাগরিকদের আবেদন চাহিদা এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধিত্ব করে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনসাধারণের উদ্যোগ ও নির্বাচনে আস্থা অর্জনকারী দলগুলোই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে কোনো কীর্তি স্থাপনের অনুমোদন পেয়ে থাকে। ভোটে জয়যুক্ত হওয়ার সুবাদে কিছুলোক জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে আইন প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠানে আসন লাভ করেন-যা পার্লামেন্ট বা সিনেট নামে অভিহিত। এখানে রাষ্ট্র পরিচালনার তাগিদে অব্যাহতভাবে সংবিধান প্রণয়নের কাজ চলতে থাকে।

পাঁচ. আইনব্যবস্থা (Politics)

ভ্রান্ত মতবাদ এবং ধ্যানধারণা বিস্তারের জন্য পঞ্চম যে শক্তিটি দায়ী তা হল, অনৈসলামিক আইনব্যবস্থা। অধিকাংশ মুসলিমরাষ্ট্রে পশ্চিমা আইনব্যবস্থাই কার্যকর রয়েছে, যা আদালত এবং ব্যুরোক্রেসির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে।

আদালত এমন এক প্রতিষ্ঠান, যেখানে দেশের প্রচলিত আইনের অধীনে বিভিন্ন মামলা-মোকাদ্দমার বিচার-মীমাংসা করা হয়। অতীতে আমাদের আদালতগুলোতে শুধু ইসলামি আইন অনুসারেই মামলা-মোকাদ্দমা নিষ্পত্তি করা হত। কিন্তু বর্তমানে পশ্চিমা আইনব্যবস্থা কার্যকর থাকায় ফিকাহবিদ, ইসলামি আইনবেত্তা, হাদিসবিশারদ এবং ওলামায়ে কেরামের সাড়ে তেরোশত বছরের শ্রমসাধনা বরবাদ হওয়ার পথে।

আদালত দেশের আইন অনুসারেই রায় ঘোষণা করে। ব্যুরোক্রেসি তা বাস্তবায়ন করে। এর ধারাবাহিকতা পুলিশ, ডেপুটি কমিশনার এবং গভর্নর থেকে নিয়ে রাষ্ট্রপ্রধান পর্যন্ত পৌঁছে

থাকে। বিচারালয়গুলোকে বলা হচ্ছে আইন সংরক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান। কিন্তু বাস্তবতা হল, এগুলো সেকুলার এবং লিবারেলতন্ত্রকেই সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

ছয়. জীবিকা ও বাণিজ্য

বাণিজ্য ও জীবিকার নিশ্চয়তা কোনো জাতির উন্নতি এবং স্থিতিশীলতার জন্য মেরুদণ্ড বলে অভিহিত। শত্রুরা জীবিকা ও অর্থনৈতিক দিক থেকে ইসলামি দুনিয়াকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে।

সাত. জনকল্যাণমূলক সেবাসংস্থা (NGO')

বিশ্বজুড়ে পশ্চিমা দেশগুলোর হাজার হাজার জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে, যেগুলো মুসলিম দেশগুলোর অনগ্রসর জনসাধারণের আস্থা অর্জন করে নিজেদের ধ্যানধারণা ও মতাদর্শের বিস্তার ঘটিয়ে চলেছে।

আট. আধুনিকমনা ইসলামি চিন্তাবিদ

আধুনিকমনা ইসলামি চিন্তাবিদরা বাতিলপন্থিদের কলের কাঠি হিসেবে গণ্য। পশ্চিমাদেরকে খুশি করতে তারা ইসলামের হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করার ফন্দি-ফিকিরেই নিয়োজিত থাকেন।

নয়. বিনোদনশিল্প

গানবাদ্য, চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্যনির্মাণ, নৃত্য, অভিনয় ইত্যাকার বিনোদনশিল্প হৃদয়-মনকে উন্মাতাল করে তোলে। মুসলমানদেরকে ধর্মহীন করে তোলার পেছনে এসবের অসামান্য ভূমিকা রয়েছে।

দশ. সাহিত্য

সাহিত্যের নামে প্রেম এবং ধর্মদ্রোহিতামূলক গদ্যপদ্যের সয়লাব চলছে। দীন এবং আল্লাহ তায়ালাকে নিয়ে উপহাসকারী কবি-সাহিত্যিকদের দুঃসাহসকে প্রশংসার্হ বলে গণ্য করা হচ্ছে।

এগারো. আমোদফুর্তি ও খেলাধুলা

আমোদফুর্তি এবং খেলাধুলার অঙ্গনটাও বিজাতীয় আগ্রাসনের এক ভয়ানক হাতিয়ার। ক্রীড়াম্যাচগুলোর ঈমানবিধ্বংসী পরিবেশ নতুন প্রজন্মকে দীন-ধর্মের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও উদাসীন করে তুলছে।

বারো. সাংস্কৃতিক হিরো

সাংস্কৃতিক হিরো বলতে সেসব খেলোয়াড়, অভিনয়-শিল্পী এবং বিনোদনকর্মী উদ্দেশ্য, যারা এই পাপনিমগ্ন সমাজের আইডল হয়ে উঠেছেন। জনসাধারণ তাদের কথাকে একজন আলেমের ফতোয়ার চেয়েও অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

তেরো. আঞ্চলিক সভ্যতা-সংস্কৃতি

পশ্চিমা জগৎ কোটি কোটি ডলার ব্যয় করে ইসলামি দেশগুলোর ভূ-গর্ভস্থ সহস্রাধিক বছরের প্রত্নতত্ত্ব এবং জাহেলি যুগের ভগ্নাবশেষগুলো জনসমক্ষে তুলে আনছে, যাতে মুসলমানদেরকে আঞ্চলিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে ইসলামি ইতিহাস এবং ঐতিহ্য থেকে বিমুখ করে তোলা যায়।

চৌদ্দ. স্বদেশ ও জাতিগত সাম্প্রদায়িকতা

স্বদেশ এবং জাতিগত সাম্প্রদায়িকতার প্রসার আন্তর্জাতিক ইসলামি ঐক্যে চির ধরিয়ে বহু টুকরো টুকরো ঐক্যশক্তির প্রাদুর্ভাব ঘটায়। আর এভাবেই ধর্মহীনতার পথ নিষ্কণ্টক হয়ে ওঠে।

পনেরো.যোগ্য নেতৃত্ব হতে ফিরিয়ে রাখা

ধর্মবিদ্বেষী শক্তিগুলোর খায়েশ হল, মুসলমানদের কাছে যেন কোনো যোগ্য নেতৃত্ব না থাকে। এ উদ্দেশ্যেই মুসলমানদের মধ্যে বিকাশমান কোনো যোগ্য নেতৃত্বকে তারা কলুষিত করে তুলতে কোনো ত্রুটি করে না।

ষোলো. নারী স্বাধীনতা

হাদিসে নারীদেরকে শয়তানের জাল বলে অভিহিত করা হয়েছে'। পাশ্চাত্য দুনিয়া এই জালটাকেই পূর্ণ দক্ষতার সাথে ব্যবহার করছে। নারী স্বাধীনতার স্লোগান দিয়ে খোদ নারীদেরই বিভ্রান্ত করা হয়েছে। এরপর পণ্য বানিয়ে তাদের হেনস্তা করতে কোনো ত্রুটি রাখা হয়নি। অধিকন্তু তাদেরকে দিয়ে পুরুষদের পথভ্রষ্ট করার ব্যাপারেও কোনো কমতি করা হয়নি। ইসলামি দুনিয়ায় নারী স্বাধীনতার মুলো ঝুলিয়ে বাতিলপন্থিরা বড় তিনটি লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে চায়। যথা:

১. ইসলামি আখলাক এবং সমাজব্যবস্থার বিনাশসাধন: ইসলামের উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং মূল্যবোধ পাশ্চাত্যের গাত্রদাহের কারণ হয়ে উঠেছে। অতএব, তারা এর বিলোপসাধনে বদ্ধপরিকর।
২. ইসলামি সমাজের স্বকীয়তার বিনাশসাধন: পশ্চিমারা মুসলিমসমাজে বিদ্যমান চারিত্রিক মূল্যবোধের অতুলনীয় ব্যবস্থাপনা আরো একটি কারণে বরবাদ করতে চায়। সেটা হচ্ছে, ইসলামি সামাজিকতার প্রতি অমুসলিদের আকৃষ্ট হওয়ার কোনো সম্ভাবনা যেন না থাকে।
৩. মুসলিম নারীদের পণ্য বানাবার আদিম বাসনা: মুসলিম নারীরা বিগত **১৩শ'** বছর ধরে পর্দার বিধান মেনে আসছিল। পশ্চিমারা নিজেদের পশুবৃত্তি চরিতার্থ করতে মুসলিম নারীদের ধ্যানধারণা পালটে দিয়েছে, যাতে এরা নিজেরাই তাদের ঝুলিতে গিয়ে পড়ে।

নারী স্বাধীনতা বাস্তবায়নের নীলনকশা:
নারী স্বাধীনতা বাস্তবায়ন করতে এবং মুসলিম মা-বোনদের চিন্তাচেতনায় পরিবর্তন আনতে পশ্চিমারা যে চক্রান্তের জাল বিছিয়েছে তার সারকথা হচ্ছে, ইসলামে নারীরা নির্যাতিত। তারা সর্ববিষয়ে পুরুষদের দয়ার ভিখারি। এখানেই শেষ নয়, পাশ্চাত্যবাসীরা ইসলামধর্মকে নারীদের মৌলিক অধিকার লুণ্ঠনকারী বলে অভিহিত করে। (নাউজু বিল্লাহ)

এ ধারাবাহিকতায় বিশেষভাবে নিম্নযুক্ত আপত্তিসমূহ উত্থাপন করা হয়। যথা:

১. ইসলামধর্মে নারীজাতিকে গৃহবন্দি বানিয়ে রাখা হয়েছে।

২. নারীদের স্বনির্ভর হতে এবং উপার্জনের জন্য বাইরে যেতে বাধা দেওয়া হয়েছে।

৩. ইসলাম তো নারীদের নাকেস আকল তথা অপূর্ণ জ্ঞানসম্পন্ন আখ্যা দিয়েছে।

৪. ইসলামে নারীদেরকে পুরুষদের চেয়ে কম ত্যাজ্য সম্পত্তি প্রদান করা হয়।

৫. ইসলামে তালাকপ্রদানের অধিকার শুধু পুরুষদের দেওয়া হয়েছে।

৬. ইসলামে পুরুষদের একসাথে চারজন স্ত্রী রাখার অনুমতি আছে। পক্ষান্তরে নারীদের সে অধিকার নেই।

৭. ইসলামে নারীসাক্ষ্য পুরুষসাক্ষের অর্ধেক বলে গণ্য।

প্রাচ্যতত্ত্ববিদদের উদগীরিত এসব আপত্তি প্রচার করে মুসলিম নারীদের খাঁটি ইসলামি মূল্যবোধ হতে নিঃসম্পর্ক করার ধারাবাহিকতা প্রায় একশ' পঞ্চাশ বছর ধরে চালু রয়েছে। ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে সুদূরপ্রসারী এক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তথাকথিত কিছু আধুনিকমনা মুসলিম নারীকে জনসমক্ষে উপস্থিত করা হয়। যারা দিবালোকে শত শত জনতার সামনে নিকাব খুলে ফেলে। বোরকা ও চাদর খুলে ছুড়ে মারে।

হুদা শারাবি

মিশরের হুদা শারাবিই' সে নারী, যে পর্দার বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম আওয়াজ তুলেছিল। ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে নারী সম্মেলনের নামে ইতালির রোমে একটা আন্তর্জাতিক মহিলা কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়। সেখানে হুদা শারাবি বোরকা খুলে পায়ের নিচে রাখে এবং তা পদদলিত করে উচ্চকণ্ঠে বলে-আজকের পর থেকে পর্দাপ্রথা বিলুপ্ত ঘোষিত হল। যে নারীর যেমন খুশি তেমন পোশাক পরবে।

পর্দাহীনতার পাঁচ পর্ব

তথাকথিত নারী স্বাধীনতার ছুপা শয়তানেরা পাঁচ পর্বে পর্দাহীনতার দিকে আহ্বান করে থাকে:

প্রথম পর্ব, নিকাব খোলা: পবিত্র কুরআনের আয়াত এবং হাদিস শরিফের অপব্যাখ্যা করে মুসলিম নারীদের নিকাব খুলতে বা বোরকা না পরতে উৎসাহিত করা হয়।

দ্বিতীয় পর্ব, পরপুরুষদের সাথে মেলামেশা: নারীদেরকে পরপুরুষের সাথে মেলামেশা করতে এবং পর্দাহীন আয়োজন-উৎসবে অংশগ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করা হয়। নার্সারি স্কুলগুলোতে কন্যা ও পুত্রশিশুদের পাশাপাশি বসার দ্বারাও তাদের মধ্যে পর্দাহীনতার অভ্যাস গড়ে ওঠে।

তৃতীয় পর্ব, চারদেয়ালের কারাগার হতে মুক্তি: ঘরের বাইরে কদম ফেলে পৃথিবীটায় চোখ বুলাতে আহ্বান জানানো হয়। উদ্দেশ্যে সফল হতে তথাকথিত প্রগতিশীল লোকেদের স্ত্রীদেরকেও মডেল হিসেবে উপস্থাপন করা হয়।

চতুর্থ পর্ব, পুরুষদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কর্মক্ষেত্রে যোগদান : পর্দাহীন পরিবেশে সময় যাপনকারী আধুনিক ললনারা কর্মক্ষেত্রে পুরুষদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যোগদান করতে অনায়াসে প্রস্তুত হয়ে যায়। আর শিক্ষা বাণিজ্য ট্রান্সপোর্ট থেকে নিয়ে সেনা পুলিশ এবং রাজনৈতিক অঙ্গনেও তারা পুরুষদের সহযোগী এবং সহকর্মী হিসেবে কাজ করে।

পঞ্চম পর্ব, শিল্প-সংস্কৃতিতে নারীদের উপস্থিতি: পঞ্চম পর্বে নারীদেরকে অধিকতর আয় ও খ্যাতির প্রলোভন দেখিয়ে মডেল, অভিনেত্রী, নৃত্যশিল্পী এবং কলগার্ল বানিয়ে দেওয়া হয়।

পর্দাহীনতার ক্ষতি

পর্দাহীনতার ক্ষতি অপরিসীম। বিশেষ কয়েকটি নিম্নরূপ:

১. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আস্থাহীনতা গড়ে ওঠে।

২. গৃহে স্নেহ-মমতার ছিটেফোঁটাও চোখে পড়ে না। সন্তানেরা আদর-সোহাগ থেকে বঞ্চিত হয়ে বখে যায়।

৩. পরিবার হল সমাজের ভিত্তি। তাই পরিবার-ব্যবস্থায় ভাঙন ধরলে পুরো সমাজব্যবস্থায় ধস নামে।

৪. পর্দাহীনতা এবং চারিত্রিক পঙ্কিলতাযুক্ত সমাজে পরিবার-ব্যবস্থা নিঃশেষ হয়ে যায়।

পশ্চিমা নারীদের শেষ অর্জন

পশ্চিমাবিশ্বে নারী স্বাধীনতার অন্তসারশূন্য চিৎকার-চেঁচামেচির বাস্তবতা আজ দিবালোকের মতোই স্পষ্ট। পশ্চিমা নারীরা আজও স্বামীকর্তৃক নিগ্রহের শিকার। ব্যভিচারের সাংবিধানিক অনুমোদন সত্ত্বেও প্রতিবছর অজস্র ধর্ষণমামলা নিবন্ধিত হচ্ছে। স্কুলপড়ুয়া কিশোরীদের মা হওয়ার ঘটনা এতটা বৃদ্ধি পেয়েছে যে, অল্পবয়সি মায়েদের পৃথক স্কুল গড়ে উঠেছে। এতসব অনিষ্ট দেখে ইউরোপে পুনরায় আন্দোলন শুরু হয়েছে-'স্বাধীন নারীদের আবারো গৃহিণী করে তোলা হোক, যাতে পরিবার-ব্যবস্থায় আরো একবার জীবনের দোলা লাগে।'

বিশ্বব্যাপী সেক্যুলারিজম চর্চার ফল

সেক্যুলারিজম সকলকে ব্যক্তিস্বাধীনতা দেয় অর্থ্যাৎ সে নিজে যা বুঝে,ভালো মনে করে তা ই ঠিক।সে নিজে যা মন্দ মনে করে তা ই মন্দ।কিন্তু এমন কিছু সে করতে পারবেনা যা করলে অন্যের ক্ষতি হয়ে যাবে।অর্থ্যাৎ একটা সীমানা নির্ধারণ করা আছে।

ধরে নিলাম তাদের মত ই ঠিক!কত ঠিক হলে সেখানে কোনো ত্রুটিও থাকবেনা,সর্বোচ্চ ফলাফল ভোগ করা হবে,সকলের সর্বোচ্চ শান্তি নিশ্চিত করা হবে।কিন্তু আসলেই কি এসব হচ্ছে?নাকি আমাদেরকে ভুল কিছু দেখানো হচ্ছে?চলুন একটা জরিপ দেখে আসি যেখানে তাদের ব্যক্তিস্বাধীনতার ফলে উন্নতি হচ্ছে নাকি অবনতি পাঠক নিজেই নির্ধারণ করবেন।এছাড়া কারা এই নীতিতে অগ্রগামী তাও বুঝা যাবে ইনশাআল্লাহ।

(ক) মদপান:

দেখুন, আমেরিকায় প্রতি বছর কেবল মদপানের কারণে—

•৩০ লাখের ৪০% অর্থাৎ ১২ লাখ ভায়োলেন্ট ক্রাইম হয়।
•১,৫০,০০০ মানুষ কেবল মারা যায় অতিপানের কারণে।
•মায়ের এলকোহল পানের কারণে ৪০, ০০০ বাচ্চা ত্রুটি নিয়ে জন্মে (Fetal Alcohol Spectrum Disorders)।
•বছরে ২২৩ বিলিয়ন ডলার আর্থিক ক্ষতি হয়।

সুতরাং মদপানের বিস্তার জাতিকে সবদিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। উন্নয়নে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। মদপান কমিয়ে রাখতে পারলে জাতির উন্নয়নের জন্য পজিটিভ। এবার দেখুন গবেষণা কী বলছে:

•অধার্মিক মানুষের মদপানের প্রবণতা বেশি। সবচেয়ে বেশি যারা নিজেদের এগনোস্টিক দাবি করে (৭৬%)। ধার্মিক মানুষের মদপানের প্রবণতা কম (Burkett and White, 1974)।
•মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোয় মাথাপিছু মদপান সর্বনিম্ন (<2.5 pure alcohol liters) বা প্রায় সর্বনিম্ন।
•ইউরোপীয়দের মাঝে গবেষণায়ও এসেছে, মুসলিম দেশ থেকে আসা ইমিগ্রান্টদের মদপানের প্রবণতা কম

তাহলে ইসলামের মূল্যবোধসম্পন্ন প্রজন্ম গড়ে তোলা জাতির উন্নতির জন্য উচিত, নাকি ইসলামের উপর আস্থাহীন প্রজন্ম গড়ে তোলা উচিত। বাচ্চাদের ধার্মিক মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা উন্নয়নের অনুকূল, নাকি নির্ধর্মী সেক্যুলার বানানো বেশি অনুকূল? নিজের সন্তানকে পাঁড় মাতাল দেখতে চান, নাকি সুস্থ দেখতে চান। তাহলে কেন কথা বলছেন না এই ধর্মহীন কারিকুলামের ব্যাপারে।

(খ) ব্যভিচার

ব্যভিচারের কারণে—

•আমেরিকায় ব্যভিচারের কারণে (extra-marrital affair) ৪০% বিবাহিত পরিবার ভেঙে যাচ্ছে (Janus, 1993)।

•ব্যভিচারের ভিত্তিতে গঠিত পরিবারের (লিভটুগেদার) ৬৫%-ই ভেঙে যাচ্ছে (Osborne, 2007)।

•ফলে, ইউরোপ-আমেরিকার ৩০-৫০% বাচ্চা ব্যভিচারের ফসল ও নিশ্চিত ব্রোকেন ফ্যামিলির বাচ্চা। যাদের—

√স্বাস্থ্য ২০% কম।

√আচরণগত সমস্যা থাকে বেশি।

√সাইকোলজিস্টের সাহায্য প্রয়োজন পড়ে ৩০০% বেশি।

√আত্মহত্যা-প্রচেষ্টার সম্ভাবনা দ্বিগুণ।

√স্কুলে মারপিট ও চুরিচামারিতে লিপ্ত হবার সম্ভাবনা অনেক অনেক বেশি।

√সিঙ্গেল মা-বাবা ও লিভ-টুগেদারের বাচ্চাদের ৪২%-ই স্কুলে মারপিট করে।

√স্কুলে রেজাল্ট খারাপ হয় বেশি।

√স্কুল থেকে ঝরে পড়ার সম্ভাবনা দ্বিগুণ।

√কারাগারে যাবার সম্ভাবনা নর্মাল পরিবারের চেয়ে ১২ গুণ বেশি।

ভবিষ্যতে কিশোর অপরাধ ও প্রাপ্তপবয়স্ক অপরাধের প্রবণতা (Farrington, 1990)।

একটা জাতির ৩০-৫০% ভবিষ্যত যদি এমন নেগেটিভ বৈশিষ্ট্য ধারণ করে, তা জাতীয় উন্নতির পথে নিশ্চিত অন্তরায়। অর্ধেক জনসংখ্যা ডিপ্রেসড, সাইকো, অপরাধী হয়ে বেড়ে উঠলে তা ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনবে। এ থেকে উত্তোরণের জন্য দেখুন রিসার্চ কী বলছে:

•২০১৯ সালের এক ইনফিডেলিটি সার্ভেতে এসেছে, ধর্মকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করার সাথে ব্যভিচার কমার সম্পর্ক আছে। ধর্ম তেমন গুরুত্বপূর্ণ না যারা মনে করে তাদের ২৩% ব্যভিচারে জড়ায়। ধর্মকে যারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাবেন, তাদের মাত্র ৯% ব্যভিচারে জড়ায়।

•ধার্মিকতা যত বেশি, infidelity তত কম (Fincham & May, 2017)। যত বেশি ধার্মিক তত ব্যভিচারের প্রতি নেগেটিভ এটিচ্যুড (Patrick ২০১৩)

•৬ লাখ ২০ হাজার মানুষের ডেটা থেকে Amy Adamczyk (Associate Professor of Sociology at John Jay College of Criminal Justice) পেয়েছেন: এভারেজে মুসলিমরা বিবাহবহির্ভূত সেক্সে জড়ায় সবচেয়ে কম। এরপর হিন্দুরা। (Adamczyk, ২০১২)

সুতরাং, ধর্মের সাথে সম্পর্কহীন, ধর্মকে নিষ্প্রয়োজন ভাবে এমন প্রজন্ম গড়ে তোলাটা জাতির জন্য আত্মহত্যার সমতুল্য। বাচ্চাদের সেক্যুলারায়ন নয়; বরং ধার্মিক হিন্দু ও ধার্মিক মুসলিম হিসেবে বড় করলে সেটাই ভবিষ্যতের জন্য যোগ্য-দক্ষ-সুস্থ মনের প্রজন্ম তৈরি করবে।

(গ) জুয়া

বর্তমানে জুয়া খেলা, ক্রিকেট নিয়ে অনলাইন বেটিং মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়েছে তরুণদের মাঝে, যা অপরাধ থেকে শুরু করে নানান মানসিক রোগ, অদক্ষ মানুষ তৈরি ইত্যাদি নানান জাতীয় সমস্যা তৈরি করবে। দেখুন, ৫৩টা রিসার্চ রিভিউ করে ব্রিটেনের সরকারি সাইট একটি পেপার পাবলিশ করেছে:

•ব্রিটেনে জুয়ার ফলে অর্থনৈতিক দায় ১.২৭ বিলিয়ন ডলার (২০১৯-২০ সালে)
•কোনো এলাকায় যত জুয়ার দোকান বেশি, সে এলাকার লোক দেউলিয়া ও গৃহহীন হয় বেশি। যা আবার অন্যান্য ক্ষতির কারণ: দাম্পত্য কলহ, মানসিক ও শারীরিক অসুখবিসুখ, অপরাধ ইত্যাদি।
•জুয়াড়িদের স্বাভাবিক বার্ধক্যে উপনীত হয়ে মৃত্যু কম, আত্মহত্যার হার বেশি। তারা তো বটেই, এমনকি তাদের স্ত্রী-সঙ্গীদের মাঝেও মানসিক সমস্যার হার উচ্চ।
•জুয়াড়িদের মাঝে ড্রাগ এবিউজ ও এলকোহল আসক্তির হার বেশি। চুরি, ড্রাগব্যবসার হার বেশি।

যেভাবে কিশোর-তরুণদের মাঝে জুয়ার প্রবণতা বাড়ছে, তাতে সামনে আমাদে দুর্ভোগ সুনিশ্চিত। এখনই এতে বাধা দেয়া প্রয়োজন। সেজন্য দেখুন রিসার্চ কী বলছে:

•প্রকাশ্য ধার্মিকতা যত বেশি, জুয়া খেলার হার তত কম। ধর্মকে যে যত জরুরি মনে করে, তার জুয়ায় অংশগ্রহণের হার তত কম। (Desmond Lam ২০০৬)
•কমপক্ষে সাপ্তাহিক ধর্মসভায় যেসব কিশোর যোগ দেয় তাদের মাঝে জীবনে একবারও জুয়ার প্রবণতা কম।

তাহলে এখন বলুন, বাচ্চাদের ধর্মবোধ বাড়ানো দরকার, নাকি কমিয়ে সেক্যুলার, কম ধার্মিক, নির্ধর্মী বানানো দরকার? কোনটা জাতির জন্য পজিটিভ?

(ঘ) ডিপ্রেশন ও আত্মহত্যা:

•১৫-১৯ বছর বয়েসীদের মৃত্যুর ৪র্থ প্রধান কারণ আত্মহত্যা।
•ডিপ্রেশনে ভোগে দুনিয়ার ৫% মানুষ। প্রায় ২৮০ মিলিয়ন মানুষ। যাদের ৫-৮% আত্মহত্যা করে বসে।
•বিশেষ করে কিশোর বয়সে ডিপ্রেশন ও স্ট্রেসের জন্য (most frequently reported stressor) সবচেয়ে বেশি দায়ী প্রেমের সম্পর্ক (Jackson & Finney, 2002)।
•কিশোর বয়সে রোমান্টিক স্ট্রেসে ডিপ্রেশনের উপসর্গগুলো অনেক উচ্চমাত্রায় পাওয়া যায় (Anderson, Salk, & Hyde, 2015)

তাহলে পাঠ্যপুস্তকে যে ধাপে ধাপে শিশু-কিশোরদের প্রেমের সম্পর্কে ঠেলে দেয়া হচ্ছে, এটা কি কল্যাণকর হচ্ছে কিনা। মনের অনুভূতি প্রকাশের নাম দিয়ে ছেলে-মেয়েদের মাঝে আকর্ষণ উস্কে দেবার পরিবেশ তৈরি করা হলো, এটা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মে ডিপ্রেশন ও আত্মহত্যার হার বাড়াবে।

(ঙ) দানশীলতা

নানান আপদে-বিপদে সরকারের একার পক্ষে সামাল দেয়া সম্ভব হয় না। সরকারি সাহায্য আসার আগে প্রয়োজন হয় স্থানীয় দানশীল উদ্যোগ। বিশাল এই রাষ্ট্র, বিপুল জনগোষ্ঠীর প্রোপার ম্যানেজমেন্টের জন্য চাই সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ও মানবতা। রিসার্চ বলছে:

•সেক্যুলারদের চেয়ে ধার্মিকদের দানের প্রবণতা ২৫% বেশি। স্বেচ্ছাসেবার প্রবণতা ২৩% বেশি।
•অধার্মিকরা নিজে ভোগের প্রতি গুরুত্ব দেয়, ব্র্যান্ডের প্রডাক্টের গুরুত্ব বেশি দেয়। ধার্মিকেরা আবেগ থেকে পণ্য কেনে কম (impulse purchase)। পণ্য ক্রয়ে খরচ করে কম।
•বৃটেনে মুসলিমরা অন্যান্যদের চেয়ে বেশি দান-খয়রাত করে। আমেরিকায় মুসলিমরা বছরে বেশি দান করে অন্যান্যদের চেয়ে। ২০২০ সালে অন্যান্যরা যেখানে $১৯০৬-এ, সেখানে মুসলিমরা গড়ে $৩২০০। (Siddiqui, ২০২১)

এখানেও সেক্যুলার জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার চেয়ে ধার্মিক প্রজন্ম গড়ে তোলা সরকারের উদ্দেশ্য ও ভাবমূর্তির জন্য বেশি সহায়ক। ধার্মিক নাগরিক সরকারের সহযোগী ও অংশীদার হিসেবে কাজ করে।

সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ধর্ম বিষয়ে শতভাগ স্বাধীনতার অধিকার দেয়না।ফলে সেক্যুলারিজমের একটা বাই প্রডাক্ট হয়ে ওঠে "ইসলামবিদ্বেষ"
বিখ্যাত কিছু সেক্যুলার দেশে ইসলামবিদ্বেষের কিছু নমুনা তুলে ধরা হলো:

ভারত:
ভারত একটা ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। ইন্দিরা গান্ধীর আমলে ১৯৭৬ সালে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটা অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রবীণ আইনজীবী ও সংবিধান বিশেষজ্ঞ ড. রাজীব ধাওয়ান বলছেন, “ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার দুটো দিক রয়েছে। প্রথম অংশে বলা হয়েছে, ধর্মের মধ্যে বৈষম্য করা যাবে না। অন্য অংশে বলা হয়েছে, সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দিতে হবে।”
রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় অযোধ্যার বাবরি মসজিদ ভেঙ্গে ২২ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে রামমন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ বিষয়ে ড. ধাওয়ানের বলেন, ভারত যে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলে ২২ জানুয়ারির কর্মকাণ্ড তার পরিপন্থী।
১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ভাঙ্গা হয়েছে ৬০০ বছরের পুরনো আকঞ্জি মসজিদ। এভাবে মসজিদ ভেঙে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় মন্দির গড়ার কাজ ধর্ম নিরপেক্ষতার দৃষ্টিকোণ থেকে কতটুকু সাংবিধানিক?
এছাড়াও ভারতের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকা বিজেপির রাজনৈতিক স্লোগান হল 'জয় শ্রীরাম'। এই স্লোগান দিয়ে প্রতিদিন গণপিটুনি দেওয়া হচ্ছে অহরহ মুসলিমকে। মুসলিম ব্যক্তি যতক্ষণ মুখে 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান দিচ্ছে না ততক্ষণ মারধর চালানো হয়। এভাবে মেরে ফেলা হয়েছে অসংখ্য মুসলিমদের।

কাশ্মিরি ৮ বছর বয়সী ফুটফুটে আসিফা বানুর ধর্ষণ এবং হত্যা মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়া ৬ আসামী, ৫ মাসের অন্তঃসত্ত্বা বিলকিস বানুর ধর্ষণ মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়া ১৯ আসামীর পক্ষে হয়ে রাস্তায় রাস্তায় মিছিল, আন্দোলন আর আদালতে নিজেদের দৌরাত্ম দেখিয়েছে ক্ষমতাসীন বিজেপির নেতা-নেত্রী। এসব ধর্ষণ আর হত্যাকাণ্ডের পর খুশীতে উল্লাস করেছে সে দেশের উন্মাদ উগ্র হিন্দু জনগোষ্ঠী!

আদালতে এখনো অহরহ মুসলিম নারীদের যৌন নিপীড়নের মামলা গড়াগড়ি খাচ্ছে। ধর্ম নিরপেক্ষ আদালতে এসবের কোনো বিচার নেই। কেন? কারণ মামলার বাদীরা মুসলিম! ধর্মনিরপেক্ষতার আদলে এভাবেই প্রতিনিয়ত বৈষম্য আর অত্যাচারের শিকার ভারতের সংখ্যালঘু (৩২-৩৫%) মুসলিম জনগোষ্ঠী।

(আন্তর্জাতিক আদালত কোথায়? মানবাধিকার কোথায়? ৮ বছর বয়সী কাশ্মিরী এই শেহজাদির বেলায় কোথায় ছিল নারী ও শিশু অধিকার? ৫ মাসের অন্তঃসত্ত্বা এই নারীর বেলায় কোথায় ছিল সংবিধান?)

যুক্তরাষ্ট্র:

যুক্তরাষ্ট্র ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র।

মার্কিন আইন ও বিচারমন্ত্রী এরিক হোল্ডার একটি মার্কিন গবেষণা কেন্দ্রের গবেষণার ফলাফলের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, গবেষণায় দেখা গেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অন্যান্য ধর্মের তুলনায় মুসলমানরাই সবচেয়ে বেশি বর্ণ বৈষম্যের শিকার।

পু নামক একটি গবেষণা কেন্দ্র পরিচালিত জনমত জরিপে দেখা গেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি দশজন নাগরিকের মধ্যে ছয়জনই বিশ্বাস করে, তাদের দেশে ইহুদি, প্রোটেস্টান্ট এবং নাস্তিকদের তুলনায় মুসলমানরাই বেশি বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার।

ফ্রান্স:

ফ্রান্স ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র।

মুসলমানরা ফ্রান্সের মূল সংখ্যালঘু ধর্মীয় জনগোষ্ঠী। জনসংখ্যায় তারা প্রায় ৭০ লাখ এবং শতকরা হিসাবে জনগণের সাড়ে ৭ শতাংশ। এরা মূলত ফ্রান্সের সাবেক উপনিবেশ আলজেরিয়া, মরক্কো ইত্যাদি উত্তর আফ্রিকীয় দেশ থেকে আসা। ফ্রান্স যদি তাদের দেশ লুণ্ঠন না করত, তাহলে তাদের ফ্রান্সে আসার প্রয়োজন হতো না। তা ছাড়া শ্রমশক্তির ঘাটতি মেটাতে ফ্রান্সেরও তাদের দরকার ছিল। এত কিছুর পরও শত শত বছর সহাবস্থান করেও ফরাসি রাষ্ট্র তার মুসলিম নাগরিকদের সমান ভাবতে পারেনি। ফরাসি মুসলমানদের বড় অংশই দরিদ্র বস্তিবাসী, তাদের ৩০ শতাংশই বেকার। মুসলিমবিদ্বেষী মনোভাবের কারণে তাঁরা বেসরকারি চাকরি পান না তেমন, আর সরকারও অনুদার। বিদ্যালয়গুলোতে মুসলিম শিশুরা কোনো ধর্মীয় পোশাক বা চিহ্ন বহন করতে পারে না। ফ্রান্সে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ঘটা ইহুদি গণহত্যা তথা হলোকস্ট নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হলেও ইসলামের মহানবীকে নিয়ে যা–তা বলা বা আঁকা অনুমোদিত। তারই সূত্র ধরে আসে, ইসলাম

অবমাননার বিভিন্ন ঘটনা। শার্লি এবদো পত্রিকার ইসলামবিদ্বেষী লাগাতার কার্টুন প্রকাশ, মুসলিমদেরকে কর্মক্ষেত্রে সুযোগ না দেওয়া, মূলধারার পত্রিকায় মুসলমানবিরোধী প্রচারণা, টেলিভিশনের টক শোতে অসত্য প্রচারণা, ভুয়া সংবাদ ইত্যাদির মাধ্যমে ফরাসি জনতাকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাতিয়ে তোলা হয়। ২০১৬ সালে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ও হিউম্যান রাইটস ওয়াচ ফ্রান্সে পুলিশ অভিযানের সময় মুসলমানদের ওপর অতিরিক্ত দুর্ব্যবহার ও নিপীড়নের অভিযোগ করে।

এই হলো ফ্রান্সে ধর্ম নিরপেক্ষতার চর্চা।

নিউজিল্যান্ড:

২০১৯ সালের এক জুমুআর দিন স্ক্রাইস্টচার্চ মসজিদের হামলা করে ৫০ জন মুসল্লিকে হত্যা করে এক শ্বেতাঙ্গ খ্রিষ্টান। স্রেফ ইসলাম বিদ্বেষের বলি হতে হয়েছিলো তাজা তাজা ৫০ টা জলজ্যান্ত মানুষকে। এরপর সে দেশের প্রধানমন্ত্রী খুনীর বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেন, বিচারের আওতায় আনেন এবং মুসলিমদের জন্য শোক প্রকাশ করেন। বর্তমানে সেরকম কোনো হামলা/আক্রমণের ঘটনা আর শোনাও যায় না।

অস্ট্রেলিয়া:

অস্ট্রেলিয়া সাংবিধানিকভাবে ধর্ম নিরপেক্ষ।

অস্ট্রেলিয়াতে মুসলমানরা অমুসলিমদের তুলনায় প্রায় তিনগুণ বেশি বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। একই সাথে তারা মুখোমুখি হচ্ছেন নানা ধরনের ধর্মীয় অসহিষ্ণুতারও।

অস্ট্রেলিয়ায় মুসলিমদের ওপর চালানো এক সমীক্ষায় একথা বলা হয়েছে।

যেসব মুসলিমের ওপর এই জরিপ চালানো হয়েছে তাদের ৬০ ভাগ উত্তরদাতা বলেছেন, কোনো না কোনো ভাবে ইসলামোফোবিয়া বা ইসলামভীতির অভিজ্ঞতা তাদের হয়েছে।

[সোর্স: বিবিসি]

কানাডা:

সাংবিধানিকভাবে ধর্ম নিরপেক্ষ কানাডায়

২০১৭ সালে কুইবেক শহরের একটি মসজিদে ৬ জন মুসলিমকে গুলি করে হত্যা করে এক ব্যক্তি। ঘটনাটির পর মুসলিমদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয় তখন।

২০২০ সালেও টরোন্টোতে মসজিদের একজন নিরাপত্তারক্ষীর পুরো পরিবারকে ট্রাক চাপা দিয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করে এক ব্যক্তি। পরিবারটির ৪ সদস্য ঘটনাস্থলেই মারা যায়, গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হয় একজন।

কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো এক বিবৃতিতে বলেন, ‘কানাডার অন্যতম বড় শক্তি হলো মানব বৈচিত্র। তবে ইসলামবিদ্বেষের শিকার হচ্ছেন অনেক মুসলিম। বিষয়টিতে পরিবর্তন আনতে হবে। ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে কেউ বিদ্বেষের শিকার হওয়া কাম্য নয়।’
[সোর্স: আল জাজিরা]

বাংলাদেশ:

সাংবিধানিকভাবে ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ বাংলাদেশ।
এখানে কী হয় তা তো আমাদের জানাই আছে। নামাজ কালাম পড়লে শিবির, শরীয়াহ মানলে জঙ্গি ইত্যাদি নিত্যনতুন ট্যাগ দিয়ে ছাত্রলীগের অমানুষদের মারধর থেকে নিয়ে গুম করে আয়নাঘরে নেওয়ার ঘটনাও অহরহ ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে। অন্যদিকে বিভিন্ন মন্ত্রী/প্রসাশন থেকে হিন্দু আর অন্যান্য সংখ্যালঘুদেরকে যে পরিমাণ কনসার্ন দিয়ে এসেছে তার সিকিভাগও মুসলিমদের কে দেওয়া হয় নি। অথচ দেশের সংবিধান নাকি ধর্মীয় স্বাধীনতা আর অধিকারের দিক থেকে সমতার কথা বলে!

এই হলো এশিয়ার নামকরা দুইটি এবং ইউরোপ আমেরিকার দেশগুলোর চর্চিত ধর্ম নিরপেক্ষতা। এসব বর্ণবাদী/ইসলাম বিদ্বেষী ঘটনা থেকেই বুঝা যায় একটা রাষ্ট্র আদতে আগাগোড়া ধর্ম নিরপেক্ষ থাকতে পারে না। সংবিধান চাইলেও আদালতে গিয়ে সেটা উল্টে যাবে, আবার নেতারা চাইলেও জনগণের রোষের শিকার হবে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা। কারণ স্বাভাবিকভাবেই ব্যক্তি/সামাজিক জীবন থেকে ধর্মকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করা যায় না। আবার যে মতবাদের সাথে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার কোনোই সম্পর্ক নেই, সেটি কেমন করে সব ধর্মের অধিকার নিশ্চিত করবে? এটি তো রাষ্ট্রের নাগরিকদের ধর্মহীন ধর্মবিমুখ এবং ধর্মদ্রোহী বানাবে। ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার সাথে যার কোনোরূপ সম্পর্ক নেই সে মতবাদ নাগরিকদের নিজ নিজ ধর্মপালনের সমান অধিকার কী করে দেবে? সুতরাং বলা যায়, এসব দেশে

ধর্মহীনতার এই প্রাক্টিস 'ধর্ম নিরপেক্ষতা'র আদলে নয়, বরং 'ধর্ম বিরোধীতা'র আদলে চর্চা হয়ে আসছে।

বাংলাদেশে সেক্যুলার ধর্মচর্চার ফল

প্রথম আলোর জরিপ থেকে কিছু তথ্য -

প্রায় ৯৭ শতাংশ বিশ্বাস করে তারা "ধর্মচর্চা" করে।

তবে -

এই ৯৭ এদের মধ্যে ৬০% এর বেশি দৈনিক ৫ ওয়াক্ত নামায পড়ে না।

২৫% দিনে তিন বা চার ওয়াক্ত নামায পড়ে

১১.২% এক বা দুই ওয়াক্ত পড়ে

২১.৫% নামায পড়ে না শুধু জুমুআহ পড়ে

৪.৩% সেটাও পড়ে না, তবে রমাদ্বানে রোযা রাখে।

আলহামদুলিল্লাহ ৫ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা তরুণের সংখ্যা ১০% বেড়েছে। ৩৭%। কিন্তু প্রায় ৫৬% মানুষ মনে করছে ইসলামের মিনিমাম আমল না করা সত্ত্বেও তারা ধর্মচর্চা করছে। তারা ধার্মিক।

সহজ ভাষায়, দেশের মুসলিমদের ৯৭ % এর মতো বিশ্বাস করে। কিন্তু বিশ্বাস অনুযায়ী জীবনযাপন করতে চায় না।

বিশ্বাস করে, কিন্তু বিশ্বাসের দাবি কী, সেটা জানতে কিংবা মানতে চায় না।

বিশ্বাস করে কিন্তু কী বিশ্বাস করে সেটা জানে না।

এটা হল সেক্যুলার ধর্মচর্চা। সরাসরি নিজেদের 'সেক্যুলার' বলে ঘোষণা দেয়া ছাড়া এর চেয়ে বেশি সেক্যুলার হওয়া সম্ভব না। আমি ধার্মিক। ধর্মকে ভালো পাই। যখন মন চায় হিজাব আর জুব্বা পড়ে ছবি তুলি।

জাহান্নামে অনেক ধার্মিক লোক থাকবে। কিন্তু জান্নাতে থাকবে শুধু মুওয়াহ্হিদরাই। ইসলাম আর দশটা ধর্মের মতো না যে খাতায় নাম লিখিয়ে চলে গেলেই হল। ইসলাম কোন ব্যুফে না, যে পছন্দ মতো কিছু নিলাম, আর কিছু রেখে দিলাম। ইসলাম আসমান যমীনের একচ্ছত্র অধিপতি আল্লাহ্র কাছে মনোনীত একমাত্র দ্বীন। একটা লাইফটাইম কমিটমেন্ট, যা আমাদের এই জীবনকে এমন পরের জীবনের ধরণ ঠিক করে দেবে। অন্য যেকোন সময়ের চেয়ে এখন আরো বেশি করে আক্বিদাহর চর্চা ও দাওয়াহ হওয়া প্রয়োজন।

আল্লাহ্ আমাদের ইসলাম সঠিকভাবে বোঝার এবং মানার তাউফিক দান করুন।

সেক্যুলারিজমের আদলে দুই মতবাদ:সমকামিতা ও ফেমিনিজম

সমকামিতা

সেক্যুলারিজম প্রতিষ্ঠায় নানা দল ও গোষ্ঠী কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ করে বিকৃত চিন্তাধারীরা যারা সমাজের কল্যাণ বুঝে না, শুধু বুঝে নিজের ইচ্ছা পূরণ, ব্যক্তিগত খায়েশাত মেটানো।নৈতিকতা ও সুরুচিবোধেরর কারণে সমাজ অরুচিসম্পন্ন কিছু মেনে নিতে পারে না। শুধু মুসলিম সমাজেই নয়,আধুনিক সমাজের মানুষেরাও।স্বাভাবিক জিনিসকে যখন অস্বাভাবিক করে উপস্থাপন করা হয় তখন খটকা লাগবেই।চোর যদি বলে চুরি করা তার ব্যক্তিগত অধিকার তখন সমাজ কি এটা মেনে নিবে?আপাতদৃষ্টিতেই এটি একটি অপরাধমূলক কাজ। কিন্তু সেক্যুলারিজম আইনে এমন কিছুর স্বাধীনতা দেওয়া হয় যেগুলো কোনভাবেই,কোনোরূপেই কল্যাণ বয়ে তো আনেই না বরং পারিবারিকভাবে,সামাজিকভাবে এমনকি রাষ্ট্রীয়ভাবেও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। স্পষ্ট করে বলতে এসব দণ্ডনীয় অপরাধ।কিন্তু সেক্যুলাররা একে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত না করে, অধিকার হিসেবে ক্ষমতা দেয়। তেমনি একটি মতবাদ হচ্ছে “সমকামিতা”।

সমকামিরা মনে করে,নারীত্ব-পুরুষত্ব এর প্রকাশ কোন স্বতঃসিদ্ধ বিষয় নয়, সামাজিকভাবে চাপিয়ে দেয়া বিষয়। মেয়েদের সাজগোজ করা, লজ্জা পাওয়া— এগুলো সামাজিকভাবে চাপিয়ে দেয়া বিষয়। এই কথাটা আজ কুসংস্কার ছাড়া কিছু না। তাদের এই কুসংস্কার ভুল প্রমাণ হচ্ছে গত ২০ বছর ধরে। বিজ্ঞানের আধুনিক গবেষণাগুলো বলছে, নারীর ও পুরুষের আচরণে প্রচুর পার্থক্য রয়েছে, যা সমাজের শেখানো নয়। বরং মায়ের পেটেই ব্রেইনের গঠনে উভয়ের পার্থক্য হয়ে যায় (sexual dimorphism)। ব্রেইনের গঠনে পার্থক্যটাই পরে আচরণে, রুচিতে, পছন্দে, আগ্রহে পার্থক্য তৈরি করে। চলুন দেখি রিসার্চগুলোর সাথে পরিচিত হই। রিসার্চ লিংকগুলোও দেয়া আছে ফুটনোটে। আমি কেবল ২০১০ সালের পরে যে রিসার্চগুলো হয়েছে, সেগুলোই আনার চেষ্টা করেছি।

পুরুষ ও নারীর পার্থক্যগুলো লক্ষ্য করুন ও মিলিয়ে নিন

নারীর ব্রেনের দুপাশের মাঝে অধিক কানেকশন।[1] ফলে নারীর ইন্ট্যুইশন পাওয়ার আছে। না-বলা কথা বুঝে ফেলা, না-দেখা জিনিস আঁচ করার ক্ষমতা। (Ingalhalikar 2014)

যেকোনো কাজে পুরুষের মগজে একটা নির্দিষ্ট জায়গা এক্টিভ হয়। মানে নির্দিষ্ট জায়গা দিয়ে নির্দিষ্ট কাজ করে; কিন্তু নারীর মগজে ব্যাপারটা এত কাট-কাট না, একটা কাজে ব্রেইনের নানান জায়গা একসাথে অংশ নেয়।[2] (Shaywitz et al. 1995; Pugh et al. 1996; Jaeger et al. 1998; Clements et al. 2006, Chen et al. 2007)

নারীর কথা বলার ক্ষমতা বা নিজেকে প্রকাশের ক্ষমতা অনেক বেশি।[3] পুরুষ নিজেকে প্রকাশ করতে পারে কম। যেমন নারী সহজে কাঁদতে পারে, পুরুষ পারে কম। (Kurth, 2017)

নারীর অক্সিটোসিন হরমোন বন্ধন তৈরি করে (Magon et al. 2011))।[4] এজন্য নারীর সহমর্মিতা, সহানুভূতি, সম্পর্ক গড়া, টিকিয়ে রাখার ইচ্ছা অনেক বেশি। বিপরীতে পুরুষের টেস্টোস্টেরোন বাচ্চা-পালার বিরোধী (Kuo et al. 2016)।[5]
পুরুষ শিশুর টান বস্তুর প্রতি (অবজেক্ট)। নারীশিশুর টান চেহারার প্রতি (সাবজেক্ট)।[6] হাসি দেওয়া, কথা বলা এই সামাজিক ব্যাপারগুলো নারীশিশুর আগে আসে পুরুষের চেয়ে। (Connellan et al. 2000)। এজন্য মেয়েরা মানুষ সম্পর্কিত পেশা ও সাবজেক্ট বেছে নেয়

(ডাক্তারি, শিক্ষকতা)। ছেলেরা বেশি বেছে নেয় যন্ত্র/বস্তু সম্পর্কিত পেশা ও সাবজেক্ট (প্রকৌশল, STEM সাবজেক্ট)

কাজের সময় পুরুষ থাকে ফোকাসড। পুরুষ যা করে, খোপ খোপ[7] ব্রেইন বলে ডিফোকাস হয় কম। বিপরীতে, নারী মাল্টিটাস্কিং-এ পারদর্শী,[8] যা সন্তান লালনের জন্য জরুরি। এটা হতে গিয়ে আবার আরেক দিকে সমস্যা। মাল্টিটাস্কিং-এর জন্য ব্রেইনের বিভিন্ন কাজের স্থান ওভারল্যাপিং বলে, ডিফোকাস হয়ে যায় সহজে।[9] (Stoet, 2013, 2017)

নারী যখন দেখে অনেক ডিটেইলস দেখে, আপাত নিষ্প্রয়োজন জিনিসও দেখে এবং মনে রাখে।[10] পুরুষ স্থানের বিবরণ মনে রাখে বেশি (spatial memory)। নারী মনে রাখে বেশি কথাবার্তা (verbal memory). (Beeman and Bowden, 2000; Fink et al., 1996, 1999. Cahill and van Stegeren, 2003, 2004; Kilpatrick et al., 2006.)

ফলে দ্বিধা, কনফিউশন পুরুষের চেয়ে বেশি।[11] এবং এটাই নারীর শক্তি। (Stoet 2017)

নারী পুরুষের চেয়ে আবেগতাড়িত (impulsive)।[12] নারীর মস্তিষ্কের ফাংশন ওভারল্যাপিং বলে আবেগ ও যুক্তি আলাদা করে বুঝতে পারে কম। পুরুষের আবেগের জায়গা আলাদা, যুক্তির জায়গা আলাদা। (Marazziti et al., 2010)
নারী সহজে প্রভাবিত হয়, সহযোগিতা করে, মেনে নেয়, রিসেপ্টিভ।[13] পুরুষের টেস্টোস্টেরোন প্রভাব নেয় না, বিদ্রোহ করে। মেইল ইগো তৈরি করে।[14] (Tajima-Pozo ২০১৫)

সুতরাং, এগুলোর কোনটাই সমাজের চাপিয়ে দেয়া নয়। বরং নারী-পুরুষের শরীরী গঠনেই সব নকশা ঠিক করে দেয়া, যা সে মায়ের পেট থেকেই নিয়ে দুনিয়াতে এসেছে। নারী বৈশিষ্ট্য ও পুরুষ বৈশিষ্ট্যের স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম রয়েছে এবং তা ৯৯% মানুষের ক্ষেত্রেই ঠিক।

রেফারেন্স :

[1] Ingalhalikar M, Smith A, Parker D, et al. : Sex differences in the structural connectome of the human brain. Proc Natl Acad Sci U S A. 2014;111(2):823–8.

shows examples of the use of imaging to compare the functions of the cerebral cortex in processing words in a male versus a female subject.

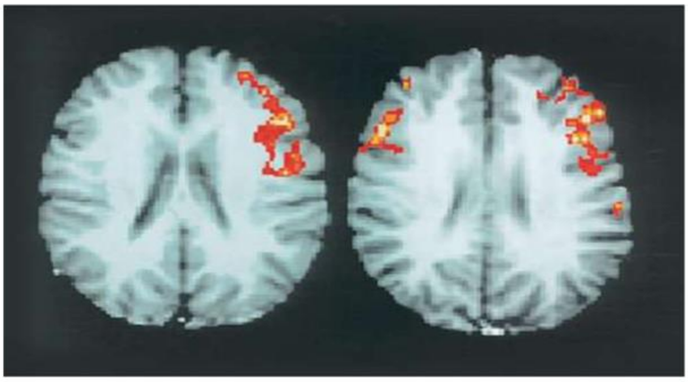

FIGURE 15–1 Comparison of the images of the active areas of the brain in a man (left) and a woman (right) during a language-based activity. Women use both sides of their brain whereas men use only a single side. This difference may reflect different strategies used for language processing. (Used with permission of Shaywitz et al, 1995. NMR Research/Yale Medical School.)

কথা বলা সময় পুরুষের ব্রেইনের একপাশে নির্দিষ্ট জায়গা উজ্জ্বল, মেয়েদের ব্রেইনে দুইপাশেই বিস্তৃত এলাকা উজ্জ্বল।

[2] একটা সমস্যা সমাধানের সময় পুরুষের মগজের একটা জায়গাই এক্টিভ, স্ক্রিনে উজ্জ্বল। নারীদের মগজের নানা জায়গা এক্টিভ। (Shaywitz et al. 1995; Pugh et al. 1996; Jaeger et al. 1998; Clements et al. 2006, Chen et al. 2007)

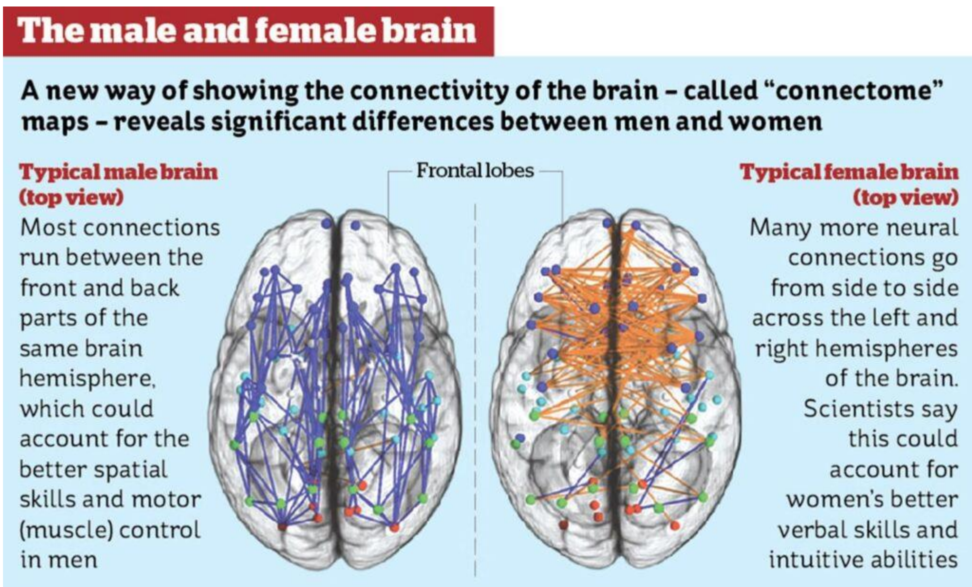

পরবর্তী সময়ে ২০১৪ সালে University of Pennsylvania-র গবেষকরা ৪২৮ জন যুবক ও ৫২১ জন যুবতীর ব্রেইন ইমেজিং করেন। বার বার পাওয়া যায়, নারীদের ব্রেইনের দুইপাশের সমন্বিত এক্টিভিটি খুবই শক্তিশালী। বিপরীতে পুরুষেরটা একটা অংশের ভেতরে শক্তিশালী।

[3] Kurth F, Jancke L, Luders E : Sexual dimorphism of Broca's region : More gray matter in female brains in Brodmann areas 44 and 45. J Neurosci Res. 2017;95(1–2):626–32.

[4] মা-শিশু, স্বামী-স্ত্রী, ইয়ার-দোস্ত ইত্যাদি সকল যুগল বন্ধনের জন্য দায়ী এই হরমোন। আদর করে একে ডাকা হয় bonding hormone, cuddle hormone (জড়িয়ে ধরা) কিংবা love hormone. যৌনমিলন, লিঙ্গোত্থান, বীর্যপাত, গর্ভধারণ, প্রসব, বুকের দুধ তৈরি, মাতৃত্বের অনুভূতি, সামাজিক বন্ধন, স্ট্রেস দূরীকরণ এবং আরও বিভিন্ন কাজে এই হরমোন অংশ নেয়। (Magon et al. 2011))

[5] ২০০৫-২০০৯ সালের মাঝে ৪৬৫ জন পুরুষের ওপর গবেষণা হয়। দেখা গেছে পুরুষের সন্তান প্রতিপালনের সাথে টেস্টোস্টেরোন ৩০% কমে যাওয়ার সম্পর্ক রয়েছে। ২০১৬ সালে ১৭৫ জন পুরুষের ওপর আরেকটি রিসার্চে (Kuo et al. 2016) এসেছে, সন্তানের কান্নার প্রতি পুরুষের রেসপন্স কেমন হবে, তা টেস্টোস্টেরোনের লেভেলের সাথে সম্পর্কিত। যাদের হরমোন বেশি তারা বাচ্চার কান্নাকে মনে করেছে বিরক্তিকর, আমার দ্বারা একে থামানো সম্ভব না। যাদের হরমোন কম তারা বেশি সেন্সিটিভ বাবা প্রমাণ হয়েছে।

ANN ARBOR (October 29, 2015), Low testosterone, men's empathy can determine parenting skills, Michigan News, University of Michigan.

[6] ১০২ জন নবজাতকের ওপর রিসার্চে এটা এসেছে (Connellan et al. 2000)। ৬ মাস বয়সী বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও একই ফল এসেছে (Alexander et al. 2009)

[7] কার্যগতভাবে compartmentalized ও specialized. নির্দিষ্ট স্থানই কেবল নির্দিষ্ট কাজে অংশ নেয়। মানে দেখতে পার্টিশন দেয়া নয় কিন্তু।

[8] Stoet, G., O'Connor, D.B., Conner, M. et al. Are women better than men at multi-tasking?. BMC Psychol 1, 18 (2013).

[9] রিসার্চে এসেছে, নারীরা মূল কাজের বাইরের খুঁটিনাটি দিয়ে (task-irrelevant spatial information) ডিফোকাস হয় ছেলেদের চেয়ে বেশি। একে বলা হচ্ছে 'সাইমন ইফেক্ট'। (Stoet 2017)

নারী-পুরুষে মৌলিক পার্থক্য নেই, এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করলেও বহুল আলোচিত আরেক রিসার্চে (Riley et al., 2016) ফাঁকতাল দিয়ে যা বেরিয়ে গেছে তা হলো : Sustained Attentional Control টেস্টে নারীরা Omission error বেশি করে, পুরুষেরা বেশি করে Commission error. মানে পুরুষ রেসপন্স করেছে কিন্তু ভুল করেছে, মানে এটেন্ড করেছে। আর Omission error হলো এটেন্ডই করেনি, মনোযোগই দেয়নি, ডিফোকাস ছিল বলে।

[10] Beeman and Bowden, 2000; Fink et al., 1996, 1999. Cahill and van Stegeren, 2003, 2004; Kilpatrick et al., 2006.

[11] ইস্ট্রোজেন হরমোন এই দ্বিধার (inhibition of prepotent responses) জন্য দায়ী। ইস্ট্রজেন হরমোন যত বেশি, নারী তত বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে স্থিতিশীলতা থেকে নমনীয় হতে থাকে (women are biased towards cognitive flexibility rather than cognitive stability)। (Stoet 2017)

[12] সাধারণভাবে নারী বেশি আবেগপ্রবণ (impulsive) পুরুষের চেয়ে। Barratt Impulsivity Scale-এ ২৭-৫১ বছরের নারীদের আবেগ একই বয়সী পুরুষের চেয়ে বেশি। (Marazziti et al., 2010)

[13] অক্সিটোসিন হরমোনের প্রভাবে। এর নর্মাল লেভেল 1.25–5 pg/mL. মেয়েদের ডিম্বপাতের সময় 5–10 ng/mL মানে দ্বিগুণ হয়ে যায়। (Appendix, Molina ২০১৩) আর পুরুষে থাকে রেঞ্জের নিচের দিকে 1.53 ± 1.18, মেয়েদের থাকে উপরের দিকে 4.53 ± 1.18। (Marazziti ২০১৯)

[14] University College London এর গবেষকরা খুব ইন্টারেস্টিং একটা রিসার্চ করেন মেয়েদের ওপর। ৩৪ জন নারীকে জোড়া জোড়া করে দিয়ে কিছু কাজ দেওয়া হয় তাদের সহযোগিতার মনোভাব বুঝতে। তাদেরকে টেস্টোস্টেরোন সাপ্লিমেন্ট দেওয়া হয়। যেদিন দেওয়া হয়নি সেদিন তাদের সহযোগিতার মনোভাব ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু যেদিন টেস্টোস্টেরোন দেওয়া হয়েছে, সেদিন তারা অসহযোগিতা দেখিয়েছে, সঙ্গীর চেয়ে নিজের সিদ্ধান্তেই অটল থেকেছে, ইগো প্রদর্শন করেছে (egocentrically)। (Tajima-Pozo ২০১৫)

সমকামিতাকে নিয়ে বাংলাদেশেও কাজ হচ্ছে।একে প্রসারের জন্য এক দল গুরুত্বের সাথেই কাজ করে যাচ্ছে। বাচ্চাদের মূল পাঠ্যপুস্তকে সমকামিতাকে নিখুঁতভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে । চলুন দেখা যাক,

[৭ম শ্রেণীর ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ের ছবিটা দেখুন]

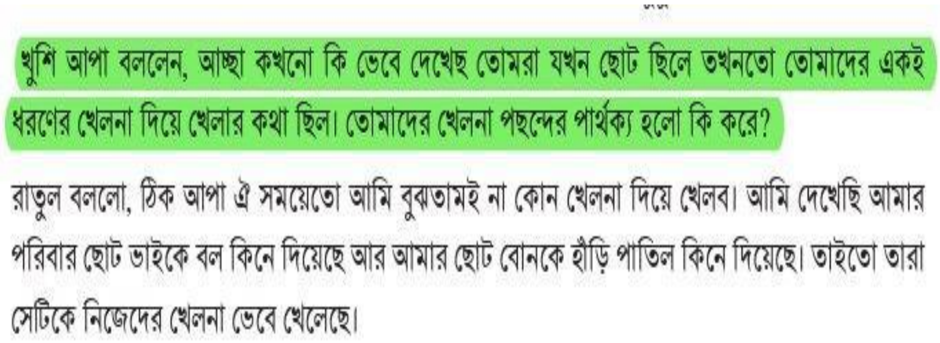

খুশি আপা বললেন, আচ্ছা কখনো কি ভেবে দেখেছ তোমরা যখন ছোট ছিলে তখনতো তোমাদের একই ধরণের খেলনা দিয়ে খেলার কথা ছিল। তোমাদের খেলনা পছন্দের পার্থক্য হলো কি করে?

রাতুল বললো, ঠিক আপা ঐ সময়েতো আমি বুঝতামই না কোন খেলনা দিয়ে খেলব। আমি দেখেছি আমার পরিবার ছোট ভাইকে বল কিনে দিয়েছে আর আমার ছোট বোনকে হাঁড়ি পাতিল কিনে দিয়েছে। তাইতো তারা সেটিকে নিজেদের খেলনা ভেবে খেলেছে।

আজ থেকে ৩০ বছর আগের বস্তাপচা সোশ্যাল কনস্ট্রাকশন থিওরি বাচ্চাদের কচিমনে সত্য হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে, যা গত ২০ বছর ধরে মিথ্যা প্রমাণিত হচ্ছে একের পর এক রিসার্চে।

মায়ের পেট থেকেই একই ধরনের খেলনা দিয়ে তাদের খেলার কথা ছিল না। একই ধরনের খেলনা দিয়ে ছেলেবাবু-মেয়েবাবু যে খেলে না, ছেলেরা গাড়ি আর মেয়েরা পুতুল দিয়ে খেলে, এই পার্থক্য বাচ্চারা মায়ের পেট থেকেই নিয়ে আসে (Cherney & London, 2006; Davis & Hines, 2020; Hines & Davis, 2018; Todd et al., 2017) ।[১]

বিজ্ঞান আমাদেরকে বলছে, ছেলেশিশু-মেয়েশিশুর শারীরিক এবং মানসিক গঠন মায়ের পেট থেকেই ভিন্ন। মায়ের পেটে ছেলেশিশুর বয়স যখন ৬-৭ সপ্তাহ (৪২ দিন) তখন তার Y ক্রোমোসোমে SRY নামক একটা জিনের কারণে ছোট্ট কুঁড়ির মতো অণ্ডকোষ থেকে বের হতে থাকে টেস্টোস্টেরোন নামক হরমোনের বন্যা [২]। রক্তে ছড়িয়ে পড়ে সেই হরমোন মগজের গঠনে বিশেষ বিশেষ পরিবর্তন আনে (Lombardo et al. 2012)। পুরুষ হরমোন টেস্টোস্টেরোনের প্রভাবে ছেলেরা মায়ের গর্ভেই হয়ে ওঠে পুরুষ। [৩]

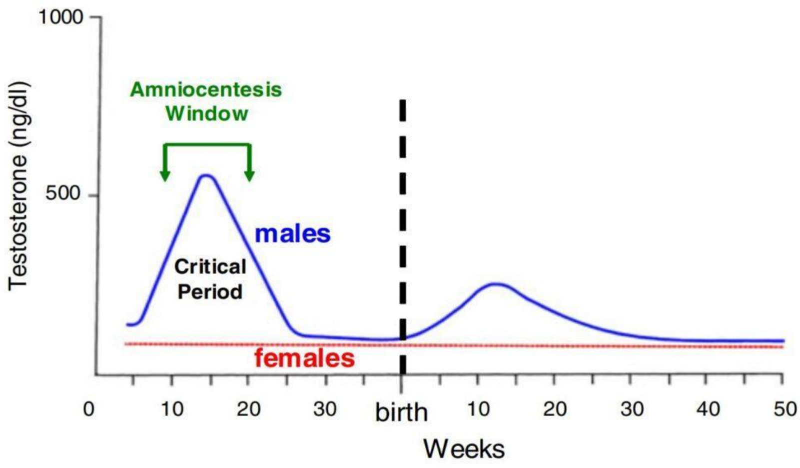

একইভাবে নারী হরমোন ইস্ট্রোজেনের প্রভাবে মেয়েদের ব্রেইন মাতৃগর্ভেই হয়ে ওঠে নারী। (Hara et al., 2015, Peper et al., 2011; Galea et al., 2013) [৩]

গত ২০ বছর যাবৎ ভুল-মিথ্যা প্রমাণিত তথ্য দিয়ে আমাদের সন্তানকে বুঝানো হচ্ছে: তুমি জন্ম থেকে পুরুষ নও, তোমাকে এই সমাজ-পরিবার পুরুষের খেলনা-পোশাক এসব দিয়ে পুরুষ হতে বাধ্য করেছে। বলা হচ্ছে, ছেলে আর মেয়েদের যে আলাদা আচরণ তা সমাজের চাপিয়ে দেয়া। মিথ্যা তথ্য দিয়ে প্রচলিত প্রথা-পদ্ধতি ও রীতিনীতির প্রতি বাচ্চার মনে সন্দেহ সৃষ্টি করা হচ্ছে পরিকল্পিতভাবে। কতবড় সর্বনাশ করা হচ্ছে আমাদের সন্তানদের যে, তারা নিজেদের লিঙ্গ নিয়েই সন্দেহে পড়ে যাবে?

এই পৃষ্ঠাটা খুবই ভয়ংকর। মগজধোলায়ের সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো, উত্তর দেবার বদলে মাথায় কোশ্চেন ঢুকিয়ে দেয়া। এই কাজটাই এখানে করা হয়েছে। উত্তর পাবার চেয়ে বাচ্চাদের মনে প্রশ্ন তোলা, তার মনে সংশয় জাগানোটাই ধর্মহীনদের মূল উদ্দেশ্য। দেখবেন নাস্তিকরাও একই কাজ করে, প্রশ্ন জাগায়। কিন্তু উত্তর নেয় না।

মানুষে মানুষে সাদৃশ্য ও ভিন্নতা

খুশি আপা তখন বললেন, কয়েকটা প্রশ্নের মাধ্যমে আমরা চিন্তার খোরাক পেতে পারি। ওরা সবাই মিলে নিচের প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করলো।

- আমরা নিজেদের ছেলে এবং মেয়ে বলে আলাদা করে চিনি কীভাবে?
- ছেলে বা মেয়ে হিসেবে আমরা আমাদের পছন্দের পোশাক, রং, খেলনা, কাজগুলো কী নিজেরাই পছন্দ করি?
- ছেলেদের খেলনা-মেয়েদের খেলনা, ছেলেদের কাজ-মেয়েদের কাজ কিসের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট করি?
- একজন মানুষকে বাইরে থেকে দেখেই কি সব সময় সে ছেলে না মেয়ে তা বোঝা যায়?
- অন্যরা আমাদের সম্পর্কে কী ভাবছে তা আমাদের লিঙ্গগত পরিচয়কে কীভাবে প্রভাবিত করে?
- এমনটা কি হতে পারে যে, কাউকে আমরা তার শারীরিক বৈশিষ্ট্য দেখে, গলার স্বর শুনে ছেলে বা মেয়ে বলে ভাবছি কিন্তু সে নিজেকে ভিন্ন কিছু ভাবছে?

এই প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর জেনে নিন ও বাচ্চাদের জানান।

প্রশ্ন ১: আমরা নিজেদের ছেলে ও মেয়ে বলে আলাদা করে চিনি কীভাবে?
উত্তর: আমাদের জন্মলিঙ্গ দেখে আমরা ছেলে-মেয়ে চিনি।

প্রশ্ন ২: ছেলে বা মেয়ে হিসেবে আমাদের পছন্দের পোশাক, রং, খেলনা, কাজগুলো কি নিজেরাই পছন্দ করি?
উত্তর : হ্যাঁ, আমরা নিজেরাই পছন্দ করি। কেননা মায়ের পেট থেকেই আমরা আমাদের আলাদা পছন্দ নিয়ে আসি (Cherney & London, 2006; Davis & Hines, 2020; Hines & Davis, 2018; Todd et al., 2017)। জন্মের পর মা-বাবা এতে আরও সাহায্য করেন।

প্রশ্ন ৩: ছেলেদের খেলনা মেয়েদের খেলনা, ছেলেদের কাজ মেয়েদের কাজ কীসের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট করি?
উত্তর: খেলনা-কাজ ইত্যাদির পছন্দের যে পার্থক্য, সেটাও আমরা মায়ের পেট থেকেই নিয়ে আসি। আমাদের ব্রেইনের গঠন জন্মের আগে থেকেই ভিন্ন। সে হিসেবে আমাদের চিন্তার প্রক্রিয়া, স্মৃতি, আগ্রহ, ঝোঁক, দক্ষতা মায়ের পেট থেকেই ভিন্ন। সমাজ একে আরও বেগবান করে মাত্র। (Lombardo et al. 2012, Hara et al., 2015, Peper et al., 2011; Galea et al., 2013, Cherney & London, 2006; Davis & Hines, 2020; Hines & Davis, 2018; Todd et al., 2017)

প্রশ্ন ৪: একজন মানুষকে বাইরে থেকে দেখেই কি সবসময় বুঝা যায় সে ছেলে না মেয়ে?
উত্তর: বুঝা যাওয়া উচিত। সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ (৯৯.৫০%) যে ভিতরে নারী সে বাইরেও নারী হবেন। যে বাইরে পুরুষ, তিনি ভিতরেও পুরুষ হবেন। সামান্য কিছু মানুষে সমস্যা থাকতে পারে, যেটা বয়ঃসন্ধিকালে এমনিতেই কিংবা সার্জারির মাধ্যমে স্পষ্ট করা সম্ভব। ১৮ কোটি মানুষের মাঝে মাত্র সাড়ে ১২ হাজার হিজড়া, যাদের অপারেশানের মাধ্যমে স্বাভাবিক নারী/পুরুষের জীবন দেয়া সম্ভব। এদেরকে আলাদা বৈচিত্র্য হিসেবে আলাদা করে দেবার প্রয়োজন নেই। [সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়]

প্রশ্ন ৫: অন্যরা আমাদের সম্পর্কে কি ভাবছে, তা আমাদের লিঙ্গ পরিচয়কে কীভাবে প্রভাবিত করে?
উত্তর: অন্যরা কি ভাবছে তা আমার লিঙ্গ পরিচয়কে প্রভাবিত করে না। বরং আমি কী করছি সেটা তাদের ধারণাকে প্রভাবিত করে। আমার জন্মলিঙ্গ যা, আমার কর্মলিঙ্গও সেটাই হওয়া উচিত। এর উল্টোটা আমার শরীরের জন্যও খারাপ, আমার পরিবারের জন্যও খারাপ, সমাজের জন্যও খারাপ।

প্রশ্ন ৬: এমনটা কি হতে পারে যে, কাউকে আমরা তার শারীরিক বৈশিষ্ট্য দেখে, গলার স্বর শুনে ছেলে বা মেয়ে বলে ভাবছি কিন্তু সে নিজেকে ভিন্ন কিছু ভাবছে?
উত্তর: এমনটা হলে সে অসুস্থ। তার দ্রুত চিকিৎসা প্রয়োজন। যথাযথ চিকিৎসার দ্বারা তার অসুস্থ চিন্তাকে সুস্থ করতে হবে। তার অসুস্থ চিন্তাকে কোনোরকম পাত্তা দেয়া যাবে না। কেননা ৭০% এমন বিকৃত ভাবনা (Gender dysphoria) বয়ঃসন্ধিকালে এমনিতেই ভালো হয়ে যায়। একে বলে Desistance. বাকি যারা আছে, তাদেরকেও থেরাপির মাধ্যমে সুস্থ চিন্তায় ফেরানো সম্ভব।

উত্তরগুলো জেনে নিকটস্থ বাচ্চাদের জানিয়ে দিন। শিক্ষকদের কাছে পৌঁছান।

রেফারেন্স

[১]

Cherney, I. D., & London, K. (2006). Gender-linked differences in the toys, television shows, computer games, and outdoor activities of 5- to 13-year-old children. Sex Roles: A Journal of Research, 54(9-10), 717–726.
Davis, J. T. M., & Hines, M. (2020). How large are gender differences in toy preferences? A systematic review and meta-analysis of toy preference research. Archives of Sexual Behavior, 49(2), 373–394.
Todd, Brenda & Fischer, Rico & Costa, Steven & Roestorf, Amanda & Harbour, Kate & Hardiman, Paul & Barry, John. (2017). Sex differences in children's toy preferences: A systematic review, meta-regression, and meta-analysis. Infant and Child Development. 27. e2064.
[২] Endocrinology of the mammalian fetal testis. (O'Shaughnessy 2011, Ivell 2017)

[৩] Lombardo, M. V., Ashwin, E., Auyeung, B., Chakrabarti, B., Taylor, K., Hackett, G., Bullmore, E. T., & Baron-Cohen, S. (2012). Fetal testosterone influences sexually dimorphic gray matter in the human brain. The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 32(2), 674–680.

[৪] ব্রেইন জুড়ে প্রচুর ইস্ট্রোজেন রিসেপ্টর ছড়িয়ে রয়েছে (Hara et al., 2015)। যা দ্বারা জরুরি সব প্রক্রিয়া সম্পাদিত হয় যেমন : জ্ঞান আহরণের প্রক্রিয়া বা ইন্দ্রিয়-ভাবনা-অভিজ্ঞতার আলোকে কিছু বুঝে নেওয়া (cognition), উদ্বেগ-টেনশন, দেহ-তাপমাত্রা, খাদ্যাভ্যাস, যৌন আচরণ (Do Rego et al., 2009)। এর প্রভাবে ব্রেইনের গঠন পরিবর্তন হয়ে যায় (Goldstein ২০০১) এবং সারা জীবনই ব্রেইন ও আচরণকে এই হরমোন নানাভাবে প্রভাবিত করতে থাকে (potent modulators of brain plasticity across the life-span) (Peper et al., 2011; Galea et al., 2013)।

ফেমিনিজম বা নারীবাদ

স্বাধীনতা, সমতা ও উন্নতির পাশ্চাত্য ধারণার সাথে নারীবাদী আন্দোলনের সম্পর্কটা সুস্পষ্ট। ফেমিনিস্টদের দাবির প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যায়। তাদের প্রতিটি দাবির পেছনেই এই বিশ্বাসগুলো কাজ করে। নারীবাদ সৃষ্টির পেছনে ইউরোপের বর্বরতার ইতিহাস থাকলেও পাশ্চাত্য বিশ্বাসই এটাকে স্বতন্ত্র মতবাদ কিংবা ইজমে রূপান্তরিত করেছে। ইউরোপের খ্রিষ্টানসমাজে নারী নির্যাতনের ইতিহাস অনেক পুরোনো। খ্রিষ্টানসমাজের নারীরা এই নিপীড়নমূলক অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য নিজেদের বিকৃত ধর্মে এর সমাধান খোঁজে। সেখানে কোনো সমাধানের অস্তিত্ব তারা পায়নি। নিজেদের মূল্যায়ন ও উল্লেখযোগ্য কোনো অধিকারেরও সন্ধান পায়নি তারা খ্রিষ্টধর্মে। তখন তারা মুক্তির জন্য পাশ্চাত্যের ঘোষিত মূলনীতি বেছে নেয়। গ্রহণ করে পাশ্চাত্যের স্বাধীনতা, সমতা আর উন্নতির বস্তাপচা ধারণা। পুরো নারীবাদকে আমরা ৩টি দাবি কিংবা স্লোগানের ভেতর দিয়ে দেখতে পারি।

এক

নারী তোমার উপর থাকতে পারবে না কারো কর্তৃত্ব, তুমি স্বয়ংসম্পূর্ণ। তোমার কারো প্রয়োজন নেই। স্বামী, সন্তান, পরিবার সবই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চাপিয়ে দেওয়া বিষয়।

নারীবাদীদের এমন স্লোগানের মূলে রয়েছে পাশ্চাত্য স্বাধীনতার দর্শন। কি ধর্ম, কি পরিবার আর কি সমাজ, কারো বেঁধে দেওয়া ভালো-মন্দে নারী বিশ্বাসী হতে পারে না। সে যা ভালো মনে করবে, তা-ই করবে। নারী যখন এই পাশ্চাত্য স্বাধীনতাকে গ্রহণ করতে চাইবে তখন ঘরে অবস্থান, পরিবার পরিচালনা, পুরুষের অভিভাবকত্ব গ্রহণের মতো আল্লাহপ্রদত্ত বিষয়গুলো পরাধীনতা কিংবা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চাপিয়ে দেওয়া বোঝাই মনে হবে। পর্দার বিধানকে সে শেকল আর বস্তাবন্দি বলে আখ্যায়িত করবে। আর এভাবেই সে আল্লাহপ্রদত্ত কর্তৃত্ব থেকে বেরিয়ে পাশ্চাত্যের দাসত্বে প্রবেশ করে আর নিজেকে স্বাধীন ভাবতে শুরু করে। নারীবাদীরা তাদের নিজস্ব প্রকৃতি ছেড়ে পুরুষের প্রকৃতি গ্রহণ করতে চায়। নিজেদের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্জন করে পুরুষের অনুকরণ করতে চায়। এখানে কোনো স্বকীয়তা নেই, নেই কোনো অনন্যতা। একজন নারীবাদী নারী তার স্বামীকে খদ্দেরের চেয়ে বেশি কিছু ভাবতে পারে না, যেখানে কারেন্সি বা বিনিময়ই মুখ্য। প্রেম, ভালোবাসা, মমতা ও দায়িত্ববোধের সেখানে কোনো বালাই নেই।

তাদের সকল সমস্যা নারীর আল্লাহপ্রদত্ত মাতৃত্ববোধের সাথে। পরিবারকে খুশি রাখা, সংসারের প্রতি মনোযোগী হওয়া, সন্তান প্রতিপালন করার ব্যাপারে সিরিয়াস থাকাই তাদের কাছে পরাধীনতা; অথচ এগুলো নারীর সহজাত ভূমিকা। তাদের কাছে একজন নারীর স্বাধীনতা হলো নগদ বিনিময় প্রাপ্তি, এমনকি যদি তা হয় দেহসর্বস্ব বিলিয়ে দেওয়ার মাধ্যমেও। নারীবাদ হলো চরম ভোগবাদী চিন্তাভাবনা। মেকআপ, ড্রেসিং, ইনকাম, দেহ আর বিচরণ স্বাধীনতার মাঝেই আটকে আছে তাদের পরিচয়। তারা মনে করে এগুলো করতে পারাই একজন নারীর সফলতা!

দুই

নারী! একজন পুরুষ কখনোই তোমার আস্থার জায়গা হতে পারে না। এজন্য তুমি তার উপর নির্ভর না করে বরং তার প্রতিদ্বন্দ্বী হও। প্রতিটিক্ষেত্রেই তার সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হও। তাল মিলিয়ে চলো। এগিয়ে যাও তাকে পেছনে ফেলে।

এই স্লোগানটি দেখবেন পাশ্চাত্য সমতার সাথে সম্পৃক্ত। ভালো-মন্দ নির্ধারণ করার যখন সবার ক্ষমতা ও স্বাধীনতা রয়েছে, তখন একজন নারী কেন তার স্বাধীনতা (নিজের ভালো-মন্দ নির্ধারণ করার ক্ষমতা) ভোগ করবে না। কেন এখানে নারী-পুরুষের ব্যবধান সৃষ্টি করা হবে? পুরুষ কেন উত্তরাধিকার সম্পত্তি নারীর চেয়ে বেশি পাবে? পুরুষ বাইরে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারলে নারী কেন পারবে না?

পাশ্চাত্য সমতাকে স্ট্যান্ডার্ড মেনে নিলে এরকম নানান জায়গায় প্রশ্ন আসবে, যেখানে নারী-পুরুষের বিধান ও অধিকারের মাঝে ব্যবধান রয়েছে। কারণ ইসলাম সমতাকে মানদণ্ড মানে না। ইসলাম সর্বদা ন্যায় ও ইনসাফের পক্ষে থাকে; সমতার সাথে নয়। কারণ প্রচলিত সমান অধিকারের ধারণা সব জায়গায় ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। ক্ষেত্রবিশেষ তা এক পক্ষের উপর জুলুম বয়ে আনে। যার যা প্রয়োজন এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ তাকে তা প্রদান করাই হলো ন্যায়। পুরুষকে স্ত্রী, মা, বাবাসহ পরিবারের সবার ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ইসলামে নারীকে কারো ব্যয় বহনের দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। এই দায়িত্ব আল্লাহকর্তৃক নির্ধারিত। কাজেই নারী যা পাবে, সবটাই তার সেভিং। সেখানে কারো প্রাপ্য অংশ নেই। ফলে পুরুষের টাকার প্রয়োজন বেশি এবং উপার্জন ও খাদ্যযোগানের জন্য তাকে আবশ্যিকভাবে নিয়মিত বাইরে যেতে হয়। এজন্য তাকে বেশি ভাগ দেওয়া হয়েছে এবং তাকে বাহির সামলানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বাহির সামলানোর দায়িত্ব নারীর নয়। তার

দায়িত্বের জায়গা পরিবার। ফলে তাকে ঘরে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বামীর ভরণ-পোষণই তার জন্য যথেষ্ট। আর বাবার সম্পত্তি তার জন্য অতিরিক্ত। সম্পত্তির ভাগে তাকে কম দেওয়াটা অন্যায় নয়; বরং ন্যায়সঙ্গত। স্বামী যদি তার দায়িত্ব পালন না করে তা হলে স্ত্রীর অধিকার আছে তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবার। নারী পুরুষ কেউই সমান নয়। বরং একজন আরেকজনের জন্য পরিপূরক।

আধুনিক সময়ে এসে নারী পুরুষের এই সমতার প্রশ্ন শুধু বিধান এবং অধিকারেই সীমাবদ্ধ নেই। এখন সৃষ্টিগত এবং জিনগতভাবেই নারী-পুরুষের সমতার দাবি তোলা হচ্ছে। নারীবাদ ও তার পৃষ্ঠপোষকদের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, নারী-পুরুষের পার্থক্য নিছক একটি সামাজিক নির্মাণ বা সোসাল কন্সট্রাক্ট (জেন্ডার ধারণা)। আদতে এখানে বায়োলজিক্যাল কোনো ব্যবধান নেই। সমাজে প্রচলিত বৈষম্যের ফলেই একজন মেয়ে কোমল, ঘরের কোণে থাকতে পছন্দ-করা, মাতৃত্ব ইত্যাদি গুণসম্পন্ন মানবীতে পরিণত হয়। নতুবা সেও ছেলেদের মতো বহির্মুখী ও পুরুষালি গুণাবলির অধিকারী হতো। আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই মিথের পক্ষে পশ্চিমা রিসার্চ পেপারও পাওয়া যায়। বড় অদ্ভুত তাদের গবেষণা! বড় অদ্ভুত তাদের সমাজবিজ্ঞান! আদতে বর্তমান বিজ্ঞান আর গবেষণা- ৭৮ প্রতিষ্ঠানগুলো চলে ক্ষমতা আর মিথ্যাচারের উপর। পৃথিবীর সমস্ত কর্মকাণ্ড একসেট মিথ্যাচারের উপর ভিত্তি করে মুষ্টিমেয় মানুষের স্বার্থ রক্ষার জন্য পরিচালিত হচ্ছে। মিডিয়া, বিজ্ঞান, অর্থনীতি সবকিছু পাশ্চাত্য ধ্যানধারণা রক্ষার জন্য পাশ্চাত্য পক্ষপাতদুষ্ট গবেষণা ও ফল প্রকাশ করে। এটা তারা করে আসছে যুগ যুগ ধরে। নতুবা ডোনেশনেরঅভাবে বন্ধ হয়ে যাবে বেশ্যাবৃত্তির মতো এই অদ্ভুত বিজ্ঞানচর্চা। ১৯ এজন্যই বলি, বিজ্ঞান দিয়ে ইসলামকে প্রশ্নবিদ্ধ করার আগে বিজ্ঞানের সত্যতা নিশ্চিত করে নেওয়া দরকার। বিজ্ঞান অকাট্য কোনো বিষয় নয় যে, তার সবকিছু চিরসত্য হবে। কিন্তু ইসলাম চিরসত্য এবং অকাট্য।

তিন

নারী! তোমার অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতাই তোমার সম্মানের একমাত্র উপায়। অন্যের আয়ের উপর নির্ভরশীল হলে মানে তুমি নিজের সম্মান হারালে। এজন্য তোমাকে নিজস্ব অর্থনৈতিক আয়ে স্বাবলম্বী হতে হবে।

নারীবাদীদের এই স্লোগানটির সম্পর্ক পাশ্চাত্য আকিদার তৃতীয় বিষয় তথা উন্নতির সাথে, যেখানে উন্নয়নকে মাপা হয় কেবল জিডিপি আর জিএনপির স্কেলে। ফলে পরিবারের আঙিনায় নারীর ভূমিকার মূল্যায়ন করা হয় না পাশ্চাত্য সমাজে। নারীকে ঘর থেকে বের করে কর্মস্থলে আনতে পারাটাই যেন দেশের উন্নয়ন এবং নারী অধিকারের বাস্তবায়ন। এগুলোকে উন্নয়ন তখনই মনে হবে যখন পাশ্চাত্যের উন্নতিকে বিশ্বাস করা হবে। উন্নতির ইসলামি স্কেল দিয়ে দেখলে আপনি নারীর সামাজিক ও পরিবারিক অধিকার, তার মাতৃত্বের সংরক্ষণ, পরিবার গোছানো, সন্তান প্রতিপালন এবং শিশুর সুস্থতা ও পূর্ণাঙ্গ মানসিক বিকাশের মাঝেই উন্নতি খুঁজে পাবেন। নারীর ক্যারিয়ারের সম্পর্ক তার মাতৃত্বের সাথে; মাথাপিছু আয় বাড়ানোর সাথে নয়। মাতৃত্ব-ই নারীর ক্যারিয়ার। এই পুঁজিবাদী বিশ্বে নারীর পারিবারিক ভূমিকার কোনো বাজারমূল্য নেই। নেই পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে এর হিসাব। কিন্তু ইসলামে এর কোনো বিকল্প নেই। পুঁজি দিয়ে সমাজ ও পরিবারের প্রতি নারীর এই অবদান ক্রয় করা সম্ভব নয়। বাজারমূল্যের চেয়েও অনেক ঊর্ধ্বের বিষয় এই ভূমিকা, যাকে পরিমাপ করার মতো ভারী কোনো মানদণ্ড নেই পাশ্চাত্য সমাজে। অথচ আলকুরআন ছোট্ট একটি বাক্যে কত সুন্দর মূল্যায়ন করেছে। ইরশাদ হয়েছে, 'তোমরা একে অন্যের পরিপূরক। একজনের কমতিকে ৮০ আরেকজন পূরণ করো, এভাবে তৈরি হয় পরিপূর্ণতা।'

আপনি যদি পাশ্চাত্যের মাপকাঠিতে শ্রেষ্ঠ নারী খোঁজেন তা হলে খাদিজা, আয়েশা, ফাতেমার মতো উম্মাহর আদর্শ মেয়ে, স্ত্রী ও মায়েদের শ্রেষ্ঠ হিসাবে আবিষ্কার করতে পারবেন না। তাদেরকে আপনার কাছে সেকেলে, বস্তাবন্দি, অসহায়, ব্যর্থ মনে হবে। অথচ এই পৃথিবীতে তারাই সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন নারী। একজন নারী যতই মমতাময়ী ও সাংসারিক হোক, আদর্শে-চরিত্রে-গুণে যতই উন্নত হোক, পাশ্চাত্যের মানদণ্ডে সে ব্যর্থ নারী; যদি না সে টাকা কামাই করছে। কাজে-কর্মে আত্মবিশ্বাসী একজন সফল গৃহিণীও এই মানদণ্ডে ব্যর্থ ও অসফল। এখানে ক্যারিয়ারই সবকিছু। এজন্য দেহ বিক্রি করে, হাজারো পুরুষের সাথে ঢলাঢলি করে যেসব নারী কথিত ক্যারিয়ার গড়ছে, নারীবাদীদের দৃষ্টিতে তারাই সফল। তারাই ফেমিনিস্টদের আইডল। তাদের মতে অর্থই নির্ধারণ করবে নারীর মূল্যমান।

ফেমিনিজমের মোকাবিলায় পাশ্চাত্যের এই বিশ্বাসগুলোতে আঘাত করার পাশাপাশি আমাদের ইসলামপ্রদত্ত নারী অধিকার সমাজে বাস্তবায়ন করার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। এই জায়গাটায় আমাদের চরম পর্যায়ের অবহেলা রয়েছে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, পার্শ্ববর্তী শিরকি সমাজের প্রভাবে এবং ইসলাম পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠিত না থাকার কারণে যুগ যুগ ধরে আমাদের সমাজে নারীদের সাথে এমন কিছু বিষয় জুড়ে দেওয়া হয়েছে, যা ইসলামে অনুমোদিত নয়। অথচ সাধারণ মুসলিমরা এগুলো ইসলামি নির্দেশনা বলে বিশ্বাস করে আসছে। যেমন মহর আদায়ে গড়িমসি করা, সম্পদের মিরাস এবং পারিবারিক অধিকার যথাযথরূপে আদায় না করা। আমরা যখন পশ্চিমা নারীবাদের বিরুদ্ধে কথা বলব তখন ইসলামপ্রদত্ত নারীর অধিকারসমূহ বাস্তবায়নের প্রতি গুরুত্ব না দেওয়া একপ্রকার ভণ্ডামি।

বর্তমান মুসলিমসমাজে নারীরা যে দুটি প্রাপ্য থেকে সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত হচ্ছে, তা হলো মহর এবং উত্তরাধিকার সম্পত্তি। নারীদের মিরাস চাওয়াকে নির্লজ্জতা এবং ঘৃণার চোখে দেখা হয়। ভাইয়েরা ইমোশনাল ব্লাকমেইল করে দায়সারাভাবে কিছু টাকা দিয়ে বোনদের এই অধিকার কেড়ে নেয়। তাদেরকে বঞ্চিত করে প্রাপ্য অধিকার থেকে। আর স্বামীরা মহরকে অঘোষিতভাবে রহিতই করে দিয়েছে সমাজ থেকে। মহর এখন কাগুজে সংখ্যা ছাড়া কিছুই না। অনেকে তো সারাজীবন স্ত্রীর ভরণ- পোষণকেই মহর হিসেবে গণ্য করে থাকে। অথচ স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ও বাসস্থান স্বামীর উপর আলাদা ওয়াজিব। মহরের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

আমাদের সমাজে নারী নির্যাতন ও হেনস্তার অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হলো যৌতুক। পূর্বনির্ধারিত কিংবা কাঙ্ক্ষিত অর্থ বা বস্তু না পেলে সারাজীবন বউয়ের উপর এর শোধ তোলে স্বামীর পরিবার। যৌতুকের জের ধরে বহু নারী অকালে ঝরে পড়ে। অসংখ্য নারী শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়। আবার অনেকে সারাজীবন হজম করে যায় নানারকম খোটা ও কটু কথা। নারীর উপর এই যৌতুকের বোঝা ইসলাম চাপিয়ে দেয়নি। দিয়েছে হিন্দুপ্রভাবিত সমাজ। ইসলামে যৌতুকের অর্থ সম্পূর্ণ হারাম। স্ত্রীর পরিবারের পক্ষ থেকে স্বেচ্ছায় কোনো প্রকার উপঢৌকন এসে গেলে ভিন্ন কথা। কিন্তু চুক্তি করে কিংবা পূর্বাকাঙ্ক্ষা থেকে সম্পদ না পেয়ে স্ত্রীর উপর নির্যাতন চালানো কিংবা তাকে কটু কথা শোনানো সম্পূর্ণ জুলুম। ইসলামে এর কোনো বৈধতা নেই।নারী-পুরুষের ব্যাপারে যৌথভাবে ইসলামে যে নির্দেশনা রয়েছে, তাকে যদি কেউ একতরফাভাবে দেখে তা হলে সে ইসলামের ভারসাম্য বুঝতে পারবে না। যেমন: কেউ শুধু নারীদের প্রতি ইসলামের নির্দেশনা দেখল; তাদেরকে

স্বামীর সন্তুষ্টি হাসিলের নির্দেশ করা হয়েছে, ঘরের ভেতরই তাদের মূল অবস্থান স্থির করা হয়েছে ইত্যাদি; তখন সে ভাববে ইসলাম নারীদের অবহেলা করেছে এবং পুরুষদের বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। আবার কেউ পুরুষদের প্রতি ইসলামের নির্দেশনাগুলো দেখল; পুরুষদের চারিত্রিক সার্টিফিকেট বউদের হাতে, নারীর ভরণ-পোষণ, আবাসন, ঘরোয়া কাজসহ সবধরনের অর্থনৈতিক দায়ভার পুরুষদের কাঁধে তখন সে মনে করবে ইসলাম পুরুষদের উপর জুলুম করেছে। অথচ ব্যাপার তা নয়। ইসলাম একটি পরিপূর্ণ এবং সামগ্রিক জীবনব্যবস্থা। তার পূর্ণতা ও সামগ্রিকতা বাদ দিয়ে খণ্ডাংশ নিয়ে পড়ে থাকলে ফ্যাসাদ হবে। ইসলামের দৃষ্টিতে নারীপুরুষ কেউ কারো প্রতিদ্বন্দ্বী নয়; বরং একজন অপরজনের পরিপূরক। তাদের মধ্যকার সম্পর্কটা প্রতিযোগিতার নয়; ভালোবাসার। ৮১ ৮২ আল্লাহ বলেন, 'তোমরা একে অন্যের পোশাকস্বরূপ'।

দুইয়ে দুইয়ে চার নাকি পাঁচ?

নিরেট সেক্যুলারদের পাশাপাশি ইসলামিস্টের পোশাক পরা অনেক সেক্যুলারও এ যুক্তি দিয়ে থাকেন। এরকম একটা যুক্তি হল –

'কোন অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করলে আমরা আনন্দিত হই। অন্যদিকে কোন মুসলিম ইসলাম ত্যাগ করলে আমরা তার মৃত্যুদন্ডের কথা বলি। এটা তো স্ববিরোধি। আমাদের এই স্ববিরোধিতা ত্যাগ করা উচিৎ।

আরগুমেন্টা বহুল প্রচলিত এবং পুরনো। এটা লিবারেল-সেক্যুলার ডিসকোর্সের খুব পছন্দের একটা আরগুমেন্ট। এটা 'সহিষ্ণুতা', 'সম্প্রীতি' এবং রাষ্ট্র ও সমাজের সেক্যুলার চরিত্রের অন্যতম ভিত্তি। আজ ইসলাম নিয়ে বলা হলেও কয়েক শতাব্দী আগে খ্রিস্টধর্ম নিয়েও ঠিক একই যুক্তি দেয়া হচ্ছিল। যেমন – 'খ্রিস্টানরা জাপানে কিংবা আফ্রিকায় খ্রিস্টধর্ম প্রচার করছে। তাহলে ইউরোপে অন্য ধর্ম প্রচারে কেন বাঁধা দিচ্ছে? এমনটা হওয়া উচিৎ না। প্রত্যেক ধর্মের লোকেরা অন্য সব ধর্মের লোকদের এ অধিকার স্বীকার করে নেবে। এটা একধরনের পারস্পরিকতার (reciprocity) সম্পর্ক'।

এ যুক্তিকে প্রথম জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন সতেরশো শতাব্দীর ফ্রেঞ্চ দার্শনিক পিয়ের বেল। বেলের আরগুমেন্টের ওপর ভিত্তি করে আধুনিক সময়ে য়্যুরগ্যন হেইবারম্যাস, জন রলসসহ

অনেকে দাবি করেছেন, যদি এই পারস্পরিকতার মেনে নেয়া হয় তাহলে ধর্মীয় সহিষ্ণুতার একটা সর্বজনীন ভিত্তি পাওয়া যাবে। সংক্ষেপে, আজকের সেক্যুলার এবং ইসলামিস্ট সেজে থাকা সেক্যুলারদের মুখস্থ করা আরগুমেন্টের উৎস।

সেক্যুলার প্যারাডাইমে বেড়ে ওঠার কারণে আমাদের কাছে এ আরগুমেন্ট যৌক্তিক মনে হয়। স্বতঃসিদ্ধ মনে হয়। কারণ এই প্যারাডাইম চেতন এবং অবচেতনভাবে আমাদের চিন্তাকে প্রভাবিত করে। কিন্তু যদি দূরে সরে এসে দেখা হয়, তাহলে আরগুমেন্টটা আসলে এয়ারটাইট মনে হয় না। ইন ফ্যাক্ট, একটু খুটিয়ে দেখলে আমরা আবিষ্কার করবো, যৌক্তিক হবার ভান করলেও এটা আসলে কোন যুক্তিই না। বরং এক ধরনের ইনফরমাল ফ্যালাসি। সেক্যুলারিযমের এই উপসংহারের পেছনে একটা অ্যাসাম্পশান বা ধারণা আছে। সেই ধারনাটা হল - “সব ধর্ম সমান। সব ধর্ম একই শ্রেণীতে পড়ে। তাই সবাইকে সমানভাবে দেখা হবে"।

যদি আমরা মেনে নিতাম যে ইসলাম, খ্রিষ্টধর্ম, হিন্দুধর্ম, প্রকৃতিপূজা ইত্যাদি সমান – অথবা যথেষ্ট পরিমানে সাদৃশ্যপূর্ণ তাহলে সেক্যুলারিযমের এ যুক্তি খাটে। তাহলে মুসলিম দা’ঈ, খ্রিস্টান মিশনারী আর ইসকনের হয়তো তেমন কোন মৌলিক পার্থক্য থাকে না। কিন্তু এ জায়গাটাতেই আপত্তি। আমরা মনে করি না যে এই ধর্মগুলো সমান, এবং এগুলো একই শ্রেণী বা ক্যাটাগরিতে পরে। এগুলো সমান না, কারণ সত্য আর মিথ্যা সমান না। এগুলোর মধ্যে একটা হল চিরন্তন মুক্তির পথ আর বাকিগুলো দেবে চিরন্তন শাস্তির রাস্তা। এ দুটো ফলাফলকে ঠিক সমান বলা যায় না, তাই না?

কোন ছাত্র যদি, পারস্পরিকতা আর সহিষ্ণুতার দোহাই দিয়ে বলে, পরীক্ষায় সঠিক উত্তরের জন্যে যেহেতু নাম্বার দেয়া হয় তাই ভুল উত্তর দিলেও নাম্বার দেয়া উচিৎ, তাহল কি সেটা যৌক্তিক?

আমি দশজনের কাছে জানতে চাইলাম মুহাম্মাদপুর যাবার বাস কোনটা। নয়জন ভুল উত্তর দিলো। একজন ঠিক উত্তর দিলো। আমি কি সবগুলো উত্তরকে সমান ধরে নেবো? এগুলো সব একই প্রশ্নের প্রেক্ষিতে দেয়া উত্তর - এই অর্থে তারা সমান। কিন্তু সঠিক হবার দিক দিয়ে কি সবগুলো উত্তর সমান? অবশ্যই না। একটা সত্য, বাকিগুলো ভুল। একটা আপনাকে গন্তব্য নিয়ে যাবে। বাকিগুলোর অনুসরণ করলে আপনি পথ হারাবেন। ধর্মগুলো এই অর্থে সিমিলার যে, প্রত্যেক ধর্মের অনুসারী তার ধর্মে বিশ্বাস করে। কিন্তু এতোটুকুন সাদৃশ্য দিয়ে সহিষ্ণুতার প্রশ্নের সমাধান হয় না।

সেক্যুলাররা বিশ্বাস করে কোনটা সত্য, সেটা গুরুত্বপূর্ণ না। গুরুত্বপূর্ণ হল প্রত্যেক ধর্মের অনুসারী নিজ ধর্মকে সত্য বলে বিশ্বাস করে। এখানে কমন ফ্যাক্টর হল বিশ্বাস। তারা ধরে নেয় যে সব ধর্মই ভুল (নাস্তিকতা)। অথবা, কোন ধর্ম সঠিক আর কোন ধর্ম ভুল সেটা নিশ্চিতভাবে জানার কোন উপায় আমাদের নেই (অজ্ঞেয়বাদ)। তাই সব ধর্ম সমান।

ব্যাপারটা অনেকটা এমন যে, কোন ছাত্র এসে বললো-

মানুষ মাত্রই ভুল করে। শিক্ষকরাও মানুষ, তারাও ভুল করেন। তাই পরীক্ষার খাতা দেখার সময় উত্তর সঠিক নাকি ভুল, সেটা বিবেচ্য না। কারণ সঠিক কোনটা সেটা নিশ্চিতভাবে জানার কোন উপায় আমাদের নেই। নাম্বারিং করার সময় বিবেচ্য বিষয় হল যে লিখেছে, সে ঐ উত্তরকে সত্য মনে করে কি না। যেহেতু সে নিজের উত্তর ঠিক ভেবেছে ওটাই যথেষ্ট।

এ দাবি কি যৌক্তিক?

অথবা সেক্যুলারদের হৃদয়ের কাছের একটা উদাহরণ দেয়া যায়।
একদল মানুষ যেহেতু বিবর্তনবাদকে সত্য মনে করে, এবং আরেকদল যেহেতু বিবলিকাল ক্রিয়েশনিযমকে সত্য মনে করে। তাই স্কুলে দুটোই পড়াতে দেয়া উচিৎ। যে পরীক্ষায় বিবর্তনবাদের কথা লিখবে সেও ঠিক, যে বিবলিকাল ক্রিয়েশনিমষ বা ইন্টেলিজেন্ট ডিযাইনের কথা লিখবে সেও ঠিক। কারণ কোনটা সত্য সেটা নিশ্চিতভাবে জানার কোন উপায় আমাদের নেই। বিবেচ্য বিষয় হল ছাত্র তার উত্তরটা বিশ্বাস করে কি না। সেক্যুলাররা কি এটা মেনে নেবে?

কোনটা বিবেচ্য বিষয়, কোন জিনিসটা গুরুত্ব পাবে - সত্য নাকি বিশ্বাস – এই হল মতপার্থক্যের জায়গা। এই মতপার্থক্য নিয়ে কথা না বলে সহিষ্ণুতা আর সম্প্রীতির ভাঙ্গা রেকর্ড বাজিয়ে লাভ নেই। কারণ অনেক পরিশীলতা, সূক্ষতা আর বুদ্ধিবৃত্তিকতার দাবি করলেও সেক্যুলারিযম আসলে যা নিয়ে আসছে সেটা কোন আরগুমেন্টই না। বরং এক ধরনের সার্কুলার রিযনিং। যেটা তাদের উপসংহার সেটাকে প্রথমেই তারা প্রমাণিত সত্য বলে ধরে নিয়েছে -

যেহেতু সব ধর্ম সমান,

তাই সব মানুষের উচিৎ সকল ধর্মকে সমান গণ্য করা,
ধর্মের অনুসারীরা মানুষ। তাই ধর্মের অনুসারীদের উচিৎ বাকি সব ধর্মগুলোকে সমান মনে করা।

অদ্ভুত ব্যাপার হল বুঝে-না বুঝে ধরনের নিম্নমানের একটা হাতসাফাইয়ের পর ঔদ্ধ্যতের সাথে তাদের অপ্রমাণিত বিশ্বাসকে সত্য বলে মেনে না নেয়া সবাই বর্বর, হিংস্র, বোকা, মূর্খ ইত্যাদি প্রমাণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এবং দুঃখের বিষয়টা হল মুখস্থ অনুকরণ করে জাতে উঠতে চাওয়া পরাজিত মানসিকতার অনেক মুসলিম এই ধরনের কথাবার্তা বলাকে বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষ ভেবে বসে আছেন।

ধর্মের অপব্যাখ্যা' - ব্যাখ্যা দেবে কে?

সেক্যুলার-প্রগতিশীলদের এই আরগুমেন্টটার মূল অর্থের দিকে একটু তাকানো যাক।

সমাজ কিংবা রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত কোন আচার কিংবা প্রথার বিরুদ্ধে যদি ইসলামের জায়গা থেকে আপত্তি করা হয় তখন সেটাকে বলা হয় ধর্মের অপব্যাখ্যা।

কোন ধর্মের অপব্যাখ্যা? ইসলামের?

কিন্তু ইসলামের কোন ব্যাখ্যা সঠিক সেটা কে ঠিক করবে? অপব্যাখ্যা হচ্ছে, মুখস্থ বলে দিলেই তো হবে না। এখানে কিন্তু এক পক্ষ ধর্মের কথা বলছে না। দু পক্ষই ইসলামের ব্যাপারে একটা দাবি করছে।

এক পক্ষ বলছে কোন একটা কাজ করা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক।

আরেকপক্ষ বলছে, না ঐ কাজ সাংঘর্ষিক তো না-ই, বরং সাংঘর্ষিক বলাটাই ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা। এ দুই দাবির মধ্যে কোনটা ঠিক সেটা কে ঠিক করবে? কোন দাবি সঠিক সেটা কিসের ভিত্তিতে ঠিক করা হবে?

এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজায় সেক্যুলারদের আগ্রহ নেই। কারণ সহজ উত্তর হল এধরনের সব মতপার্থক্যের সমাধান করতে হবে কুরআন, সুন্নাহ এবং সালাফ আস-সালেহিনের অবস্থানের আলোকে। কিন্তু সেই সমাধানে সেক্যুলাররা সন্তুষ্ট না। সেই সমাধান মেনে নেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব না। তাই তারা এই আলোচনাতে যাবেই না। এ আলোচনাতে গেলেই তাদের মেনে নিতে হবে যে এই রাষ্ট্র এবং সমাজের অসংখ্য বিষয় ইসলামের সাথে, তাওহিদের সাথে সাংঘর্ষিক। আর সেটা মেনে নিলে তাদের ভাষ্যমতেই তারা রাতারাতি 'জঙ্গি' হয়ে যাবে।

তাই মুখে 'ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা' বললেও ওরা আসলে বোঝাতে চায় ইসলামের ভুল প্রয়োগ। কারণ ইসলামের প্রয়োগ কতোটুক পর্যন্ত জায়েজ হবে তার একটা ছক ঠিক করে রাখা আছে। সেই ছক ঠিক করে দিয়েছে সেক্যুলার রাষ্ট্র। এই ছক, এই সীমার বাইরে আসলেই সেটা ইসলামের ভুল প্রয়োগ। আমি যে পহেলা বৈশাখ কিংবা ভ্যালেন্টাইন্সের ব্যাপারে আপত্তি তুলছি, সেটা ইসলাম অনুযায়ী সঠিক কি না, সেটা তাদের কনসার্ন না। তাদের পয়েন্ট হল এটা সেক্যুলারিযম অনুযায়ী হালাল না। সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রথা ও প্রচলনের ব্যাপারে ইসলামের জায়গা থেকে কথা বলা হারাম। এটা পাপ, সীমালঙ্ঘন। শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সেক্যুলার রাষ্ট্র এই স্বাধীনতা মুসলিমদের দেবে না, দেয়নি।

কাজেই যখন বলা হয় 'এগুলো ধর্মের অপব্যাখ্যা' তখন আসলে ইসলামের জায়গা থেকে বলা হয় না, কথাটা বলা হয় সেক্যুলার ধর্মের জায়গা থেকে।

সেক্যুলারিজমের নামে ভণ্ডতা

সুইযারল্যান্ড মুসলিম ছাত্রদের জরিমানা করা শুরু করে ২০১৬-তে। তাদের অপরাধ? শিক্ষিকার সাথে হাত মেলাতে অস্বীকার করা। এই 'গুরুতর' অপরাধের কারণে মুসলিম ছাত্রদের ৫০০০ ডলার পর্যন্ত ফাইন করার আইন হয়।

আচ্ছা, মানুষকে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে আরেকজনের শারীরিক সংস্পর্শে আসতে বাধ্য করা কি একধরনের যৌন হয়রানি না? নারীবাদীরা তো ক্রমাগত পারস্পরিক সম্মতির গুরুত্ব নিয়ে চেঁচামেচি করে, কিন্তু এ বিষয়ে তারা মুখে কুলুপ এঁটে রইল কেন?

পশ্চিমা বিশ্বে এমনও মহিলা আছে, কথা বলার সময় চোখে চোখ রেখে না হাসলে যারা রীতিমতো অপমানিত বোধ করে। এটা নাকি অপমান, অশ্রদ্ধা! কী অদ্ভুত! তুমি যে ধরনের সামাজিক রীতিনীতিতে অভ্যস্ত কোনো কিছু সেটার সাথে না মেলা মানেই সেটা অশ্রদ্ধা? অপমান?

পশ্চিমারা একদিকে সহিষ্ণুতা, বহুত্ববাদ আর বৈচিত্র্যকে সম্মান করার কথা বলে। অন্যদিকে কোনো মুসলিম তার ধর্মের বিধান মেনে চললে সেটাকে অসহিষ্ণুতা বলে গলা ফাটায়। একজন মুসলিম আদৌ অসম্মান করতে চাচ্ছে কি না, সেটা ধর্তব্য না। আমার সংস্কৃতি অনুযায়ী আমার কাছে একে অসম্মান মনে হচ্ছে, তাই আমি এটাকে অসহিষ্ণুতা বলে চালিয়ে দেবো। আসলে সহিষ্ণুতা বলতে ওরা কী বোঝায়?

শিক্ষিকার হাত মেলাতে অস্বীকার করা কেন বেআইনি, তার পক্ষে সেক্যুলারদের পছন্দের আরেকটা যুক্তি আছে—

এর মাধ্যমে জেন্ডার রোল আর জেন্ডার সেগ্রেগেশানের ধারণাগুলো আরও পোক্ত হয়।

হ্যাঁ, তা তো হয়ই। সমাজে নারী-পুরুষের মেলামেশার ব্যাপারে ইসলামী বিধানগুলোর উদ্দেশ্যই হলো নারীপুরুষের মেলামেশা সীমিত করা। তুমি মুসলিম না তাই নারী-পুরুষের মেলামেশা সীমিত করার ব্যাপারটা তোমার কাছে খারাপ লাগতেই পারে। কিন্তু তাই বলে আমাকেও কেন সেটা খারাপ বলে মানতে হবে? তুমি অজ্ঞ, তোমার অজ্ঞতাকে আমার কেন মানতে হবে?

হ্যাঁ, তুমি বলতে পারো, এটা তোমাদের দেশ। তাই ইচ্ছেমতো আইন বানানোর অধিকার তোমাদের আছে। তোমাদের দেশে থাকতে হলে তোমাদের মূল্যবোধ আর তোমাদের নৈতিকতা মেনে নিয়েই থাকতে হবে।

ঠিক আছে, মানলাম।

তাহলে সৌদি আরব, ইরান কিংবা অ।ফগ।নিস্ত।ন যখন তাদের দেশে, তাদের পছন্দমতো আইন বানায় তখন কেন তোমাদের এত আপত্তি? তারা যখন তাদের মূল্যবোধ, বিশ্বাস আর

নৈতিকতা অনুযায়ী বাধ্যতামূলক ড্রেস কোড কিংবা জেন্ডার সেগ্রেগেশানের নিয়ম করে তখন কেন তোমাদের এত চেঁচামেচি?

এটা কি ভণ্ডামি না? ডাবল স্ট্যান্ডার্ড না?

একই কাজ তোমরা করলে উদারতা-সহিষ্ণুতা আর আমরা করলে সাম্প্রদায়িকতা? তোমরা তোমাদের পশ্চিমা মূল্যবোধ আর সংস্কৃতি অন্যের ওপর চাপিয়ে দিতে চাও। মুসলিমরা তাদের ইসলামী মূল্যবোধ এবং নৈতিকতা বাস্তবায়ন করতে চায়। একমাত্র পার্থক্য হলো, মুসলিমরা লুকোচুরি করে না। তারা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র আর ধর্মীয় স্বাধীনতার দোহাই দেয় না। নিজেদের বিশ্বাস আর উদ্দেশ্যের কথা আমরা সোজাসুজি স্বীকার করি।

ধর্মনিরপেক্ষতা আর ধর্মীয় স্বাধীনতার বুলি আওড়ালেও পশ্চিমা বিশ্ব মুসলিমদের ইসলামের বিধান মানতে বাধা দেয় এবং অনেক ক্ষেত্রে বিধান অমান্য করতে বাধ্য করে। এটাই প্রমাণ করে সেক্যুলারিসমের নিরপেক্ষতা আসলে মরীচিকা ছাড়া আর কিছুই না।

আসলে নিরপেক্ষতা বলে কিছু নেই। নিরপেক্ষতার নামে পশ্চিমারা তাদের মূল্যবোধ আর সাংস্কৃতিক রীতিনীতি অন্যদের ওপর চাপিয়ে দেয়। এ কারণেই ধর্মীয় স্বাধীনতার যুক্তি আওড়ে ইসলামের পক্ষে কথা বলার মানে হয় না।

ধর্মীয় স্বাধীনতার পুরো ধারণাটাই এসেছে একটা নির্দিষ্ট পশ্চিমা প্রেক্ষাপট ও দর্শন থেকে। যেখানে ধর্মের নির্দিষ্ট একটা সংজ্ঞা আর ব্যাখ্যা আছে। আর এই সংজ্ঞার জন্মও নির্দিষ্ট পশ্চিমা সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে। ধর্মীয় স্বাধীনতার ধারণার অবধারিত ফলাফল হলো কালচারের পরিবর্তনের সাথে সাথে যেকোনো কিছু ধর্মীয় স্বাধীনতার নামে চালিয়ে দেয়া।

শারীয়াহ

শারীয়াহ'র শাব্দিক অর্থ হলো ‘পথ’ বা ‘পথচলা’।

পারিভাষিক অর্থ,কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সকল বিধান,আইন-কানুন ও নির্দেশনা বুঝায়।এটি মূলত আল্লাহ তা'আলার নির্দেশিত পথ, যা মানুষকে জীবনের সঠিক পথে

পরিচালিত করে। শারীয়াহ শুধু ধর্মীয় বিধান নয়, বরং এটি মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, ব্যক্তিগত সকল ক্ষেত্রে জীবনযাপনের নির্দেশনা দেয়।

শারীয়াহর উৎস

কুরআন: আল্লাহর বাণী তথা কুরআন শারীয়াহের মূল উৎস।

সুন্নাহ: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, কাজ ও সমর্থন হলো সুন্নাহ।এটি শারীয়াহ বোঝার একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

ইজমা:আভিধানিক অর্থ-মিশ্রণ, সমাবেশ, ঐক্যমত, দৃঢ় সিদ্ধান্ত বা সংকল্প ইত্যাদি।
রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে শুরু করে যেকোনো যুগে কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে আহলে হক্ক মুজতাহিদ আলেমগণের সকলে যে কোনো শরয়ী বিষয়ে ঐক্যমতে উপনীত হওয়াকে ইজমা বলা হয়।

কিয়াস: শাব্দিক অর্থ অনুমান করা বা তুলনা করা।
আসল এর ইল্লতের(Reason) অনুরূপ(Reason) ইল্লত পাওয়ার ভিত্তিতে শাখার মধ্যে আসল এর অনুরূপ হুকুম প্রয়োগ করাকে কিয়াস বলে।
নতুন উদ্ভুত কোনো বিষয়/মাসয়ালাহকে ইসলামী শরীয়তের মূল ভিত্তি/উৎস কুরআন ও সুন্নাহ'য় বর্ণিত বিধিবিধান বা উসূলের আলোকে নিরীক্ষণ করে দেখা যে কুরআন বা সুন্নাহ'র কোন বিধান বা উসুলের সাথে সামঞ্জস্যতা রাখে এবং সে অনুযায়ী ওই উদ্ভুত বিষয়ের শরয়ী হুকুম কী হবে তাই স্থির করা।

শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলাম

পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলামের ভূমিকা দীর্ঘ আলোচনার দাবি রাখে। কারণ, ইসলাম মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রে সুদৃঢ়ভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছে। একমাত্র ইসলামই পেরেছে পৃথিবীর সকল মানুষের মাঝে শান্তি, নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে। এই সুবিশাল আলোচনা সামান্য পরিধিতে বর্ণনা করা সম্ভব নয়, বিধায় কয়েকটি বিষয়ে সামান্য আলোকপাত করেই ক্ষান্ত করছি।

ইসলামের প্রাথমিক ঘোষণা হলো, এ ধর্মের অনুসারী সকলে ইমান ও আকিদার ক্ষেত্রে সমান এবং তারা সবাই পরস্পর ভাই ভাই। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

'মুমিনরা তো পরস্পর ভাই-ভাই। '(সুরা আল-হুজুরাত: ১০)

ইসলাম আরও ঘোষণা করে যে, পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে পরস্পর পরিচিতি অর্জন ও ঐক্যবদ্ধভাবে বসবাস করার জন্য। এর মাধ্যমেই সকলের মাঝে শান্তি ও ভালোবাসা সৃষ্টি হবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

'হে মানবজাতি, আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হও। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সেই সর্বাধিক মর্যাদাবান, যে তাঁকে অধিক ভয় করে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন।'(সুরা আল-হুজুরাত: ১৩)

পারস্পরিক ভালোবাসা, মায়া-মমতা ও দয়ার অনুভূতি জাগ্রত করার জন্য আল্লাহ তাআলা মুমিনের অবস্থার বর্ণনা দিয়ে ইরশাদ করেন:

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

'মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল এবং তাঁর সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। '-সহিহুল বুখারি: ১/১২, হা. নং ১৩ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)

ইসলাম নিজের ওপর অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া, অপর ভাইকে পরিপূর্ণভাবে ভালোবাসা এবং অহংকার পরিহার করার প্রতি উৎসাহ দিয়েছে।

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত,রাসুলুল্লাহ ইরশাদ করেন:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

'তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে অপর ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে। '২৩৯

মুমিন ব্যক্তি তো নিজ জীবনকে অপর মুসলিমের প্রতি ভালোবাসা ও সৌহার্দ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত করবে। অপর মুসলিম ভাইয়ের সাথে আচার- আচরণ, লেনদেন ও চলাফেরার ক্ষেত্রে তাদের অবস্থা এমন হতে হবে,যেন সকলে পরস্পর ভাই ভাই। তাদের একে অপরের প্রতি কোনো হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না, থাকবে শুধু পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা ও পরোপকারিতা। কেউ কারও ওপর অত্যাচার ও সীমালঙ্ঘন করবে না। কারও সাথে কেউ দুরাচার দেখাবে না; বরং সকলে একটি দেহের মতো বসবাস করবে।

নুমান বিন বাশির থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ বলেছেন:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ الْوَاحِدُ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

'পারস্পরিক দয়া-ভালোবাসার ক্ষেত্রে মুমিনদের দৃষ্টান্ত একটি দেহের মতো। যখন দেহের একটি অঙ্গ রোগাক্রান্ত হয়, তখন অনিদ্রা ও জ্বরের মাধ্যমে পুরো দেহ সাড়া দেয়। '-সহিহু মুসলিম: ৪/১৯৯৯, হা. নং ২৫৮৬ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

যেহেতু মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ক হচ্ছে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ, সেহেতু একজন মুসলমান কখনো তার অন্য ভাইয়ের ওপর জুলুম করতে পারে না। বিপদে তাকে একা ছেড়ে দিতে পারে না; বরং সে অপর মুমিন ভাইয়ের প্রতি সাহায্য-সহায়তার হাত বাড়াবে, যেন তার কষ্ট ও মুসিবত সহজ হয়ে যায় এবং দুঃখ-বেদনা দূর হয়ে যায়।

জাবির (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার ভাইয়ের ওপর জুলুম করবে না। শত্রুর জুলমের মুখে তাকে সমর্পণ করবে না। আর যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করবে, আল্লাহ তাআলা তার প্রয়োজন পূরণ করবেন। যে কোনো মুসলিমের একটি বিপদ দূর করবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার একটি বিপদ দূর করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন রাখবেন।' সহিহু মুসলিম: ৪/১৯৯৬, হা. নং ২৫৮০ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

মোটকথা, প্রতিটি মুসলিম এই পৃথিবীকে শান্তিময় করার একনিষ্ঠ কর্মী।

যার সর্বনিম্ন একটি প্রমাণ হলো, কোনো মুসলমান তার অপর মুসলিম ভাইকে হাত বা কথার মাধ্যমে কষ্ট দেবে না। সকল মানুষ একজন মুসলমানের পক্ষ থেকে নিজেদের জানমালের পূর্ণ নিরাপত্তা অনুভব করবে। অর্থাৎ প্রকৃত মুসলমান কখনো অন্যের জানমালের ওপর অন্যায় হস্তক্ষেপ করতে পারে না।

আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:
الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ
'প্রকৃত মুসলমান হলো, যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। আর প্রকৃত মুমিন হলো, যাকে মানুষ নিজেদের জানমালের ব্যাপারে নিরাপদ মনে করে। 'সহিহু ইবনি হিব্বান: ১/৪০৬, হা. নং ১৮০ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত) - হাদিসটি হাসান।

ইসলামের শান্তি ও নিরাপত্তার পরিধি ব্যাপক। ইসলামের সুশীতল ছায়া সুবিস্তৃত। শুধু মানুষের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং সমগ্র সৃষ্টিজীবের জন্যই ইসলামে শান্তির বিধান রয়েছে। ইসলামের বিধান হলো, একটি প্রাণী যেন আরেকটি প্রাণীর ওপর, অনুরূপ একজন মানুষ যেন অন্য কোনো মানুষ বা প্রাণীর ওপর কোনোরূপ অবিচার না করে; বরং একে অপরের প্রতি যেন দয়াপরবশ হয়ে জীবনযাপন করে। একজন মানুষ যদি একটি বোবা প্রাণীর কষ্ট দূর করে বা তার খাদ্যের ব্যবস্থা করে কিংবা তাকে পানি পান করায়, তাহলে এর বিনিময়ে তার জন্য অনেক কল্যাণ ও উত্তম প্রতিদান লিপিবদ্ধ করা হবে। এ থেকেই প্রতীয়মান হয়, ইসলাম শুধু মানুষের মাঝেই শান্তি প্রতিষ্ঠা করেনি; বরং ইসলাম মানবসমাজ পেরিয়ে প্রাণীদের মাঝেও শান্তির বিধান প্রতিষ্ঠা করেছে।

আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন।

بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ إِذِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بِئْراً. فَنَزَلَ فِيهَا، فَشَرِبَ، وَخَرَجَ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ. يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ. فَقَالَ الرَّجُلُ : لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ مِنِّي. فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلأَ خُفَّهُ. ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ. فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ. فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لأَجْراً؟ فَقَالَ : فِي كُلِّ ذِي كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ

'একদা এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ভীষণ পিপাসার্ত হয়ে পড়ে। সে একটি কূপ দেখে সেখানে নেমে পানি পান করে আবার ওপরে উঠে আসল। তখন লোকটি দেখতে পেল, একটি কুকুর হাঁপাচ্ছে আর পিপাসার জ্বালায় মাটি খাচ্ছে। সে (মনে মনে) বলল, পিপাসার তাড়নায় আমার যেই অবস্থা হয়েছিল, এই কুকুরটিরও পিপাসায় একই অবস্থা হয়েছে। অতঃপর সে পুনরায় কূপে নেমে তার মোজার মধ্যে পানি ভরে কুকুরের মুখে ধরল। অবশেষে কুকুরটি তৃষ্ণা নিবারণ করল। ফলে আল্লাহ তাআলা দয়া পরবশ হয়ে লোকটিকে মাফ করে দিলেন। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, চতুষ্পদ জন্তুর উপকার করলেও কি আমাদের কোনো প্রতিদান আছে? উত্তরে রাসুলুল্লাহ বললেন, প্রত্যেক তাজা কলিজার অধিকারী তথা জীবিত প্রাণীর ক্ষেত্রেই প্রতিদান রয়েছে। ' -মুআত্তা মালিক: ৫/১৩৬১, হা. নং ৩৪৩৫ (মুআসসাসাতু জাইদ বিন সুলতান, আবুধাবি) - হাদিসটি সহিহ

রাসুলুল্লাহ ﷺ চতুষ্পদ জন্তুকে কষ্ট দেওয়ার কারণে নিন্দা প্রকাশ করেছেন। এটাকে তিনি জুলুম ও জাহান্নামে যাওয়ারও একটি কারণ বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইবনে উমর (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ . قَالَ : فَقَالَ : وَاللَّهُ أَعْلَمُ : لاَ أَنْتِ أَطْعَمْتِهَا وَلاَ سَقَيْتِهَا حِينَ حَبَسْتِيهَا، وَلاَ أَنْتِ أَرْسَلْتِهَا، فَأَكَلَتْ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ

'জনৈকা মহিলা একটি বিড়ালের কারণে জাহান্নামে শাস্তি পেয়েছে। সে মহিলাটি বিড়ালটিকে বেঁধে রেখেছিল, যার কারণে বিড়ালটি মারা যায়। ফলে মহিলাটি জাহান্নামে প্রবেশ করে।' বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর রাসুলুল্লাহ বললেন, আল্লাহই ভালো জানেন, বাঁধা থাকাকালীন তুমি তাকে না খেতে দিয়েছিলে, না পান করতে দিয়েছিলে আর না তাকে তুমি ছেড়ে দিয়েছিলে, যাতে সে জমিনের পোকামাকড় খেয়ে বাঁচত। '
-সহিহুল বুখারি: ২/১১২, হা. নং ২৩৬৫ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)

পশুর গায়ে ছাপ দেওয়া হারাম। কেননা, এতে ওদের কষ্ট হয়। ইমাম মুসলিম জাবির থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ : لَعَنَ اللَّهُ الَّذِي وَسَمَهُ

'একদা রাসুলুল্লাহ-এর পাশ দিয়ে একটি গাধা যাচ্ছিল। তার চেহারা ছিল ছাপ দেওয়া। রাসুলুল্লাহ তা দেখে বললেন, যে এর চেহারায় ছাপ দিয়েছে, তার ওপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক।' -সহিহু মুসলিম: ৩/১৭৭৩, হা. নং ২১১৭ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

ইমাম আবু দাউদ(রহ.) জাবির (রা:) সূত্রে ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেন:

'একদা রাসুলুল্লাহ-এর পাশ দিয়ে চেহারায় দাগ দেওয়া একটি গাধা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তিনি (তা দেখে) বললেন, তোমাদের নিকট কি এ সংবাদ পৌঁছেনি, যে ব্যক্তি পশুর চেহারায় দাগ দেয় বা প্রহার করে আমি তাকে অভিসম্পাত করেছি? অতঃপর তিনি (সামনে থেকে) এরূপ করতে নিষেধ করলেন।'
-সুনানু আবি দাউদ: ৩/২৬-২৭, হা. নং ২৫৬৪ (আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরুত)- হাদিসটি সহিহ

এমনিভাবে এক প্রাণীকে আরেক প্রাণীর বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলাও হারাম। কেননা, এর ফলে একটি আরেকটিকে গুঁতো মারতে পারে বা কোনো ক্ষতি করতে পারে। ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ البَهَائِمِ

'রাসুলুল্লাহ পশুদের পরস্পর লড়াই করার জন্য উত্তেজিত করতে নিষেধ করেছেন। '
-সুনানুত তিরমিজি: ৩/২৬২, হা. নং ১৭০৮ (দারুল গারবিল ইসলামি, বৈরুত) - হাদিসটি জইফ।

ইসলামে শান্তির বিধান এতটাই বিস্তৃত যে, খোঁড়া, কানা বা রোগা প্রাণীকে পর্যন্ত কষ্ট দিতে ইসলাম নিষেধ করেছে। শুধু তাই নয়; বরং সেগুলোর প্রতি ইহসান ও দয়া করার আদেশ দিয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) বর্ণনা করেন:

'একদা আমরা রাসুলুল্লাহ-এর সাথে সফরে ছিলাম। এক সময় রাসুলুল্লাহ নিজ প্রয়োজন সারতে গেলেন। তখন আমরা একটি হুমারা পাখি (দামিরি বলেন, হুমারা চড়ুইয়ের মতো এক প্রকার পাখি। এটি খাওয়া হালাল হওয়ার ব্যাপারে ইজমা রয়েছে। কেননা, তা চড়ুই পাখিরই একটি প্রকার) দেখলাম, যার সাথে তার দুটি বাচ্চা ছিল। আমরা তার বাচ্চা দুটিকে রেখে দিলাম। অতঃপর হুমারা পাখিটি পাখা ঝাপটাতে লাগল। তারপর রাসুলুল্লাহ এসে বললেন, কে এই বাচ্চা দুটি নিয়ে তাকে কষ্ট দিচ্ছে? তার বাচ্চা তার নিকট ফিরিয়ে দাও। এছাড়াও আমরা একটি পিঁপড়ার বাসাতে আগুন দিয়েছিলাম। রাসুলুল্লাহ দেখে বললেন, কে এখানে আগুন ধরিয়েছে? আমরা বললাম, আমরা হে আল্লাহর রাসুল। এ কথা শুনে তিনি বললেন, আগুনের মালিক ছাড়া কারও জন্য আগুন দিয়ে শাস্তি দেওয়ার অধিকার নেই। '
-সুনানু আবি দাউদ: ৩/৫৫, হা. নং ২৬৭৫ (আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরুত) - হাদিসটি সহিহ।

এই সকল আয়াত ও হাদিসের ভাষ্য দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম অসহায় প্রাণীর প্রতিও দয়া প্রদর্শন করার নির্দেশ দিয়েছে। এটি হচ্ছে ইসলামের বিশালত্ব, যা মানব-জিনসহ সকল প্রাণীকে অন্তর্ভুক্ত করে। অতএব, যখন পৃথিবীতে এ ধরনের মহান আদর্শমূলক কাজ ছড়িয়ে পড়বে, তখন অবশ্যই অন্যায়-অত্যাচার দূর হয়ে বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হবে।

এটাই হলো প্রকৃত শান্তি, যা কেবল ইসলামি শরিয়ার আকিদা-দর্শনের মাঝেই বিদ্যমান রয়েছে। আর ইসলাম ছাড়া বিভিন্ন জাগতিক তন্ত্র-মন্ত্রের ধ্বজাধারী, যেমন ইহুদি-খ্রিষ্টান, হিন্দু-বৌদ্ধ, নাস্তিক যে কেউ-ই শান্তির বুলি প্রচার করুক, তা মিথ্যা মন্ত্র বৈ কিছু নয়। তাদের এসব মিথ্যা দাবি মানবতার সাথে স্পষ্ট প্রতারণা ও ধোঁকাবাজি।

শারীয়াহ শাসন ও শাসনব্যবস্থার মূলনীতি

শরীয়তের শাসন বলতে বুঝায় যে আইনের উৎস কুরআন ও সুন্নাহ।অর্থাৎ যে আইনই করিনা না কেনো সবগুলো আইন যে সরাসরি কুরআন-সুন্নাহতে থাকতে হবে এটা জরুরি না।বরং আমি যে আইনই করি না কেনো সকল আইনই কুরআন ও সুন্নাহ'র দ্বারা সরাসরি সাব্যস্ত

হবে এটার সম্ভবনা। মোটকথা, এই আইনগুলোর উৎস থাকবে কুরআন এবং হাদিস এটাই মূল বিষয়। কোনো আইন যাতে শরিয়াহ সাংঘর্ষিক না হয়। শরিয়াহ মানবরচিত আইন নয়। তাই এখানে নিজের ইচ্ছা(তা হোক সৎ/অসৎ) খাটানোর কোন উপায় নেই। এই আইন অপরিবর্তনীয়। তাই কেউ চাইলেই নিজ পক্ষমাফিক/পছন্দমাফিক আইন পরিবর্তন করতে পারেনা।কিন্তু মানবরচিত আইন পরিবর্তনীয়।মানবরচিত আইনে নিজ পছন্দ/ইচ্ছা খাটানোর সুযোগ থাকে।

শরিয়াহ একটা চেতনা, দায়বদ্ধতা ও প্রতিশ্রুতির নাম।এখানে নৈতিকতার বাইরে কিছু থাকে না। এটা আল্লাহর শাসন।

ইসলামের রাষ্ট্রনীতি ও শাসনব্যবস্থা অত্যন্ত মজবুত। অন্য সকল মতবাদ ও ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এর কারণ হলো, ইসলাম আসমানি ধর্ম। মহান রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে বান্দার জন্য একমাত্র মনোনীত ধর্ম ও জীবনব্যবস্থা। ইসলাম পৃথিবীর অন্য সব ধর্ম ও দর্শনের মতো নয়। ইসলাম কমিউনিজমও নয়, পুঁজিবাদও নয়, আবার জাতীয়তাবাদের সাথেও ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। এ কারণে ইসলাম সম্পর্কে এটা বলা যাবে না যে, ইসলাম কমিউনিজম, পুঁজিবাদী বা জাতীয়তাবাদী ব্যবস্থার মতো সাধারণ একটি মতবাদ। বরং ইসলাম নিখুঁত একটি ধর্ম, পূর্ণাঙ্গ একটি জীবনব্যবস্থা। স্বয়ং মহান আল্লাহ তাআলা এই জীবনব্যবস্থার নাম রেখেছেন 'ইসলাম'।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

'নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম।'(সুরা আলি ইমরান:১৯)

ইসলাম একটি স্বত্রন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। ব্যক্তি পর্যায় থেকে নিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত প্রতিটি বিষয়ের সুন্দর ও নিখুঁত সমাধান রয়েছে ইসলামে। সকল স্থানে ও সর্বযুগে মানবজীবনের প্রতিটি বিষয়ের সমাধান এতটাই সুষ্ঠু, সুন্দর ও নিখুঁতভাবে ইসলাম দিয়েছে, যার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে না কভু ছিল, না বর্তমানে আছে, আর না ভবিষ্যতে কখনো হবে।

ইসলামের শাসনব্যবস্থা কতিপয় মূলনীতির ওপর নির্ভরশীল। এ সকল মূলনীতি মোটামুটি ছয়টি।

প্রথম মূলনীতি : সার্বভৌমত্ব আল্লাহর

প্রভুর বৈশিষ্ট্যসমূহের একটি বৈশিষ্ট্য হলো সার্বভৌমত্ব একমাত্র তাঁর জন্য প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলাই হবেন একমাত্র বিধানদাতা। তিনি ব্যতীত অন্য কারও বিধান প্রণয়নের অধিকার থাকবে না।

এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন:

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ

'তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারিত করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নুহকে, যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইবরাহিম, মুসা ও ইসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীন প্রতিষ্ঠা করো এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না।'সুরা আশ-শুরা: ১৩

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন:

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

'আমি তোমাদের প্রত্যেককে একটি আইন ও পথ দিয়েছি। '(সুরা আল-মায়িদা: ৪৮)

আল্লাহ তাআলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তিনিই তাদের জন্য ধর্ম নির্ধারণ করে দেবেন, তিনিই তাদের জীবন-চলার জন্য আইন ও বিধান প্রণয়ন করবেন; এটাই তো যৌক্তিক ও উত্তম।

শাসনক্ষমতা ও বিধান প্রণয়নের অধিকারী যেহেতু আল্লাহ তাআলা। সুতরাং আল্লাহর আইনের বিপরীতে মানুষের জন্য আইন প্রণয়ন করাটা হবে ক্ষমতার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার সাথে শত্রুতা ও বিরোধিতা করা।

এ ক্ষেত্রে একটি বাস্তবতা হলো, আল্লাহ তাআলা এই বিশ্বজগৎ, গ্রহ- নক্ষত্র-সবকিছুই যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন। এর সবকিছু পরিচালিত হচ্ছে সুবিন্যস্ত ও সুশৃঙ্খলভাবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনই এসব কিছু পরিচালনা করছেন।

আমাদের এই পৃথিবী নামক গ্রহটিও মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সৃষ্টির ক্ষুদ্র একটি অংশ। এই পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে, তার সবকিছুই তিনি সৃষ্টি করেছেন। এর সবকিছু সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হওয়ার জন্য তিনি একটি নিজাম তৈরি করে দিয়েছেন, যে নিজাম অনুযায়ী পৃথিবীর সবকিছু পরিচালিত হচ্ছে। অন্যদিকে মানুষ আল্লাহ তাআলারই সৃষ্টি। আল্লাহর লক্ষ-কোটি অগণিত সৃষ্টির তুলনায় মানুষ একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। তিনি যেহেতু মানুষের স্রষ্টা; বিধায় তাদের পরিচালনার জন্য তিনিই একটি নিজাম বা নিয়ম নির্ধারণ করবেন। আর এটাই স্বাভাবিক। বিবেকবান প্রতিটি লোকই এ কথার সাক্ষ্য দেবে।

আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে মানুষের হিদায়াতের জন্য, তাদের সঠিক নিয়মে পরিচালনার জন্য নবি ও রাসুলদের প্রেরণ করেছেন। রাসুলদের মাধ্যমে জীবন পরিচালনা করার নিয়ম ও নিজাম দান করেছেন। সুতরাং এই বিধান বা কানুন অনুযায়ী চললে মানুষের জীবন হবে নিরাপদ ও শান্তিময়। যারা এই বিধান মানার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হলো, তারা প্রকৃতি- বিরুদ্ধ কাজ করল, জগৎ পরিচালনার নিয়ম ভঙ্গ করল এবং বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার বিধান অমান্য করল। সুতরাং তারা ক্ষতিগ্রস্ত, অভিশপ্ত ও ধ্বংসমুখে নিপতিত।

আর কীভাবে সে লোককে জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন বলা যেতে পারে, যে আসমানের ইলাহ এবং জমিনের ইলাহের মাঝে পার্থক্য করে? তার কথা তো ওই ব্যক্তির অসার মিথ্যা কথার মতো হলো, যে বলছে, আল্লাহ তাআলা আসমানে ইলাহ, কিন্তু জমিনে তার কোনো কর্তৃত্ব নেই। এই ভ্রান্ত দাবি প্রত্যাখ্যান করে এবং আসমান ও জমিনে আল্লাহ তাআলার কর্তৃত্ব সমান-এ বিষয়টি মানুষের মনে ও বিশ্বাসে আরও দৃঢ় করার জন্য আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ

'তিনিই উপাস্য নভোমণ্ডলে এবং তিনিই উপাস্য ভূমণ্ডলে। তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। ' (সুরা আল-জুখরুফ: ৮৪)

নিশ্চয় আল্লাহর আইনের বিপরীত আইন প্রণয়নের অপরাধ অত্যন্ত ভয়াবহ। এ ক্ষেত্রে সামান্য ছাড় দেওয়ারও কোনো অবকাশ নেই। কারণ, এটি তাওহিদের আকিদার সাথে সম্পৃক্ত। যার মর্মার্থ হলো, আল্লাহ তাআলাকে একক ইলাহ হিসাবে গ্রহণ করা। কালিমাতুত তাওহিদ (لا اله الا الله) আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই এর সাক্ষ্য দেওয়া ও তার দাবিগুলো মেনে নেওয়া।

কালিমাতুত তাওহিদ لا اله الا الله এর দাবি হলো, ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার সাথে কাউকে শরিক করা যাবে না। ইবাদত কেবল আল্লাহ তাআলারই করতে হবে। আর ইবাদত হলো, আল্লাহ তাআলার সামনে বিনয়ী হওয়া, তার সকল আদেশ-নিষেধগুলো মেনে চলা এবং তার সামনে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করা। অর্থাৎ মানুষ আল্লাহ তাআলার আদেশ মেনে চলবে, তাঁর শরিয়তের অনুসরণ করবে। তাঁর আদেশ ব্যতীত অন্য কাউকে মানবে না এবং অন্য কারও প্রণীত আইন-কানুনের অনুসরণ করবে না।

আল্লাহ তাআলা ইলাহ বা মাবুদ। তাই তিনিই বিধান দান করবেন এবং তিনিই মানুষের জীবন-চলার পথ নির্ধারণ করে দেবেন। তিনি ব্যতীত অন্য কারও এই অধিকার নেই, যে এই বৈশিষ্ট্যটি নিজের বলে দাবি করতে পারে এবং নিজের খেয়াল-খুশি মতো বিধান তৈরি করবে। এ ধরনের অজ্ঞতাপূর্ণ বিরোধিতা করতে পারে কেবল অকৃতজ্ঞ অবিশ্বাসী ও প্রতারিত জালিম।

শাসনক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর-এ বিষয়টি আরও দৃঢ় করার জন্য আল্লাহ তাআলা বলেন:

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ

وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

'আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ, কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।' (সুরা ইউসুফ: ৪০)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন:

أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ ۝

'শুনে রাখো, ফয়সালা তাঁরই এবং তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণ করবেন।'(সুরা আল-আনআম: ৬২)

মানুষের পক্ষ থেকে মানুষের জন্য সংবিধান রচনা করা আল্লাহর কর্তৃত্বের সাথে এবং তাঁর উলুহিয়্যাতের প্রধান বৈশিষ্ট্যের সাথে চূড়ান্ত পর্যায়ের সাংঘর্ষিক। যারা আল্লাহর বিধানের বিপরীত নিজেদের পক্ষ থেকে মানুষের জন্য বিধান রচনা করে তারা কাফির। তারা আল্লাহর আদেশ ও তাঁর পথ থেকে সরে গেছে। তারা এ ধরনের কাজের মাধ্যমে নিজেদের মাবুদ হিসাবে দাবি করল এবং এই কাজের মাধ্যমে নিজেদের রবের স্থানে বসানোর চেষ্টা করল।

যারা আল্লাহর বিধানের বিপরীতে নিজেদের পক্ষ থেকে মানুষের জন্য বিধান রচনা করে, তারা কাফির, ফাসিক ও জালিম। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ۝

'যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই কাফির। (সুরা আল-মায়িদা: ৪৪)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝

'যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই ফাসিক। ' (সুরা আল-মায়িদা: ৪৭)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝

'যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই জালিম। '(সুরা আল-মায়িদা: ৪৫)

যারা আল্লাহ তাআলার বিধানের বিপরীত বিধান রচনা করে, তাদের জন্য এই কলঙ্কযুক্ত অভিশপ্ত উপাধি নির্ধারণ করা হয়েছে-তারা কাফির, ফাসিক ও জালিম।
১. فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُون .. প্রত্যাখ্যানকারী, আল্লাহর ইবাদত করা এবং তার সামনে নতি স্বীকার করতে অস্বীকারকারী।

২. فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُون যারা জুলুমে পতিত হয়। কুরআনে জুলম শব্দটি অধিকাংশ স্থানে শিরক অর্থে উল্লেখ করা হয়েছে। আর জুলম শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো, কোনো বস্তুকে তার সঠিক স্থানে না রেখে অন্য স্থানে রাখা। যেমন আরবি একটি প্রবাদ আছে: من استرعي الذئب فقد ظلم 'যে বাঘকে রাখাল বানাল, সে ছাগলের ওপর জুলুম করল।' সুতরাং যারা নিজেদের জন্য আল্লাহ তাআলার বিধানের বিপরীত বিধান রচনা করে, তারা মুশরিক। কারণ, তারা হিদায়াতের পরিবর্তে ভ্রষ্টতা, হকের পরিবর্তে বাতিল এবং সঠিক পথের পরিবর্তে ভুল পথ গ্রহণ করেছে। তারা আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরে গেছে এবং কুফুরি ও জুলুমের পথ গ্রহণ করেছে।

৩. فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُون
যারা আল্লাহর দ্বীন ও তার বিধানের বিরোধিতা করে তার আনুগত্য থেকে বের হয়ে গেছে। ফিসক শব্দের আভিধানিক অর্থ বের হওয়া।

এর ওপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, শাসনক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তাআলার।

এই গুণের অধিকার কোনো মানুষের নেই। যে সকল লোক এমন ঘৃণ্য ভয়ংকর কাজ করার দুঃসাহস দেখাবে, তারা নিকৃষ্ট তাগুত, অহংকারী ফাসিক ও অভিশপ্ত শয়তান। তারা যতক্ষণ তাদের ভ্রষ্টতার ওপর থাকবে, তাদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া মুমিনদের ওপর ওয়াজিব।

যে সকল লোক আল্লাহর বিধান ব্যতীত অন্য বিধান পছন্দ করবে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে কুফরি বিধানের মাধ্যমে বিচারকার্য পরিচালনার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে, তারাও অপরাধী ও শিরকে পতিত। অনুরূপ যারা আল্লাহর বিধানের বিপরীত বিধানের মাধ্যমে বিচার পরিচালনা করবে

এবং যারা সন্তুষ্টচিত্তে এসব বিচারকের কাছে বিচার চাইবে; উভয়ই মুশরিক। যদিও তারা নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, হজ করে, জাকাত দেয়। কুরআন আমাদের সামনে আল্লাহর পথ ছেড়ে অন্য পথ অবলম্বনের খারাবি ও ভয়াবহতা বর্ণনা করেছে এবং এ কথা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে যে, যারা আল্লাহর বিধান গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে, তাদের ইমান থাকে না।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

'কিন্তু না, আপনার পালনকর্তার কসম, সেসব লোক ইমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে করে। অতঃপর আপনার মীমাংসার ব্যাপারে নিজেদের মনে কোনো রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে। '(সুরা আন-নিসা: ৬৫)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা কসম করে বলেছেন, যারা কুফরি বিধান অনুযায়ী বিচারকার্য মেনে নেবে এবং সে ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকবে তাদের ইমান নেই। উল্লিখিত আয়াতে ইমান সাব্যস্ত হওয়ার জন্য তিনটি শর্তের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কেউ যখন এ তিনটি বা তার কোনো একটির ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করবে, তখন আর তার মধ্যে ইমান বাকি থাকবে না।

সে তিনটি শর্ত হলো:

১. বিবাদমান সকল বিষয়ের মীমাংসা রাসুলের নিকট চাইতে হবে। তাঁকেই বিচারক হিসাবে মানতে হবে, অন্য কাউকে মানলে হবে না।

২. বিচারের ফয়সালা নিজের পক্ষে যাক বা বিপক্ষে যাক; সর্বাবস্থায় বিচারপ্রার্থী অন্তরে কোনো ধরনের সংকীর্ণতা ও কষ্ট রাখতে পারবে না।

৩. বিচারপ্রার্থী অম্লান বদনে তাঁর সকল আদেশ মেনে নেবে। তাঁর ফয়সালার সামনে মাথানত করবে। শরিয়তের বিধান পরিপূর্ণভাবে মেনে নেবে।

শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানকেই মানতে হবে। আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে নিজের খেয়াল-খুশিমতো শাসনকার্য পরিচালনা করা যাবে না। আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুলুল্লাহ-কে উদ্দেশ্য করে বলেন:

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَق ِّ

'আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্যগ্রন্থ, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর বিষয়বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী। অতএব আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করুন এবং আপনার কাছে যে সত্য এসেছে, তা ছেড়ে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না।'(সুরা আল-মায়িদা: ৪৮)

অতঃপর আল্লাহ তাআলা সতর্ক করেছেন, তিনি যেন কারও প্রবৃত্তির অনুসরণ না করেন; চাই সে লোক কত বড় ক্ষমতাধরই হোক না কেন। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُون َ)

'আর আমি আদেশ করছি যে, আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা নাজিল করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করুন; তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না এবং তাদের থেকে সতর্ক থাকুন, যেন তারা আপনাকে এমন কোনো নির্দেশ থেকে বিচ্যুত না করে, যা আল্লাহ আপনার প্রতি নাজিল করেছেন। অনন্তর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে নিন, আল্লাহর ইচ্ছা এটাই যে, তাদের কিছু পাপের কারণে শাস্তি প্রদান করবেন। আর বহু লোক তো নাফরমানই হয়ে থাকে। (সুরা আল-মায়িদা: ৪৯)

সবশেষে আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে বলেছেন যে, আল্লাহর বিধানের বিপরীত বিধানগুলোই হচ্ছে জাহিলিয়্যাত। আল্লাহ তাআলা বলেন:

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُون َ

'তারা কি জাহিলি যুগের ফয়সালা কামনা করে? আল্লাহ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের জন্য উত্তম ফয়সালাকারী আর কে আছে?'(সুরা আল-মায়িদা: ৫০)

আল্লাহ তাআলা-ই একমাত্র বিধানদাতা, তিনিই একমাত্র আইনপ্রণেতা। কেউ যদি নিজেকে আইনপ্রণেতা দাবি করে, তবে সে কাফির, সে তাগুত। তেমনই স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে তাকে আইনপ্রণেতা হিসাবে মেনে নেওয়া ব্যক্তিরাও কাফির। অবশ্য অজ্ঞতাবশত হলে বা চূড়ান্ত পর্যায়ের বাধ্য হলে সে ক্ষেত্রে তা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। ক্ষেত্রবিশেষে কাফির হবে আর ক্ষেত্রেবিশেষে কাফির হবে না। এর বিশদ বিবরণের দায়িত্ব বিজ্ঞ উলামায়ে কিরামের, সাধারণ মানুষের নয়।

আল্লাহর আইনের বিপরীত বিচার করার বিধান

এ বিষয়টি নিয়ে অনেকের মাঝে বেশ ইখতিলাফ ও বিতর্ক দেখা যায়। কিছু মানুষ আছে, যারা এটাকে কোনোভাবেই কুফর মানতে চায় না। এর বিপরীতে কিছু লোক সকল ক্ষেত্রেই এটাকে কুফর বলে প্রচার করে। এদিকে কুরআনের স্পষ্ট আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহর দেওয়া আইন অনুসারে বিচার না করলে সে কাফির, ফাসিক ও জালিম। এগুলোরই বা রহস্য কী? একই অপরাধীর জন্য তিন রকমের বিশেষণ কেন? এখানে মূল আলোচনার বিষয় হলো, মানবরচিত আইনে বিচার করা কুফরে আকবার বা বড় কুফর কিনা, যা ব্যক্তিকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয়? বস্তুত এর উত্তর এক কথায় দেওয়া সম্ভব নয়। এখানে এভাবে উত্তর হবে যে, যদি রাষ্ট্রে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং সে আল্লাহর আইনকে সঠিক বলে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও পার্থিব স্বার্থে কখনো ভিন্ন আইনে বিচার করে অথবা অপকৌশলের আশ্রয় নিয়ে বিচারকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে তাহলে সে কাফির নয়; বরং জালিম বা ফাসিক। এ ধরনের কুফরকে বলা হবে 'কুফর দুনা কুফর'। অর্থাৎ এর কারণে সে মারাত্মক গুনাহগার হলেও দ্বীন ইসলাম থেকে বের হয়ে মুরতাদ হয়ে যাবে না। আর যদি রাষ্ট্রীয়ভাবে আল্লাহর আইনের পরিবর্তে মানবরচিত আইন প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং আদালতে নিয়মিত সে অনুসারেই বিচার-আচার করা হয় কিংবা সে আল্লাহর আইনের বিপরীতে মানবরচিত আইনকেই সঠিক ও শ্রদ্ধাযোগ্য মনে করে অথবা মানবজীবনের সকল সমস্যার সমাধানকল্পে এ আইন অনুসারে ফয়সালা করাকে কল্যাণকর ও আবশ্যক বলে বিশ্বাস করে তাহলে তার কুফর ও ইরতিদাদের বিষয়টি সুস্পষ্ট। এখানে তার কুফরির ব্যাপারে ন্যূনতম সন্দেহ করার অবকাশ নেই। এটাকে 'কুফর দুনা কুফর' বলে যারা বিষয়টিকে হালকা করে

প্রচার করে, তারা নিশ্চিত দ্বীনের অপব্যাখ্যা করে তাগুতদের খুশি করতে চায়। আমরা এদের থেকে মুক্ত এবং তারাও আমাদের থেকে মুক্ত।

আল্লামা মুহাম্মাদ বিন ইবরাহিম (রহ) বলেন:

'আল্লাহর আইনকে সঠিক বলে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য আইনে বিচার-ফয়সালা করে নিজেকে গুনাহগার ভাবলে তার ব্যাপারে বলা হয়েছে 'কুফর দুনা কুফর'। আর এটা কেবল ওই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যার থেকে তা এক দুবার প্রকাশ পায়। কিন্তু যে ব্যক্তি যথাযথভাবে আইনকানুন তৈরি করবে এবং তা মেনে চলবে তখন তা কুফরি বলে বিবেচিত হবে। যদিও সে একথা বলে যে, (এর কারণে) আমি গুনাহগার হয়েছি এবং শরিয়তের ফয়সালাই অধিক নিষ্ঠাপূর্ণ। অতএব, চূড়ান্ত, প্রমাণিত ও প্রাধান্যপ্রাপ্ত আইনের মাঝে পার্থক্য আছে; যেখানে তারা মানবরচিত আইনকেই মূল বানিয়ে নিয়েছে। সুতরাং তা এমন কুফর বলে গণ্য হবে, যা (ব্যক্তিকে) দ্বীন থেকে বের করে দেয়।

-ফাতাওয়া ওয়া রাসায়িল, মুহাম্মাদ বিন ইবরাহিম ১২/২৮০, ফতোয়া নং ৪০৬০ (মাতবাআতুল হুকুমাহ, মক্কা)

এ বিষয়ে অনেক উলামায়ে কিরাম এমনই বক্তব্য পেশ করেছেন। তাদের সকলের তাফসির বা মন্তব্য থেকে একথাই স্পষ্ট হয়েছে যে, আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য কোনো বিধান দ্বারা বিচারকার্য পরিচালনা করা আল্লাহর সাথে এক জঘন্য ও স্পষ্ট ঔদ্ধত্য। অথচ বর্তমানে প্রায় সকল মুসলিম ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, জেনে বা না জেনে মানবরচিত আইনে পরিচালিত কোর্টের সামনে বিচারের জন্য ভিড় জমায়।

উম্মাহর ফকিহগণ আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে অন্য বিধান দ্বারা বিচারকারীদেরকে শুধু কাফিরই বলেননি; বরং তাদের পক্ষ অবলম্বনকারী আলিমদেরকেও কাফির বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

'নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর অবতীর্ণকৃত কুরআনের বিধান গোপন করে এবং এর বিনিময়ে অল্প মূল্য গ্রহণ করে, তারা নিজেদের উদরে আগুনই ভক্ষণ করে এবং আল্লাহ তাআলা না তাদের সাথে কিয়ামতের দিন কথা বলবেন আর না তাদের পবিত্র করবেন। বস্তুত তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আজাব। '(সুরা আল-বাকারা: ১৭৪)

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন:

'আর যখন কোনো আলিম কুরআন-সুন্নাহ হতে অর্জিত শিক্ষা অনুযায়ী আমল ত্যাগ করে এবং আল্লাহ ও রাসুলের বিরুদ্ধাচরণকারী বিচারকের অনুসরণ করে তখন সে একজন ধর্মত্যাগী এবং কাফির হিসাবে বিবেচিত হবে, যে দুনিয়া ও আখিরাতে উভয় জাহানে শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত।

- মাজমুউল ফাতাওয়া, ইবনু তাইমিয়া: ৩৫/৩৭৩ (মাজমাউল মালিক ফাহাদ, মদিনা

এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, বিচার-ফয়সালা এবং বিধান। বিচার- ফয়সালা হলো বিধানেরই একটি অংশ বিশেষ। আর বিধান হলো আল্লাহর তাআলার পূর্ণ আইনব্যবস্থা। সুতরাং শুধু বিচার-ফয়সালা থেকে বিধান বাদ দেওয়া আর সম্পূর্ণ বিধানকেই পরিত্যাগ করা দুটো ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। কাজেই যদি কোনো শাসক আল্লাহর শরিয়া অনুযায়ী বিচার না করে তখন বিধানের অন্য ধারার প্রেক্ষিতে প্রশ্ন আসে, সে কি কাফের নাকি মুসলিম?

আর যদি আল্লাহর বিধান বলবৎ থাকা সত্ত্বেও সাময়িকভাবে শরিয়া বাদ দিয়ে সে বিচার করে তাহলে সেটা হবে এক ধরনের কুফর অর্থাৎ ছোট কুফুর। বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। যদি বিধান বলবৎ থাকে তাহলে শরিয়া আইন বাস্তবায়ন না হলে এটা হবে ছোট কুফর। আর যদি বিধানকে পরিবর্তন করা হয় তাহলে সেটা হবে বড় কুফর। ইবনে আব্বাস-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল বিচার-ফয়সালার ব্যাপারে, বিধানের ব্যাপারে নয়। আর এ বিষয়টি হয়তো তখনকার খারিজিরা বুঝেনি।

কাফির, ফাসিক ও জালিম বিচারক কারা?

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বিচার করবে না তারা কাফির, ফাসিক ও জালিম। তিনটি উদাহরণের মাধ্যমে এ তিন শ্রেণির মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরা হলো:

১. কাফির: এর উদাহরণ হলো, যখন কোনো ব্যভিচারীর বিচার করার

সময় সকল সাক্ষ্য প্রমাণাদির ভিত্তিতে সে দোষী সাব্যস্ত হয়, কিন্তু বিচারক তাকে শরিয়াসম্মত শাস্তি না দিয়ে মানবরচিত অন্য কোনো শাস্তি দেয় অথবা জেল-জরিমানা করে। আবার সে এ কথা বলে যে, আমরা এ ধরনের অপরাধের জন্য এমন শাস্তিই দিয়ে থাকি। অর্থাৎ এ অপরাধের জন্য এটাই আমাদের শাস্তির নির্ধারিত ও চূড়ান্ত বিধান। তাহলে এতে সে আল্লাহর সীমা অতিক্রম করে ফেলায় পরিপূর্ণরূপে কাফির সাব্যস্ত হবে।

২. জালিম: এর উদাহরণও একই। তবে পার্থক্য হলো, এই বিচারক আল্লাহর বিধান মানে এবং ব্যভিচারের শাস্তির ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানকে অস্বীকারও করে না। কিন্তু সে কিছু লোককে শরিয়া-নির্ধারিত শাস্তি প্রদান করে না। কারণ, তার সাথে দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীদের ভালো সম্পর্ক আছে অথবা তাদের সামাজিক মর্যাদা উঁচু কিংবা তারা তাকে ঘুষ দিয়েছে। তাহলে এমন বিচারক জালিম হিসাবে বিবেচিত হবে।

৩. ফাসিক: তার উদাহরণ হলো, সে শরিয়া অনুযায়ী বিচার করে ঠিক, কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে নিজের সুবিধার জন্য অথবা ভয়ের কারণে সে এমন কিছু অপকৌশল অবলম্বন করে, যাতে নির্ধারিত শাস্তি বাস্তবায়ন করা থেকে বিরত থাকা যায়। যেমন ব্যভিচারের ক্ষেত্রে চারজন শরয়ি সাক্ষী আছে। কিন্তু বিচারক অপরাধীকে শাস্তি থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে বলল, এই সাক্ষী ভালোভাবে ঘটনা দেখেনি বা অমুক সাক্ষী ন্যায়পরায়ণ নয়। এভাবে সে সাক্ষীদেরকে বিভিন্ন মিথ্যা ও ভুয়া অজুহাত দেখিয়ে সাক্ষ্য দিতে বাধা দিল। তাহলে এমন বিচারক ফাসিক বলে বিবেচিত হবে।

দ্বিতীয় মূলনীতি: শুরা ও পরামর্শ

আভিধানিক অর্থ:

আশ-শুরা(الشوري) শব্দটি شَوَّرَ يُشَوِّر থেকে নির্গত। ব্যবহারভেদে এ শব্দের অর্থ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন আমরা বলে থাকি : شرت العسل اشوره شورا অর্থাৎ মধু আহরণ করলাম বা পান করলাম। আবার বলা হয়: شرت الدابة شورا অর্থাৎ পশুকে বিক্রির জন্য বাজারে তুললাম। অন্যদিকে شور يُشَوِّرُ تشويرا অর্থ হলো, কথা বলার পরিবর্তে বুঝে আসে এমন ইশারায় কথা বলা। অর্থাৎ বোঝার ক্ষেত্রে ইশারা করাই কথা বলার শামিল। যেমন কেউ যদি কোনো বিষয়ে অনুমতি দিয়ে হাত বা মাথা দ্বারা ইঙ্গিত করে, তবে তা কথা বলার স্থলাভিষিক্ত বলে ধরা হবে। এমনিভাবে شاورته في كذا বা استشرته এর অর্থ হলো, কোনো ব্যাপারে নিজের মত পেশ করার জন্য পুনরায় বলা। اشار علي بكذا অর্থাৎ তার কাছে এ বিষয়ে কী কল্যাণ আছে, সে আমাকে দেখাল। مشورة)শীন বর্ণে সাকিন বা পেশ যোগে মাশওয়ারা বা মাশুরা) শব্দটির উৎপত্তি হলো মধু আহরণ হতে। কারণ, مشورة দ্বারা উত্তম নসিহত উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, যা মধু পানের সাথে তুলনীয়। এ থেকে আরেকটি শব্দের উৎপত্তি হলো, شورى)শুরা)-যার অর্থ কোনো কিছু নিজের বলে দাবি করা।
- আল-মিসবাহুল মুনির: ১/৩২৬ (আল-মাকতাবুল ইলমিয়্য, বৈরুত)

পারিভাষিক অর্থ:

শাইখ আহমাদ মহি উদ্দিন আজুজ বলেন:

'মুসলিমদের কোনো একটি কাজে সর্বাধিক সঠিক ও কল্যাণময় পন্থাটির ওপর নির্ভর ও আমল করার জন্য পরস্পর মত বিনিময় করাকে বলা হয় শুরা বা পরামর্শ। '

-মানাহিজুশ শারিয়াতিল ইসলামিয়া: ২/১২৮ (মাকতাবাতুল মাআরিফ, বৈরুত)

ড. মুহাম্মাদ আবু ফিরাস বলেন:

'শুরা হলো, কোনো বিষয়ে সর্বোত্তম ফলাফল বের করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মতামত ও চিন্তাভাবনা পেশ করে চিন্তাশীল ও বোদ্ধাজনদের পর্যবেক্ষণে যাচাই-বাছাইয়ের পর সঠিক বা সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও সর্বোত্তম সিদ্ধান্তে পৌঁছা।'

শুরার গুরুত্ব

শুরার অর্থ ও সংজ্ঞা থেকেই বোঝা যায় যে, এটি কতটা গুরুত্বপূর্ণ। শুরা মূলত আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই জরুরি। পরিচর্যাগত, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিকসহ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে আমরা এর প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারি। নিম্নে কয়েকটি দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করছি।

ক. পরিচর্যাগত গুরুত্ব

বলা বাহুল্য, মানুষের মনের মাঝে অন্যের জন্য ভালোবাসা, অন্যের ভালো চাওয়া, অন্য কাউকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করা, তার কাজগুলোকে সঠিক পথে পরিচালিত করার প্রতি একটা স্বাভাবিক ঝোঁক থাকে। এমনিভাবে মানুষের মাঝে নিজের প্রতি আস্থা এবং সমাজের প্রতিও একটা আস্থা থাকে। তবে এমন সমাজের প্রতি, যে সমাজ সে মানুষকে নিজের পরামর্শ প্রদানের স্বাধীনতা দিয়ে থাকে। আর এ পরামর্শ প্রদানের স্বাধীনতা থাকার কারণে সেসব মানুষকে গুরুত্ব ও মর্যাদা দেওয়া হয়ে থাকে। ফলে সে মানুষটি সমাজের কল্যাণ কামনা, সমাজের উন্নতিকে গুরুত্ব প্রদান ও সমাজের বিভিন্ন কাজকে সঠিক পথে বাস্তবায়নের প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকে।

কিন্তু যখন সমাজের কাউকে এমন সুযোগ না দেওয়া হয়, নিজের পরামর্শ বলার কোনো সুযোগ তার না থাকে, সমাজ তার উপকারী পরামর্শগুলো থেকে বঞ্চিত হয়-যেমনটি আমরা বর্তমান পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রে দেখে থাকি-সে সমাজের মাঝে তখন আত্মবিশ্বাসের কমতি দেখা দেয়, মানুষ নিজেকে নিয়ে তিক্ততা ও কষ্ট অনুভব করে, একপর্যায়ে সে অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে; এভাবে সে মানুষের কল্যাণকামিতার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। বস্তুত, পরামর্শ-ব্যবস্থা না থাকার কারণে মানুষের পরিচর্যাগত দিকটি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ব্যাহত হয়।

খ. সামাজিক গুরুত্ব

পরামর্শ প্রদানের সুযোগ থাকার কারণে একটি সমাজের সদস্যদের মাঝে মজবুত সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ফলে তাদের মাঝে পারস্পরিক বোঝাপোড়া ও ভালোবাসা দৃঢ় হয়। যার কারণে একটি সামাজিক কাঠামো হয় শক্ত ও প্রতিষ্ঠিত। সমাজটিকে মনে হবে শক্ত বাঁধনে বাঁধাই করা একটি সীসাঢালা প্রাচীর।

অন্যদিকে পরামর্শ প্রদানের যদি সুযোগ না থাকে, তবে সমাজের সদস্যদের মাঝে দূরত্ব, সম্পর্ক বিনষ্ট হওয়া, তিক্ততা ও বিচ্ছিন্নতা ছড়িয়ে পড়ে। তাদের মন-মানসিকতা থাকে বিভক্ত। ফলে তারা পর্যায়ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ে। আত্মবিশ্বাস হারিয়ে বসে। তাদের মাঝে কল্যাণের মানসিকতা কমে আসে।

গ. রাজনৈতিক গুরুত্ব

ইসলামি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক দিকটির প্রতিষ্ঠা হলো উম্মাহর কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য। যদি এতে পরামর্শ ও নসিহত প্রদানের নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে উম্মাহর প্রতিটি ভাগ, প্রতিটি সদস্যের প্রতিটি দিকের কল্যাণ সাধিত হয়। ফলে সকল মানুষই উত্তমকে গ্রহণ করতে পারবে, মন্দকে বর্জন করতে পারবে। এ রকম নীতি প্রতিষ্ঠার মাঝেই রয়েছে নিরাপদ ও শান্তিময় জীবনের নিশ্চয়তা।

পরামর্শের সুযোগ থাকার ফলে শাসক ও শাসিতের মাঝে ভালোবাসা ও বিশ্বাসের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে উভয় শ্রেণিই বিচ্ছিন্নতা ও কপটতার ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্ত জীবনযাপন করতে পারে। তাদের মাঝে আমিত্ববোধ, জোর-জবরদস্তি বা একচেটিয়া দখলের ভাব থাকে না। তাই শুরার রাজনৈতিক এ অতুলনীয় দিকটি কোনোমতেই পাশ কাটিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

ঘ. অর্থনৈতিক গুরুত্ব

অভিজ্ঞজনের পরামর্শের ফলে অর্থনৈতিক দিকটি সমৃদ্ধ হবে। এতে বিভিন্ন ধরনের কল্যাণ নিশ্চিত হবে। রাষ্ট্রের মাঝে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সুসংহত থাকবে। সাধারণ মানুষও নির্ঝঞ্ঝাট জীবনযাপন করতে পারবে। তাদের আর্থিক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হবে না।

ঙ. সামরিক গুরুত্ব

সামরিক দিকটি জিহাদের বিভিন্ন কলা-কৌশল ও পরিকল্পনার ওপর গঠিত হয়। ইসলামের এ বিভাগটিতে থাকে শত্রুকে বোকা বানানোর জন্য প্রয়োজনীয় ধোঁকা দেওয়ার কৌশল। আর উম্মাহর বর্তমান সংকটময় সময়ে এ দিকটির প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। তাই অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞজনদের অবশ্যই সামরিক বিষয়াদিতে পরামর্শ করতে হবে। যেন বিজয় ছিনিয়ে আনার জন্য সঠিক ও উত্তম পরিকল্পনাটি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। অন্যদিকে যদি ভুল কিছু পরিকল্পনা করা হয়, তবে তা উম্মাহর জন্য যন্ত্রণাদায়ক হবে বৈকি।

শুরা বা পরামর্শের গুরুত্ব সম্পর্কে এ স্বল্প পরিসরে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তাই এ বিষয়টিতে এতটুকু আলোচনাই যথেষ্ট। ইমাম হাসান বসরি এ ব্যাপারে বলেন, 'কোনো জাতি পরামর্শ করে চললে তাদের সর্বাধিক সঠিক পথে পরিচালিত করা হয়। '৩৪৬

শুরার শরয়ি হুকুম

পরামর্শ করার হুকুম নিয়ে দুধরনের মত পাওয়া যায়। ইমাম কাতাদা(রহ.), ইমাম ইবনে ইসহাক(রহ.), ইমাম শাফিয়ি(রহ.)-সহ প্রমুখদের মতে পরামর্শ করা মুসতাহাব। এর বিপরীতে ইমাম ইবনে আতিয়া, ইমাম রাজি, ইমাম নববি-সহ প্রমুখ এটিকে ওয়াজিব বা আবশ্যক মনে করেন। ৩৪৭

বিধানগত দিক থেকে পরামর্শ করা ওয়াজিব হোক বা মুসতাহাব, বাস্তবতা ও প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে এটিকে হালকা করে দেখা, গুরুত্ব না দেওয়া বা শিথিলতা করার কোনো সুযোগ নেই। মুসলমানদের মাঝে পরামর্শের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের কমতি বা ছাড়াছাড়ি করার মানসিকতা থাকলে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। ইতিহাসে এর অসংখ্য নজির রয়েছে। তাই সকল ক্ষেত্রে, বিশেষত জাতীয় ও গণকাজে পরামর্শ করা নেওয়া একান্ত

জরুরি। কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও হাদিসের ভাষ্যও পরামর্শ করার আবশ্যকীয়তার দিকে ইঙ্গিত বহন করে।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

'আর কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন।'
(সুরা আলি ইমরান: ১৫৯)

এ আয়াতটিতে আল্লাহ তাআলা পরামর্শ করার আদেশ করেছেন। এই আয়াত দ্বারা রাসুলুল্লাহ-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ-কে পরামর্শ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে; অথচ তিনি একজন নবি। বিভিন্ন বিষয়ে অবগত করার জন্য তাঁর কাছে ওহি আসত। তাহলে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে আর কী বলার থাকতে পারে, যাদের স্বভাবের মধ্যেই মিশে আছে দুর্বলতা, ভুলে যাওয়া, তাড়াহুড়া করা ও ভুল করা!

আল্লাহ তাআলা মুমিনদের গুণাগুণের বর্ণনা দিয়ে বলেন:

وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ

'নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে তারা নিজেদের কাজ সম্পাদন করে।'
(সুরা আশ-শুরা: ৩৮)

তাই মানুষের প্রতিটি দিকের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে পরামর্শ করার গুরুত্ব অনেক বেশি। যাতে করে কার্যসিদ্ধির ক্ষেত্রে উম্মাহ ভুল ও ভ্রান্তিতে পতিত না হয়। উম্মাহকে যেন অবনতি ও পরাজয়ের গ্লানি আস্বাদন করতে না হয়। উম্মাহকে যেন একচেটিয়া ও নির্দিষ্ট কারও মতের অনুগত হতে না হয়।

মানুষের জীবন সঠিকতা ও উত্তমতার ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য এটি একটি মৌলিক নিয়ম। এর ফলে মানুষ প্রকৃত কর্ম তালাশ করতে পারবে, তারা শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে এগুতে পারবে, কল্যাণের পথে আসতে পারবে। এ নীতিটি ক্ষতির প্রতিবন্ধক হবে। ব্যক্তির ও ক্ষতির উপাদানের মাঝে বাধা হয়ে থাকবে এটি। এ জন্য ইসলাম এর প্রতি অত্যন্ত

গুরুত্বারোপ করেছে এবং এ ব্যাপারে শিথিলতা করতে নিষেধ করে দিয়েছে। এটির প্রতি এত বেশি গুরুত্ব দেওয়ার আরেকটি কারণ হলো, যাতে করে মানুষ আমিত্ববোধ ও একনায়কতান্ত্রিকতার ক্ষতিতে পতিত হওয়া থেকে বেঁচে থাকতে পারে।

আরও একটি তাত্ত্বিক দিক হলো, যে ব্যক্তি পরামর্শ করার বিষয়গুলোতে কোনো চিন্তাবিদ বা বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করবে, তাহলে তার সিদ্ধান্ত ভুল হলেও সে ক্ষেত্রে ওই ভুল তার একার ওপর বর্তাবে না। এ ব্যাপারে কোনো এক জ্ঞানী বলেন, 'আমি কখনো ভুল করি না। কারণ, যখন কোনো বিষয়ে আমি চিন্তিত থাকি, তখন আমি আমার জাতির সাথে পরামর্শ করি। তারা যা বলে, তার ওপর ভিত্তি করে আমি কাজ করি।' এমনটি হলে যদি সিদ্ধান্ত সঠিক প্রমাণিত হয়, তবে সকলেই তার বাহ বাহ পায়। আর যদি তা ভুল হয়ে থাকে, তবে ভুলের মাশুল সবাইকে গুনতে হয়।

আবু হুরাইরা(রা:) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন:

'যখন তোমাদের আমিরগণ হবে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম এবং তোমাদের ধনীরা হবে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দানশীল এবং তোমাদের কাজকর্ম পরিচালিত হবে তোমাদের পরামর্শের ভিত্তিতে, তখন জমিনের ভেতরের চেয়ে জমিনের ওপর হবে তোমাদের জন্য উত্তম। আর যখন তোমাদের আমিরগণ হবে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ আর তোমাদের ধনীরা হবে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ এবং তোমাদের কর্তৃত্ব থাকবে মহিলাদের হাতে তখন জমিনের ওপরের চেয়ে জমিনের ভেতরটা তোমাদের জন্য উত্তম হবে। '

দাওয়াতের ক্ষেত্রে পরামর্শ করার জন্য পরামর্শ সংবলিত আয়াতটি মক্কায় নাজিল হয়েছিল। এরপর যখন মদিনায় মুসলিমদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হলো, তখন এ পরামর্শের প্রয়োজনীয়তা আরও বৃদ্ধি পেল। নবিযুগে পরামর্শ করার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছিল; অথচ তখন মুসলিমদের নেতৃত্বে ছিলেন স্বয়ং রাসুলুল্লাহ! তবুও তখন পরামর্শের আদেশ বহাল ছিল। এ থেকে দুটি বিষয় স্পষ্ট হয়:

প্রথমত, সাধারণ বিষয়গুলোতে সকল মুসলমানের নিজেদের মাঝে পরামর্শের জন্য আহ্বান করা হয়েছে; চাই তা যত সহজ ও হালকা বিষয়ই হোক না কেন। সুরা শুরার পরামর্শ সংবলিত আয়াতটির নাজিলের সময়ক্ষণ থেকে এটা সহজেই অনুমিত হয়। কেননা, তখন তো মুসলিমদের কোনো রাষ্ট্র ছিল না। তাহলে তাদেরকে নিজেদের স্বল্প পরিসরের

বিষয়গুলোতেই পরামর্শ করার আদেশ করা হয়েছিল। এ থেকে বোঝা যায়, মুসলিমদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও সাধারণ সকল ব্যাপারেই পরামর্শ করে চলতে হবে।

দ্বিতীয়ত, মুসলমানদের সাধারণ ব্যাপারগুলোতে যেহেতু পরামর্শের বিধান রাখা হয়েছে, তাহলে এর চেয়ে জরুরি বিষয়গুলোতে; বিশেষ করে মুসলিমদের পরিচালনার ক্ষেত্রসমূহে অবশ্যই পরামর্শ করার বিষয়টি আরও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, এটা তাদের অন্যতম মৌলিক ভিত্তি হিসাবে দাঁড়াবে।

এখানে আরেকটি বিষয়ে সতর্ক হওয়া জরুরি যে, পরামর্শ কখনো নসনির্ভর বিষয়গুলোতে হবে না। কেননা, যেসব বিধান কুরআন ও হাদিসের নস দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, সেসব বিষয়ে পরামর্শ করার কোনো সুযোগ নেই। এখানে কারও কোনো মতামত প্রদানের অবকাশ নেই। নসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে এসব বিষয়ে কোনো ধরনের সন্দেহ বা পর্যালোচনার অবকাশ নেই। কেননা, এতে কোনো ভুল-ভ্রান্তির অবকাশ নেই। পরামর্শ হবে কেবল পার্থিব বিষয়াদিতে, যে বিষয়গুলো বুদ্ধি, চিন্তা ও অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভরশীল। আর وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য। এ আয়াতের মধ্যে। দ্বারা উদ্দেশ্য, উম্মাহর পার্থিব বিষয় সংবলিত শাসকদের কর্মপন্থাসমূহ।

যদি শাসকদের আকিদা, ইবাদত ও হালাল-হারামের মতো ওহি সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে পরামর্শ করার সুযোগ দেওয়া হতো, তবে ইসলামের মূলভিত্তি পুরোটাই ভেঙে পড়ত, দ্বীনের বিষয়গুলো মানুষের চাহিদার ওপর অর্পিত হতো এবং সর্বদা এগুলো পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ওপর থাকত। অবস্থা এমন হতো যে, যে কেউ মসনদে এসেই দ্বীনের মৌলিক ভিত্তিগুলো একেকবার একেকরকম করে দিত।

তাই পরামর্শের ক্ষেত্র হলো ওই সব পার্থিব বিষয়, যে ব্যাপারে কুরআন ও হাদিসের মধ্যে কোনো নস নেই এবং যে ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের ইজমাও নেই। মূলত যে বিষয়ের ভিত্তি সঠিক চিন্তা-ভাবনা ও নির্ভুল সিদ্ধান্ত ব্যতীত অন্যটি নেই, সেই বিষয়েই কেবল পরামর্শ করতে হবে। আর যে বিষয়ে কুরআন-হাদিসের সরাসরি নস বা দলিল আছে, সে বিষয়ে কোনো ধরনের দ্বিধা ও সংশয় ছাড়াই দলিলের ওপর আমল করতে হবে।

কোনো ধরনের দ্বিধা ও সংশয় ছাড়া ধৈর্যের সাথে ওহির অনুসরণ করা এবং কাফির-মুশরিকদের এড়িয়ে চলার আদেশ করে আল্লাহ তাআলা বলেন:

اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۝

'আপনি আপনার রবের পক্ষ থেকে আদিষ্ট বিষয়ের অনুসরণ করুন। তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই এবং মুশরিকদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। '
(সুরা আল-আনআম: ১০৬)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ۝

'আপনার রবের পক্ষ থেকে যা প্রত্যাদেশ করা হয়, আপনি তার অনুসরণ করুন এবং ধৈর্যধারণ করুন, যতক্ষণ না আল্লাহ ফয়সালা করেন। বস্তুত তিনি হচ্ছেন সর্বোত্তম ফয়সালাকারী। '
(সুরা ইউনুস: ১০৯)

অন্য আরেক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

'আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে যা প্রত্যাদেশ করা হয়, আপনি তার অনুসরণ করুন। নিশ্চয় তোমরা যা করো, আল্লাহ সে বিষয়ে খবর রাখেন। '
(. সুরা আল-আহজাব: ২)

নবুওয়াতের যুগে ও খুলাফায়ে রাশিদার যুগে পরামর্শ

পরামর্শ করাটা রাসুলুল্লাহ-এর সাধারণ অভ্যাস ছিল। তিনি পার্থিব বিষয়গুলো সাহাবায়ে কিরামের সামনে পেশ করতেন, তাদের কাছ থেকে পরামর্শ নিতেন এবং পরামর্শের ভিত্তিতে সঠিক ও নির্ভেজাল সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করতেন। রাসুলুল্লাহ তাঁর আশপাশে থাকা বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান ও প্রভাবশালী সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করতেন। তিনি এটা করতেন সাধারণ ও

বিশেষ উভয় বিষয়াদির ক্ষেত্রে। তাহলে একবার চিন্তা করে দেখুন, যুদ্ধ বা রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রে অবস্থা কী ছিল?

উদাহরণস্বরূপ এখানে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা সংগত মনে করছি:

• বদর যুদ্ধে রাসুলুল্লাহ হাব্বাব বিন মুনজির-এর পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন। বদরে এসে রাসুলুল্লাহ প্রথমে অল্প পানিসম্পন্ন এক স্থানে অবস্থান নিলেন। অতঃপর বললেন, আমাকে অবস্থানের জায়গা সম্পর্কে তোমরা পরামর্শ দাও। তখন হাব্বাব বিন মুনজির বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমি এই জায়গা সম্পর্কে এবং এখানকার কূপগুলো সম্পর্কে অবগত আছি। আপনি যদি চান, তাহলে আমরা পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে একটি সমৃদ্ধ ও সুমিষ্ট কূপের নিকট যাব। সেটি হবে আমাদের অবস্থানস্থল। শত্রুপক্ষের আগেই সেখানে পৌঁছব এবং সেই কূপ ব্যতীত সকল কূপের পানি নষ্ট করে দেবো। তখন রাসুলুল্লাহ হাব্বাব-এর এই পরামর্শ গ্রহণ করলেন। কারণ, এটি ছিল যুদ্ধের জন্য খুবই উপযুক্ত ও সঠিক একটি পরামর্শ। এ ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, রাসুলুল্লাহ পরামর্শের মাধ্যমেই এই মতটি গ্রহণ করেছিলেন।

• উহুদের সময় রাসুলুল্লাহ সাহাবায়ে কিরাম-এর সাথে পরামর্শ করলেন যে, মদিনা থেকে বের হয়ে যুদ্ধ করবেন নাকি মদিনার ভেতরে থেকে যুদ্ধ করবেন। এ ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ-এর মত ছিল মদিনা থেকে বের না হয়ে ভেতরেই অবস্থান করা। আর যখন শত্রুপক্ষ মদিনায় প্রবেশ করবে, তখন গলির মুখে তাদের সাথে যুদ্ধ করবেন এবং নারী ও শিশুরা ঘরের ভেতরে ছাদের ওপর অবস্থান করবে। আর মূলত এটিই ছিল সঠিক মত।

অন্যদিকে যে সকল সাহাবি বদর যুদ্ধে যেতে পারেনি, তারা পরামর্শ দিল মদিনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার এবং তারা এ ব্যাপারে রীতিমতো পীড়াপীড়ি করতে লাগল। তখন রাসুলুল্লাহ তাদের আগ্রহ-উদ্দীপনা দেখে তাদের পরামর্শকে প্রাধান্য দিলেন এবং বাইরে বের হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। এখানে রাসুলুল্লাহ তাঁর আগ্রহের বিপরীত অধিকাংশ সাহাবি, বিশেষ করে যুবক সাহাবিদের আগ্রহ ও মতামত প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

রাসুলুল্লাহ কর্তৃক পরামর্শকে অগ্রাধিকার প্রদান করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মুসলমানদের অন্তরে যেন পরামর্শের গুরুত্ব দৃঢ়ভাবে গেঁথে যায় এবং এটিকে তাদের জন্য অপরিহার্য বিষয় বানিয়ে নেয়। তাদের কোনো একটি কাজও যেন পরামর্শ ব্যতীত না হয়।

• খন্দক যুদ্ধের সময় যখন সমস্ত মুশরিক এক হয়ে মুসলমানদের সমূলে উপড়ে ফেলার জন্য মদিনায় আক্রমণ করার জন্য অগ্রসর হচ্ছিল, তখন রাসুলুল্লাহ সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শ করলেন। তখন সালমান ফারসি পরিখা খননের পরামর্শ দিলেন। যেন তা শত্রুদের মদিনায় প্রবেশের প্রতিবন্ধক হিসাবে দাঁড়ায়। তখন রাসুলুল্লাহ এই মত গ্রহণ করে পরিখা খননের আদেশ দিলেন এবং নিজেও খনন কাজে অংশগ্রহণ করলেন।

• অনুরূপভাবে রাসুলুল্লাহ বদরের যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারেও সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শ করেছিলেন। তখন আবু বকর বন্দীদের ব্যাপারে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়ার পক্ষে মত দিলেন। আর উমর তাদের হত্যা করার পরামর্শ দিলেন। তখন রাসুলুল্লাহ আবু বকর -এর মত গ্রহণ করলেন এবং মুক্তিপণের বিনিময়ে সবাইকে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

পরামর্শ করার পদ্ধতি

ইসলাম পরামর্শের জন্য নির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতি নির্ধারণ করে দেয়নি যে, পরামর্শের ক্ষেত্রে তাদের সেই পদ্ধতিই অনুসরণ করতে হবে; বরং বিষয়টি তাদের ওপর স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিয়েছে, যাতে করে এটি তাদের জন্য সহজ হয়।

আর ইসলামের একটি বড় মূলনীতি হলো, ইসলাম কঠোরতা ও সংকীর্ণতা চায় না; বরং মানুষ সহজভাবে জীবনযাপন ও ধর্ম পালন করবে, এটিই ইসলামের মূলনীতি।

এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন:

هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

তিনি তোমাদের পছন্দ করেছেন এবং ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি। '
(সুরা আল-হজ: ৭৮)

আল্লাহ তাআলা বলেন:

يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

'আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; তোমাদের জন্য জটিলতা চান না।'
(সুরা আল-বাকারা: ১৮৫)

আল্লাহ তাআলা বলেন:

هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى

'তিনি তোমাদের সম্পর্কে ভালো জানেন, যখন তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা থেকে এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে কচি শিশু ছিলে। অতএব, তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না। তিনি ভালো জানেন, কে তাকে ভয় করে চলে। '
(সুরা আন-নাজম: ৩২)

আল্লাহ তাআলা বলেন:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا

'তুমি কি তাদের দেখোনি, যারা নিজেদের পূত-পবিত্র বলে থাকে, অথচ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকেই পবিত্র করেন? বস্তুত তাদের ওপর সুতা পরিমাণ অন্যায়ও করা হবে না।'
(সুরা আন-নিসা: ৪৯)

তৃতীয় মূলনীতি : ন্যায়পরায়ণতা

ন্যায়পরায়ণতার ওপরই ইসলামি শাসনব্যবস্থার মূলভিত্তি স্থাপিত। ন্যায়পরায়ণতা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি স্তম্ভ। ইসলামে বর্ণিত ব্যবস্থায় এমন কোনো দিক নেই, যেখানে ন্যায়পরায়ণতার প্রয়োজন নেই। একজন মানুষকে ব্যক্তিজীবন থেকে নিয়ে তার পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত ও ন্যায়পরায়ণ হতে হবে। এটিই ইসলাম কর্তৃক নির্ধারিত মূলনীতি।

ন্যায়পরায়ণতার ক্ষেত্র ও পরিধি অনেক বিস্তৃত হলেও এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় শুধু শাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট ন্যায়পরায়ণতা। এ ক্ষেত্রটি শাসক ও প্রভাবশালীদের সাথে সম্পৃক্ত। এরাই মূলত মানুষকে পরিচালনা করে থাকে।

ইসলাম সম্পর্কে জানাশোনা আছে, এমন প্রত্যেক জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি নিশ্চিতভাবেই জানে যে, ইসলামে ন্যায়পরায়ণতার গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলামের প্রতিটি বিধানই ইনসাফপূর্ণ। তাই ইনসাফ বা ন্যায়পরায়ণতা ব্যতীত ইসলামি রাজনীতির কোনো ভিত্তিই নেই।

শাসক ও প্রভাবশালী যখন মানুষের অধিকারের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না, মানুষকে তার প্রাপ্য মর্যাদা দেয় না; বরং জনগণের ওপর জুলুম ও জবরদস্তির রাজত্ব কায়েম করে; অবশ্যই সেই শাসনব্যবস্থা দুর্নীতিগ্রস্ত ও নীতিহীন হয়ে থাকে। এমন নিজাম জবরদস্তি ও স্বৈরতন্ত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সেই শাসনব্যবস্থার মূলে ন্যায়পরায়ণতা না থাকার কারণে ইসলাম কখনোই তাকে সমর্থন করে না।

মানুষের বাস্তব জীবনে শাসনের ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতাই যে মূলভিত্তি, সেই বিশ্বাস ও ইয়াকিন যেন মানুষের মনের গভীরে প্রবেশ করে, সেই জন্য পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন:

بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দেন যে, তোমরা প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দাও। আর যখন তোমরা মানুষের কোনো বিচার-মীমাংসা করতে আরম্ভ করো, তখন ন্যায়ভিত্তিক মীমাংসা করো। আল্লাহ তোমাদের সদুপদেশ দান করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী, দর্শনকারী। '(সুরা আন-নিসা: ৫৮)

বান্দাকে সকল ক্ষেত্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং ন্যায়ের ওপর থ াকতে হবে। কোনো অবস্থাতেই অন্যায় পথে যাওয়া যাবে না এবং ঘৃণিত পক্ষপাতিত্ব অবলম্বন করে কারও প্রতি জুলুম করা যাবে না। যারা তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে সাক্ষ্য, বিচার ও শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে ন্যায়কে পরিহার করে অন্যায়কে গ্রহণ করে, তাদের সতর্ক করে আল্লাহ তাআলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

'হে মুমিনগণ, তোমরা ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী হয়ে যাও আল্লাহর সাক্ষীরূপে; যদিও তা তোমাদের নিজের অথবা মাতা-পিতার ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতিকূল হয়। কেউ যদি সম্পদশালী কিংবা দরিদ্র হয়, তাহলে আল্লাহ তোমাদের চেয়ে তাদের ব্যাপারে অধিক কল্যাণকামী। অতএব, তোমরা বিচার করতে গিয়ে রিপুর কামনা-বাসনার অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে প্যাঁচিয়ে কথা বলো কিংবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কর্ম সম্পর্কেই অবগত। '(সুরা আন-নিসা:১৩৫)

মুসলমানদের ওপর ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা ও অন্যায় থেকে দূরে থাকা একান্ত আবশ্যক। প্রতিটি মুসলমানকে তার পরিচিত-অপরিচিত, নিকটবর্তী- দূরবর্তী, একাকী বা জামাতবদ্ধ অবস্থায়- এককথায় সকল ক্ষেত্রে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই কারও প্রতি অন্যায় ও জুলুম করা যাবে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

'আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসংগত কাজ ও অবাধ্যতা করতে বারণ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন, যাতে তোমরা স্মরণ রাখো। (সুরা আন-নাহল-৯০)

আল্লাহ তাআলা রাসুলুল্লাহ-কে মানুষের মধ্যে ন্যায়সংগতভাবে বিচার করার আদেশ করেছেন এবং এর মাধ্যমে তিনি সকল শাসক ও ক্ষমতাবানদের উদ্দেশ্য নিয়েছেন যে, তারা যেন মানুষের মধ্যে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে। কোনোভাবেই যেন তাদের ওপর জুলুম-অত্যাচার না করে।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ َ

'আর আপনি যদি ফয়সালা করেন, তবে ন্যায়সংগত ফয়সালা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ সুবিচারকারীদের ভালোবাসেন।'(. সুরা আল-মায়িদা: ৪২)

যারা মানুষের মাঝে ন্যায় ও ইনসাফের সাথে শাসন করে-আল্লাহর বিধান অনুযায়ী শাসন করে, হাদিসে তাদের অনেক ফজিলতের কথা বলা হয়েছে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তারা অনেক সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হবে।

আবু হুরাইরা(রা:) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন:

'যেদিন আল্লাহর ছায়া ব্যতীত অন্য কারও ছায়া বাকি থাকবে না, সেদিন আল্লাহ তাআলা সাত ব্যক্তিকে ছায়া দেবেন। একজন হলো ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ। '

আব্দুল্লাহ বিন আমর(রহ.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন:

'ন্যায় বিচারকগণ (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ তাআলার নিকটে নুরের মিম্বারে মহামহিম দয়াময় প্রভুর ডানপাশে উপবিষ্ট থাকবে-আর তাঁর উভয় হাতই ডান হাত (তথা সমান মহিয়ান) ৩৬৪- যারা তাদের শাসনকার্যে তাদের পরিবারের লোকদের ব্যাপারে ও তাদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্বসমূহের ব্যাপারে সুবিচার করে।

আবু সাইদ(রা:) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন:

'কিয়ামতের দিন লোকদের মাঝে ন্যায়নিষ্ঠ শাসকই হবে আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে প্রিয় ও নিকটে উপবেশনকারী। আর তাদের মাঝে অত্যাচারী শাসকই হবে আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে ঘৃণিত ও দূরে অবস্থানকারী। '

আর এর বিপরীতে জুলম হলো সবচেয়ে বড় ও নিকৃষ্ট অপরাধ। ইসলাম জুলম ও জালিমদের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর ধমকি দিয়েছে। হাদিসে এ ব্যাপারে ভয়াবহ পরিণতির কথা বর্ণিত হয়েছে।

মাকিল বিন ইয়াসার(র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহﷺ-কে বলতে শুনেছি:

'কোনো দায়িত্বশীল ব্যক্তি মুসলিমদের দায়িত্ব লাভ করল, অতঃপর সে তার প্রজাদের সাথে প্রতারণা করে মৃত্যুবরণ করল; তাহলে আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন।'

ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহর এতগুলো নস শুধু আলোচনা ও উপমা বর্ণনা করার জন্য আসেনি; বরং বাস্তবজীবনে তা প্রতিষ্ঠা করার জন্যই এ নসসমূহ এসেছে। ইসলামের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এর বাস্তব প্রমাণ অনেক আছে। আমাদের প্রিয়নবি মুহাম্মাদ ছিলেন সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ন্যায়পরায়ণ। তাঁর ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে কেউ সামান্য পরিমাণ বিতর্কও করতে পারবে না।

অনুরূপভাবে খুলাফায়ে রাশিদিন-আবু বকর, উমর, উসমান এ, আলি-সহ অনেক মুসলিম শাসক ছিলেন ন্যায়পরায়ণতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তারা ছিলেন নেক, সৎ ও আল্লাহভীরু। তারা পৃথিবীতে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাদের মাঝে আল্লাহভীতি ও ন্যায়পরায়ণতা এমন সমৃদ্ধ পরিমাণে ছিল যে, তাদের জীবনের দিকে তাকালে অবাক হয়ে যেতে হয়। আশ্চর্য হয়ে মনের মধ্য থেকে প্রশ্ন এসে যায়, এটাও কি সম্ভব? আমাদের ইসলামি ইতিহাস এমনই গৌরবোজ্জ্বল হয়ে আছে, যার কিয়দাংশও অন্য কোনো জাতি দেখাতে পারবে না।

চতুর্থ মূলনীতি: সাম্য ও সমতা

সমতা ইনসাফপূর্ণ সম্পর্কের একটি দলিল। কেননা, সমতা ইনসাফেরই একটি প্রকার। সুতরাং সমতা নিয়ে কথা বলা মূলত ইনসাফ নিয়ে কথা বলারই নামান্তর।

এ ব্যাপারে মূলনীতি হলো, ইসলামের দৃষ্টিতে মানবিক সমতা একমাত্র অভিন্ন বিশ্বাস ও ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত হয়। আর মৌলিক উৎস হিসাবে ইসলামের বিশ্বাস ও ব্যবস্থাপনা হলো পথনির্দেশিকা। আর এ জাতীয় বিষয়াদি তৈরি করার ব্যাপারে ইজতিহাদ-সংশ্লিষ্ট ব্যাপার ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে মানুষের শক্তি প্রয়োগের কোনো অবকাশ নেই। আর সে অবকাশটুকু হলো কেবল ফিকহি বিধিবিধানের শাখাগত মাসায়িল, যা শরিয়তের মূলনীতিসমূহের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ।

তা ছাড়াও অভিন্ন বিশ্বাস ও ব্যবস্থাপনা স্বতঃসিদ্ধভাবেই মানুষের মাঝে সমতা প্রতিষ্ঠা করে। আর এটি এমন একটি সুদৃঢ় মূলনীতি, যা কোনো কারণেই ভঙ্গ হওয়ার নয়। এখানে নারী

বা পুরুষ হওয়া, ধনী বা গরিব হওয়া, শাসক বা শাসিত হওয়া, সুন্দর বা কুৎসিত হওয়া- এভাবে বর্ণ, গোত্র ও জাতীয়তার ভিন্ন কোনো মর্যাদা নেই।

আল্লাহ তাআলা স্বীয় বান্দাদের মাঝে ভাষা, গোত্র ইত্যাদি দিক থেকে ভিন্নতা দিলেও মর্যাদার মাপকাঠি একটিই রেখেছেন। আর তা হলো তাকওয়া। যার তাকওয়া বেশি আল্লাহর নিকটে তার মর্যাদা বেশি। চাই সে বর্ণ, গোত্র, আকৃতি ইত্যাদির বিবেচনায় সবচেয়ে নিম্নস্তরেরই হোক না কেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُم ْ

'হে মানবজাতি, আমি তোমাদের একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের বিভিন্ন গোত্র ও দল-উপদলে বিভক্ত করেছি; যেন তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পারো। নিশ্চয় তোমাদের মধ্য হতে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে মর্যাদাবান হলো সর্বাধিক তাকওয়াবান ব্যক্তি।'
(সুরা আল-হুজুরাত:১৩)

আল্লাহর এ ঐশী বাণীর আলোকে কারও জন্য কোনো দৃষ্টিকোণ থেকেই একে অন্যের ওপর প্রাধান্য ও মর্যাদাপ্রাপ্ত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। একমাত্র তাকওয়ার মাধ্যমেই তাদের মাঝে মর্যাদার পার্থক্য নির্ণীত হবে। মর্যাদার এ মানদণ্ডের সাথে আরেকটি জিনিস যুক্ত করা যায়। আর তা হলো, উপকারী ইলম। সুতরাং আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম ও সর্বাধিক মর্যাদাবান ব্যক্তি সে, তাকওয়া ও ইলমে যে অধিক অগ্রগামী।

আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারে বলেন:

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَات ٍ

'তোমাদের মধ্য হতে যারা ইমান এনেছে এবং যাদের ইলম দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের অনেকগুণ মর্যাদা উন্নীত করে দেন। '(সুরা আল-মুজাদালা:১১)

বর্তমান সময়ে নর-নারীর মাঝে পার্থক্যকরণের দৃষ্টিভঙ্গিটি মূর্খতাসুলভ ভ্রান্ত মানসিকতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। অথচ ইসলাম আজ থেকে দেড় সহস্র বছর পূর্বেই এ ভ্রান্ত মানসিকতা প্রত্যাখ্যান করেছে। সৎ আমল করলে সে পুরুষ হোক আর নারী হোক মর্যাদা সবার সমান। এখানে লিঙ্গভেদে মর্যাদার কোনো হেরফের হবে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

'মুমিন নর-নারী হতে যারা সৎকর্ম করবে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের প্রতি তিল পরিমাণও জুলুম করা হবে না।' (সুরা আন-নিসা:১২৪)

মেয়েদের বাদ দিয়ে শুধু ছেলেদেরই মর্যাদার আসীনে সমাসীন করা ও এমন পদ পেয়ে উপভোগ করার বাসনা অলীক কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। এমন ভাবনা তার সামান্য কাজেও আসবে না। তাই আল্লাহ তাআলা পূর্ব থেকেই এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন। যাতে করে মন-মস্তিষ্কে এ কথা বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, একমাত্র সৎকর্মের মাধ্যমেই নিশ্চিত হবে আখিরাতের মুক্তি, লিঙ্গ পরিচয়ের মাধ্যমে নয়।

স্বয়ং আল্লাহ তাআলা বলেন:

لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

'এটা তোমাদের ভাবনা অনুসারেও হবে না এবং আহলে কিতাবদের কল্পনা অনুযায়ীও হবে না। যে ব্যক্তি অসৎ কর্ম করবে, তাকে তদনুযায়ীই প্রতিফল দেওয়া হবে এবং সে আল্লাহকে ছাড়া কাউকে বন্ধু ও সাহায্যকারী হিসাবে পাবে না। '(সুরা আন-নিসা: ১২৩)

রাসুলুল্লাহ বান্দার মাঝে সাম্যের বিষয়টি আমাদের স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন। সাথে এটাও পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, সকলের প্রাণ সমান মূল্যমান। এতে কোনো ধরনের পার্থক্য করার সুযোগ নেই। তবে কাফির- মুশরিকদের ব্যাপারটা ভিন্ন। কেননা, শরিয়তের দৃষ্টিতে তাদের কোনো সম্মান ও মর্যাদা নেই।

আলি (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ

'মুমিনদের সবার প্রাণ সমমর্যাদার। আর তারা অমুসলিমদের বিরুদ্ধে একটি হাতের মতো (একতাবদ্ধ)। তাদের একজন সাধারণ ব্যক্তিও (অমুসলিম) লোকদের নিরাপত্তা দিতে পারে। '

আল্লাহ তাআলা আদম-কে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন; যদ্দরুন তিনি সকল মানুষের পিতা হিসাবে পরিগণিত হয়েছেন। এর পরে কারও জন্য জন্মের ব্যাপারে অন্যের ওপর প্রাধান্য নেই। আরব-আজম এতে সবাই বরাবর। কেননা, সকল মানুষ একটি মূল উপাদান থেকে সৃষ্ট। আর তা হলো মাটি। তারা পরস্পর একমাত্র তাকওয়ার ভিত্তিতে মর্যাদায় প্রতিযোগিতা করবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজের ভাষণে বলেছেন:

'হে লোকসকল, নিশ্চয় তোমাদের প্রভু একজন এবং তোমাদের পিতা একজন। সাবধান! অনারবের ওপর কোনো আরবের মর্যাদা নেই এবং আরবের ওপর কোনো অনারবের মর্যাদা নেই। অনুরূপ কৃষ্ণাঙ্গের ওপর কোনো শ্বেতাঙ্গের ফজিলত নেই এবং শ্বেতাঙ্গের ওপর কোনো কৃষ্ণাঙ্গের ফজিলত নেই। মর্যাদার মাপকাঠি হলো, একমাত্র তাকওয়া।

আবু হুরাইরা (রা:) রাসুলুল্লাহ ﷺথেকে বর্ণনা করেন:

وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ

'যার আমলের গতি শ্লথ হবে, তার বংশমর্যাদা তাকে ত্বরান্বিত করতে পারবে না।'

সর্বোপরি ইসলামে সকল মুসলমানের প্রাণমূল্য সমান। সকলেই এদিক থেকে একই ধরন ও সমপরিমাণ মর্যাদার অধিকারী। তবে যারা তাকওয়া ও ইলমের অধিকারী হবেন, তারা স্ব স্ব তাকওয়া ও ইলমের স্তর অনুযায়ী মর্যাদার বিভিন্ন স্তরে উন্নীত হবেন।

ইসলামের সাম্যনীতি আলোচনার পর আমরা কাফির, মুশরিকদের কতিপয় মিথ্যা অপবাদ ও প্রোপাগাণ্ডা উল্লেখ করতে চাই, যাদের অন্তর ইসলামের বিরুদ্ধে হিংসা ও ঘৃণা দিয়ে ভরপুর, যাদের স্বভাব-প্রকৃতি ইসলাম ও মুসলমানদের বিপরীত অন্ধ ঘৃণার আগুনে উত্তপ্ত থাকে। আর তাই তারা নিজেদের অন্তরের তপ্ত আগুন নিভানোর জন্য ইসলামের ব্যাপারে জঘন্য অপবাদ ও মিথ্যা প্রচার করতে থাকে। এ ব্যাপারে খ্রিষ্টান, মূর্তিপূজারি, ধর্মনিরপেক্ষ, কমিউনিস্ট, ইহুদি, ঔপনিবেশিক সবাই এক ও অভিন্ন। এরা সবাই ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে সমভাবে শরিক। তারা সর্বদা এই দ্বীনের সীমানায় ওত পেতে অপেক্ষা করছে। সদা-সর্বদা ইসলামকে পৃথিবী থেকে উৎখাত ও সব স্থান থেকে মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে।

যুগে যুগে এভাবে ইসলামবিদ্বেষীরা বিভিন্ন মিথ্যা অপবাদ তৈরি করে এবং সাধারণ মুসলমানদের ইমানি শক্তি নষ্ট করার জন্য বিভিন্ন ধরনের সংশয় সৃষ্টি করতে থাকে। যেন দ্বীনের ব্যাপারে তারা সন্দেহ-সংশয়ে আক্রান্ত হয়ে দ্বীন থেকে বের হয়ে যায়। বিভিন্ন সময়ে দেখা যায়, তাদের চলচ্চিত্রগুলো ইসলামের বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডা ও বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে। যেমন দাস-দাসীর মাসআলা, একাধিক বিবাহের মাসআলা, নারীর ওপর পুরুষের কর্তৃত্বের মাসআলা, মিরাসের ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষের অর্ধেক সম্পদ পাওয়ার মাসআলা, দুজন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমমানের হওয়ার মাসআলা এবং বাধ্যতামূলক আহলে কিতাবদের জিজিয়া দেওয়ার মাসআলাসহ নানান বিষয়-ইসলামের শত্রু কাফিররা প্রতিনিয়ত যা প্রচার করে বেড়াচ্ছে। তারা এই বলে বিদ্বেষ ছড়ায় যে, দেখো, ইসলাম দাস-দাসীদের মানবেতর জীবনযাপনের প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপই করে না; অথচ তোমরা বলো, ইসলাম নাকি সকলকে তার ন্যায্য অধিকার দেয়! পুরুষেরা একাধিক বিবাহ করতে পারে, কিন্তু নারীদের ক্ষেত্রে কেন এ অবহেলা? পুরুষেরা কর্তৃত্বে থাকে, নারীরা তাদের অধীন হয়ে থাকে! উত্তরাধিকার সম্পদেও কেমন জুলুম! পুরুষরা নারীদের থেকেও বেশি পায়, আরও ইত্যাদি ইত্যাদি।

এখানে আমরা প্রতিটি মাসআলার কিছু ব্যাখ্যা দিতে চাই; যদ্দরুন এসব মাসআলায় ইসলামের যৌক্তিকতা ও ইনসাফপূর্ণ অবস্থান স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হবে।

দাস-দাসীর ব্যাপারে ইসলামের সাম্যনীতি

দাস-দাসীর মাসআলায় তো ইসলাম সর্বোত্তম অবস্থান গ্রহণ করেছে। পৃথিবীর শুরুলগ্ন থেকে চলে আসা দাস-দাসী ও সমাজের দুর্বলশ্রেণির লোকদের ইতিহাস তাই বলে। এটি সুস্পষ্ট একটি বিষয়, যা সুস্থ চিন্তা ও বোধসম্পন্ন যে কেউই স্বীকার করবে।

এ ব্যাপারে সংক্ষিপ্তাকারে ইসলামের অবস্থান হলো, যখন ইসলাম এ পৃথিবীর বুকে আত্মপ্রকাশ করে, তখন দাসপ্রথা মানবসভ্যতাকে গ্রাস করে নিয়েছিল। আচ্ছন্ন করে নিয়েছিল সমাজের প্রতিটি অংশ ও দলকে। ঘর, মাঠ, রাজমহল, সমাগমস্থল-এমন কোনো চারণভূমি ও বৈঠকখানা ছিল না, যেখানে দাস-দাসীদের অবাধ ব্যবহার করা হতো না।

এটা ছিল এমন এক নিদর্শন, যদ্বারা পুরো অতীত সমাজব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। ইসলামপূর্ব কোনো সমাজই এ থেকে মুক্ত ছিল না। বিষয়টি এতটাই ভয়ংকর ছিল যে, এমন বললেও অত্যুক্তি হবে না, 'পূর্বযুগে দাসের বিষয়টি ছিল মাটিতে প্রোথিত একটি খুঁটির মতো, যার ওপর প্রত্যেক জাতির ব্যক্তিগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা নির্ভরশীল ছিল।' সুতরাং যদি কোনো ধর্ম, মতবাদ বা বিশ্বাস ধীরতা অবলম্বন না করে প্রথম ধাপেই এর মূলোৎপাটন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত, তাহলে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রসহ পুরো ব্যবস্থাপনাই হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ত। ইসলামের একটি মৌলিক নীতিমালা হলো, ইসলাম প্রতিটি সমস্যার সমাধানের জন্য সঠিক ও সুচারু পদ্ধতি দেখিয়ে দেয়। আর তাই ইসলাম পরিমিত পন্থায় সুদৃঢ়ভাবে গুণে গুণে ধাপগুলো অতিক্রম করে তবেই এর সংস্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইসলাম এ ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য মৌলিকভাবে তিনটি পদ্ধতি গ্রহণ করেছে।

১. দাসব্যবস্থা নির্মূল ও মূলোৎপাটন।

২. আবশ্যিকভাবে বা সাওয়াবের উদ্দেশ্যে মুক্তকরণ।

৩. অর্থ বা শ্রমের বিনিময়ে মুক্তকরণ।

১. দাসব্যবস্থা নির্মূল ও মূলোৎপাটন

ইসলাম এমন অনেক বিষয়কে স্বীকৃতিই দেয় না, যার ভিত্তিতে লোকেরা মানুষকে দাস-দাসীতে রূপান্তরিত করত। যেমন: ঋণগ্রস্ত হওয়া, স্বাধীন মুক্ত লোকদের ধরে দাস হিসাবে বিক্রি করে দেওয়া, অন্যদের জন্য নিজের স্বাধীন সত্তাকে বিলীন করে দেওয়া, অপরাধীদের তাদের কৃত অপরাধ ও অন্যায় আচরণের জন্য দাস-দাসী বানানো, পারস্পরিক ঐচ্ছিক

লেনদেনের ভিত্তিতে দাস-দাসী বানানো ইত্যাদি। আমরা এখানে প্রতিটি বিষয়ের ওপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করব।

ক. ঋণগ্রস্ত হওয়া:

ইসলামপূর্ব যুগের কথা। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি অনেক সময় ঋণ পরিশোধ করতে অপারগ হয়ে যেত। যখন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি বারবার ঋণ আদায়ের ওয়াদা দিয়েও আদায়ে সক্ষম হতো না, তখন সর্বশেষ পন্থা হিসাবে ঋণদাতার দাস হিসাবে পরিগণিত হতে বাধ্য হতো। এটা ভুল ও অন্যায়মূলক প্রথা। ইসলাম এটাকে স্বীকৃতি দেওয়া তো দূরে থাক; বরং এমন পদ্ধতিকে হারাম ঘোষণা করেছে। শুধু তাই নয়; এমন ক্ষেত্রে ঋণদাতার ওপর আবশ্যক করে দিয়েছে যে, যতক্ষণ না ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণ আদায়ে সক্ষম হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে অবকাশ দিতে হবে। শেষ পর্যন্ত যদি সে ঋণ আদায়ে চূড়ান্তভাবে অক্ষম হয়, তবে তার ঋণ ক্ষমা করে দেবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

'আর যদি সে অসচ্ছল হয়, তাহলে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত মুলতবি করে রাখো। আর যদি দান (ক্ষমা) করে দাও, তাহলে তা তোমাদের জন্য আরও উত্তম, যদি তোমরা তা জানতে। (সুরা আল-বাকারা: ২৮০)

খ. স্বাধীন মুক্ত লোকদের ধরে দাস হিসাবে বিক্রি করে দেওয়া:

এটা হলো মানুষের স্বাধীনতাকে জোরপূর্বক দাসত্বে রূপান্তরিত করা। ইসলাম এটাকে কঠিনভাবে হারাম ঘোষণা করেছে। কেননা, পৃথিবীতে কারও এ অধিকার নেই যে, স্বাধীন কাউকে দাস হিসাবে রূপান্তর করা; এমনকি সে যদি এতে রাজি ও সন্তুষ্ট থাকে, তবুও নয়।

আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ বলেছেন:

قَالَ اللهُ : ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

'আল্লাহ তাআলা বলেন, তিন শ্রেণির লোকদের জন্য কিয়ামতের দিন আমি নিজে বাদী হব। প্রথমত, যে আমার নামে প্রতিজ্ঞা করে পরে তা ভঙ্গ করে। দ্বিতীয়ত, যে মুক্ত স্বাধীন মানুষ বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ করে। তৃতীয়ত, যে কোনো শ্রমিককে কাজে নিয়োগ দিয়ে তার থেকে কাজ পূর্ণভাবে আদায় করে নেয়, কিন্তু তার পারিশ্রমিক দেয় না। '(সহিহুল বুখারি: ৩/৮২, হা. নং ২২২৭ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)

গ. অন্যদের জন্য নিজের স্বাধীন সত্তাকে বিলীন করে দেওয়া:

জাহিলি যুগে এ প্রথার প্রচলন ছিল যে, মানুষ নিজের স্বাধীন সত্তাকে বিলীন করে দাসে রূপান্তরিত হয়ে যেত। এটা হারাম ও সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকেই অগ্রহণযোগ্য। কেননা, স্বাধীন ব্যক্তির এ অধিকার নেই যে, নিজেকে সে সম্পদের মতো দাসে রূপান্তরিত করবে। যাকে মানুষ ক্রয় করবে কিংবা উপার্জন ও রক্ষণাবেক্ষণে তার প্রতি আগ্রহ দেখাবে।

ঘ. অপরাধীদের অন্যায় ও ভুলের সাজাস্বরূপ দাস-দাসী বানানো:

পূর্বযুগে এ আইন ছিল যে, অপরাধভেদে অপরাধীকে দাস বানানো আবশ্যক ছিল। ইসলামি শরিয়তে এটাকে অত্যন্ত জঘন্য ও নিকৃষ্ট কর্ম হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে। কেননা, এটা কল্পনাও করা যায় না যে, কোনো

স্বাধীন ব্যক্তি তার অপরাধের জন্য দাসে রূপান্তরিত হবে। অপরাধের ক্ষেত্রে তার স্বাধীনতা বহাল রেখেই তাকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা যেতে পারে। যেহেতু কোনো অবস্থাতেই মানুষের স্বাধীনতা খর্ব করার কোনো অবকাশ নেই, যতই সে অপরাধ ও আইনভঙ্গ করে থাকুক না কেন। এতে শুধু সে তার প্রাপ্য শাস্তিটুকুই পাবে। এতটুকুই যথেষ্ট। এর বেশি অতিরিক্ত করা সীমালঙ্ঘন ও জুলুম বলে বিবেচিত।

ঙ. পারস্পরিক ঐচ্ছিক লেনদেন:

এ ধরনের লেনদেন সন্তানদের পিতা ও অন্যান্য লোকের মাঝে হয়ে থাকে। এর স্বরূপ হলো, নির্ধারিত মূল্যের বিনিময়ে সব সন্তান বা কিছু সন্তানকে বিক্রি করা। এ লেনদেনকে ইসলাম কঠিনভাবে নিন্দা ও তিরস্কার করেছে। বিবেক ও মানবতাও এটাকে জঘন্য বলে মনে করে।

কোনো ব্যক্তিই তার সন্তানকে বিক্রি করতে পারে না; করলে কিয়ামতের দিন সে আল্লাহর প্রতিপক্ষ হিসাবে চিহ্নিত হবে। আর আল্লাহর প্রতিপক্ষের জন্য ধ্বংস অবধারিত।

এ জাতীয় বিধি-নিষেধের মাধ্যমে ইসলাম অমানবিক ও অত্যাচারমূলক দাসপ্রথার দ্বার বন্ধ করে দিয়েছে; বরং এ কথা বললেও অত্যুক্তি হবে না যে, সে তো দাসত্বের উপকরণগুলোরই মূলোৎপাটন করে দিয়েছে। ইসলামের অনুপম বিধানদানের কারণেই শেষ পর্যন্ত অবৈধভাবে দাসপ্রথার অস্তিত্ব শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে।

২. আবশ্যকতার কারণে বা সাওয়াবের উদ্দেশ্যে দাস মুক্তকরণ

দাসরা যেন স্বাধীন মানুষে পরিণত হতে পারে, সে জন্য ইসলাম দাসমুক্তির অনুমোদন দিয়েছে। এটি কখনো আবশ্যিকভাবে হয়, আর কখনো সাওয়াবের উদ্দেশ্যে নফল হিসাবে হয়। যেমন:

ক. কোনো মুসলিম যখন শরিয়তের কিছু বিষয়ে সীমালঙ্ঘন করে, তখন তাকে ক্ষতিপূরণ ও বিকল্প হিসাবে কাফফারা তথা দাসমুক্ত করা আবশ্যক হয়ে যায়। এ অপরাধগুলো হলো, ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত কাউকে হত্যা করা, শপথ ভঙ্গ করা, জিহার (স্ত্রীকে মা-বোনের সাথে তুলনা) করা, রমজানে ইচ্ছাকৃত রোজা ভেঙে ফেলা। এ সকল অপরাধের কারণে কাফফারা আবশ্যক হয়। আর কাফফারা আদায় করতে হলে দাসমুক্ত করতে হবে। ইসলামে এ ব্যবস্থা থাকার কারণে দাসদের মুক্তি ত্বরান্বিত হবে।

খ. সাওয়াবের উদ্দেশ্যে নফল হিসাবে দাসমুক্ত করা মুমিনের সৎ সাহসিকতা ও উদারতার সাথে সম্পৃক্ত। ব্যক্তি ও দলের ভালোবাসা তাদেরকে এর প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। ইসলামও তাদের এ ব্যাপারে খুব উৎসাহ জোগায় এবং এ বিষয়ে জোর তাগিদ দেয়, যেন তারা দাসমুক্তির ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করে। দাসমুক্তির সাওয়াব ও পুরস্কারের ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহয় প্রচুর দলিল রয়েছে।

৩. অর্থ বা শ্রমের বিনিময়ে দাস মুক্তকরণ

এটি মনিব ও দাসের মাঝে কৃত চুক্তির মাধ্যমে সম্পাদন হয়। এ চুক্তির ফলে দাস স্বীয় দাসত্ব থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে মনিবকে নির্ধারিত অর্থ পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে। অতঃপর

নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ মনিবকে পরিশোধ করে স্বাধীন হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে অর্থ পরিশোধের জন্য সে বিভিন্ন কাজ করার সুযোগ পাবে। কিন্তু কাজ করে অর্থ সংগ্রহের প্রক্রিয়াতেও যদি সে অক্ষম বা দুর্বল হয়, তখন ইসলাম তার সাহায্যে এগিয়ে এসেছে। জাকাত আদায়ের নির্ধারিত খাতের মধ্যে তাকেও অর্ন্তভুক্ত করেছে। যেন দাস- দাসীদের মুক্তি আরও ত্বরান্বিত করা যায়।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم ٌ

'জাকাত-সদকা তো কেবল ফকির, মিসকিন, উত্তোলনকারী কর্মচারী, ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট অমুসলিম, দাসমুক্তি, ঋণগ্রস্ত,আল্লাহর রাস্তা ও মুসাফিরের জন্য; আল্লাহর পক্ষ থেকে এই বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়। '(আত-তাওবা:৬০)

এটি এ জন্য যে, তারা যেন তাদের মনিবকে নির্ধারিত অর্থ পরিশোধ করে দ্রুত স্বাধীন হয়ে যেতে পারে। মনিবদের এ কাজে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা মনিবদের নির্দেশনা দিয়ে বলেন:

فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا

'তাদের মধ্যে কোনো কল্যাণ দেখলে তাদের সঙ্গে অর্থের বিনিময়ে মুক্তির চুক্তি করো। '(আন-নুর:৩৩)

ইসলামপূর্ব সময়ে প্রচলিত দাসব্যবস্থায় ইসলামের অবস্থান ও এর শিকড়কেই উপড়ে ফেলে দেওয়ার নীতি স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এ ছিল সংক্ষিপ্ত আলোচনা। ইসলামের পক্ষে এটি সম্ভব হয়েছে সুকৌশল, সহজলভ্য পদ্ধতি অবলম্বন ও অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়ায়। এমনকি উম্মতের ওপর কিছু কাল অতিক্রম হয়ে কয়েক প্রজন্ম পার হতে না হতেই দাসপ্রথা দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেছে কিংবা ইতিহাসের হারিয়ে যাওয়া অংশ হয়ে গিয়েছে। এরপর দাসমুক্তির পথে যে পদস্খলন ঘটেছে, তা ইসলামি বিধিবিধানের অপপ্রয়োগের ফলাফল কিংবা আল্লাহর পথ থেকে সরে যাওয়ার পরিণতিস্বরূপ; যদ্দরুন শরয়ি

বিধিবিধান বাস্তবায়নের ব্যাপারে ধীরতা ও শিথিলতার অভিযোগে দ্বীনকে দোষারোপ করা হয়।

ইসলাম সর্বদা দাস-দাসীদের রক্ষা করেছে এবং তাদের মানবিক অধিকার সুনিশ্চিত করেছে। ইসলামি শরিয়তে সকল দাস-দাসীই সুরক্ষিত। এ ব্যাপারে মুলনীতি হলো, মানব সন্তানের মাঝে একমাত্র তাকওয়া ও সৎকর্মের দ্বারাই মর্যাদা ও ব্যবধান সৃষ্টি হয়। আল্লাহ তাআলা সুদৃঢ় শপথের মাধ্যমে বলেন:

وَالْعَصْرِ - إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ - إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

'কসম সময়ের। নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে তাগিদ করে সত্যের, তাগিদ করে সবরের। (. সুরা আল-আসর: ১-৩)

এখানে বর্ণ, গোত্র ও জাতীয়তা ইত্যাদির দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের দৈহিক গঠন, বাহ্যিক আকার-আকৃতি দেখার বিষয় নয়; বরং তার অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যই ইসলামে মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

ইমান ও সৎকর্মের চাইতে কোনো কিছু মূল্যবান হতে পারে না। মর্যাদা ও বিবেচনার দিক থেকে মানুষ চাই মনিব হোক বা গোলাম, ধনী হোক বা গরিব, শাসক হোক বা শাসিত-সবাই আল্লাহর নিকট এক সমান; যতক্ষণ পর্যন্ত ইমান ও সৎকর্মকেই মর্যাদা ও ব্যবধানের মাপকাঠি মানা হবে। আর এটিই তো ইসলামের মূলনীতি।

এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ বলেন:

أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِي، وَلَا أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَى

'সাবধান! না অনারবের ওপর কোনো আরবের মর্যাদা আছে আর না আরবের ওপর কোনো অনারবের মর্যাদা আছে, অনুরূপ না কৃষ্ণাঙ্গের ওপর কোনো শ্বেতাঙ্গের মর্যাদা আছে আর না কোনো শ্বেতাঙ্গের ওপর কোনো কৃষ্ণাঙ্গের মর্যাদা আছে।'

দাস-দাসীরা আল্লাহর বিধানে মনিবের ভাই বৈ ভিন্ন কিছু নয়। ইসলামের বিশ্বাস তাদের এক সুতোয় গেঁথে দিয়েছে এবং আল্লাহপ্রদত্ত পদ্ধতির একতা তাদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক সৃষ্টি করেছে। নবিজি গোলামদের ব্যাপারে বলেন:

'তারা তোমাদের ভাই। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তোমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছেন। অতএব, তোমরা যা খাও, তাদেরকেও তা খাওয়াও; তোমরা যা পরিধান করো, তাদেরকেও তা পরিধান করাও। তাদের সাধ্যাতীত কোনো কাজে বাধ্য করো না। একান্ত যদি করেই থাকো, তাহলে তাদের কাজে সাহায্য করো। ১৩৮৫

ইসলামি ব্যবস্থায় দাসদের মানুষ হিসাবে গণ্য করা এবং মর্যাদা ও নিরাপত্তার দিক থেকে তাদের সুরক্ষিত হওয়ার দলিল হলো, গোলামদের সাথে সীমালঙ্ঘন করলে ইসলাম তার প্রতিশোধের ব্যবস্থা রেখেছে। চাই সীমালঙ্ঘনটি হত্যা জাতীয় কিছু হোক বা সামান্য কোনো আঘাত, সম্মানহানি ও লাঞ্ছনা হোক।

আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারে মনিব-গোলাম সবার জন্য সমমানের বিধান অবতীর্ণ করে বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى

'হে মুমিনগণ, তোমাদের ওপর নিহতদের ব্যাপারে কিসাস তথা প্রতিশোধ গ্রহণ আবশ্যক করা হয়েছে। '(সুরা আল-বাকারা: ১৭৮)

কিসাস অর্থ পরস্পর সদৃশ ও মিল করা। সুতরাং অন্যায়ভাবে যে কেউ ইচ্ছাকৃত কাউকে হত্যা করবে, সে হত্যার উপযুক্ত হয়ে যাবে; নিহতের অবস্থান ও মর্যাদা যাই হোক না কেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ

'আর আমি তাতে (তাওরাতে) তাদের ওপর এ বিধান অবতীর্ণ করেছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং সকল আঘাতের জন্যই প্রতিশোধের বিধান রয়েছে। (সুরা আল-মায়িদা: ৪৫)

অতএব, হত্যা বা আঘাতের ক্ষেত্রে নির্যাতিত ব্যক্তির জন্য সীমালঙ্ঘনকারী ব্যক্তি থেকে সমপরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণের অবকাশ রয়েছে, বেশী করার অনুমতি নেই। তবে হ্যাঁ, নির্যাতিত ব্যক্তি যদি ক্ষমা করে দেয়, সেটা ভিন্ন ব্যাপার। এটি এমন একটি বিধান, যা সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রযোজ্য, যতক্ষণ তারা মুমিন থাকবে। এখানে অপরাধীর জাতীয়তা, বর্ণ বা সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক, বৈষয়িক ইত্যাকার কোনো অবস্থানের কোনো মূল্য নেই।

এ সংক্ষিপ্ত আলোচনায় মর্যাদা ও নিরাপত্তা বিধানের দিক থেকে মানুষের মাঝে সাম্যের বিষয়ে ইসলামের অবস্থান স্পষ্ট হয়ে যায়। এরপর ইসলামবিদ্বেষী শত্রু খ্রিষ্টান, ঔপনিবেশক, মূর্তিপূজারি, জায়নবাদি ইহুদি ও কমিউনিস্টদের ইসলামের ব্যাপারে মিথ্যারোপের আর কোনো অবকাশ নেই। যেখানেই তাদের অভিশপ্ত পা পড়েছে, সেখানেই তারা কঠোরতার মাধ্যমে মানবতা বিনষ্ট করেছে এবং মানুষের ওপর অযাচিত কর্তৃত্ব চালিয়েছে। যে দেশ বা জাতিই এ সকল শত্রুদের আগুনের শিকার হয়েছে, তারা লাঞ্ছনা, অপদস্থতা ও ধ্বংসের স্বাদ আস্বাদন করেছে। এ লাঞ্ছনা ও নির্যাতন শুধু তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং পুরো জাতি ও দলই তাদের শিকারে পরিণত হয়ে গেছে।

তারা মুসলিম জনগণের ওপর যে গণহত্যা ও ট্র্যাজেডি চালিয়েছে এবং কয়েক মিলিয়ন মুসলিমকে যেভাবে পাইকারি হারে হত্যা ও দেশত্যাগে বাধ্য করেছে, তা প্রকাশ করার মতো কোনো ভাষা নেই। যেমনটি তাদের পূর্বসূরি খ্রিষ্টানরা স্পেন ও মুসলিমদের কয়েকটি দেশে ঘটিয়েছে, যেখানে উপনিবেশ চরম বিশৃঙ্খলা ও ধ্বংস ডেকে এনেছে। অনুরূপভাবে যেমনটি ককেশাস, আলবেনিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, বুখারা, সমরকন্দসহ অন্যান্য মুসলিম দেশে ঘটিয়েছে। এসব অঞ্চলে তারা চরম নির্যাতন, উচ্ছেদ চালিয়েছে এবং অন্যায়ভাবে কয়েক মিলিয়ন মুসলিমকে হত্যা করেছে।

এরপর দুর্বল মূর্তিপূজারির দল, যারা অসভ্য বর্বর সৈন্যদের মাধ্যমে ভারত ও কাশ্মীরে ইতিহাসের জঘন্যতম গণহত্যা চালিয়েছে। এ সকল কুকীর্তি সত্ত্বেও এ নির্লজ্জ অপরাধীরা ইসলামের ব্যাপারে অভিযোগ ও মিথ্যারোপ করতে সামান্যতম দ্বিধাবোধ করে না, যারা কিনা মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষ হত্যা করেছে এবং মুসলিম সম্প্রদায়কে বিভিন্ন স্থান থেকে সম্মিলিতভাবে উচ্ছেদ করেছে।

এসব লোক নিজেরা মুসলিমদের হত্যা করে চলছে নির্বিচারে, বিনা অপরাধে। তাদের এ কাণ্ডে মানবতার চরম লঙ্ঘন হলেও এগুলো করতে তাদের হাত এতটুকুও কাঁপে না। কিন্তু তাদের আত্মা তখনই কেঁপে ওঠে, যখন তারা ইসলামে দাসপ্রথার জন্য সামান্য অনুমোদন রাখার কথা শোনে! এমনই তো তাদের বক্তব্য। একদিকে মানবতার চরম লঙ্ঘন করে আবার অন্যদিকে তারাই মানবতার বুলি আওড়িয়ে বেড়ায়।

মিরাসি সম্পত্তিতে নারীদের অধিকার

ইসলামের শত্রুরা ইসলামের বিরুদ্ধে যে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনয়ন করে, তন্মধ্যে অন্যতম হলো, ইসলাম মিরাসি সম্পত্তির ক্ষেত্রে নারীদের ওপর জুলুম করেছে। তাদের উত্থাপিত অভিযোগ থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে, তারা সত্যান্বেষী হয়ে নয়; বরং বিদ্বেষ ও প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়েই শাশ্বত জীবনবিধান ইসলামের পেছনে আধাজল খেয়ে নেমেছে।

ইসলামের বিধান হলো, মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদে তার ছেলে সন্তানরা মেয়ে সন্তানদের দ্বিগুণ পাবে। এখানে বিরোধীদের আপত্তি হচ্ছে, পুরুষরা কেন দ্বিগুণ পাবে? বোকারা একটুও ভেবে দেখে না যে, হাতের আঙুল পাঁচটি সমান নয়। যদি সমান হতো, তবে এ আঙুল দিয়ে কাজ করা সম্ভব হতো না। তেমনই নারীদের তুলনায় পুরুষদের দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেক বেশি। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ যেন পুরুষদের সে দায়িত্ব- কর্তব্য পালনে সহায়ক হয়, স্বামী-স্ত্রীর একটি সুখের সংসার হয়-এমন একটি লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য দরকার সুষম বণ্টনের; সমান বণ্টন এ ক্ষেত্রে কার্যকরী নয়। সব জায়গাতে সমান দেখলে হয় না। বাস্তবতার আলোকে কথা বলতে হবে। এ জন্যই ইসলাম প্রয়োজন বুঝে কোথাও নারীর জন্য অধিকার বেশি দিয়েছে আর কোথাও পুরুষের জন্য অধিকার বেশি দিয়েছে।

কে না জানে, কঠোর পরিশ্রম ও কষ্টের কাজগুলোর দায়িত্ব পুরুষদের? অন্যদিকে ঘরের কাজ, শিশুর পরিচর্যা, বাড়ির দেখাশোনা এগুলো নারীদের দায়িত্ব। পুরুষদের কাজে কঠোরতা ও কষ্ট বেশি। আর নারীদের কাজে স্নেহ ও মায়া-মমতা বেশি। তাই উভয়ে আপন দায়িত্বের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত এবং এভাবেই ইসলাম তাদের জন্য সুষম বণ্টননীতি রেখেছে। এখানে কারও ওপর ন্যূনতম জুলুম করা হয়নি।

এভাবে নারীদের দায়িত্ব হলো, ঘরবাড়িকে মায়ার আঁচলে আগলে রাখা। আর পুরুষদের দায়িত্ব হলো, ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা। যদি নারীকে উপার্জন ও ঘর সামলানোর কাজ

দেওয়া হয়-যেমনটা অনেক স্বার্থলিপ্সু নিজের লাভের জন্য তাদের চটকদার কথায় ফুটিয়ে তোলে-তাহলে তা নারীদের ওপর মারাত্মক রকমের জুলুম হয়ে যায়। তাদের ওপর একই সাথে দুটি দায়িত্ব চাপানোর ফলে তাদের স্বাভাবিক গতি-প্রকৃতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। নারীকে যে স্বভাব ও কর্মের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তাকে সেখান থেকেই তার আখিরাতের পথে এগিয়ে যেতে হবে। ভিন্ন পথ অবলম্বন করলে দুনিয়া ও আখিরাত-উভয় জগতেই তাকে কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে। নারী-পুরুষের এসব পার্থক্যের প্রতি খেয়াল করেই অর্থ উপার্জনের দায়িত্ব পুরুষের কাঁধে অর্পিত হয়েছে। যেন নারী নির্বিঘ্নে তার ওপর অর্পিত গুরুদায়িত্ব ও পরিবারের দেখাশোনা সুচারুরূপে করতে পারে।

একজন পুরুষকে পরিবারের সকলের জন্য খরচ করতে হয়। অন্যদিকে একজন নারীকে এমন খরচ করতে হয় না। নারী তার সন্তান, স্বামী, এমনকি নিজের জন্যও ব্যয় করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত নয়। কারণ, এ উপার্জন ও ব্যয় করা স্বামীর দায়িত্ব। ইসলাম নারীকে এমন অনেক ব্যয়ক্ষেত্র থেকে অব্যাহতি দিয়েছে। তা সত্ত্বেও ওয়ারিসি সম্পত্তিতে নারীর জন্য পুরুষের অর্ধেক নির্ধারণ করেছে।

এ ছাড়াও সব সময়ই নারী পুরুষের অর্ধেক সম্পদ পায়, বিষয়টি মোটেও তা নয়; বরং অনেক ক্ষেত্রেই একজন নারী পুরুষের চেয়ে বহুগুণ বেশিও পেয়ে থাকে। উদাহরণত, একজন ব্যক্তি এক স্ত্রী, এক কন্যা ও পিতা রেখে মারা গেল। এমতাবস্থায় স্ত্রী পাবে সম্পদের এক-অষ্টমাংশ, কন্যা পাবে অর্ধেক তথা চার-অষ্টমাংশ, আর পিতা পাবে বাকি সম্পদ তথা তিন-অষ্টমাংশ। এ ক্ষেত্রে কন্যা সম্পদের অর্ধেক পেয়ে লোকটির পিতার থেকেও অংশে অনেক বেশিই পেয়েছে। এমন আরও কয়েকটি ক্ষেত্র রয়েছে, যেখানে ওয়ারিশদের মধ্যে পুরুষদের তুলনায় নারীরা অধিক সম্পদ পেয়ে থাকে। মোটকথা, আযাচিত ইসলাম কোথাও পক্ষপাতিত্ব করেনি। যার যেখানে যতটুকু প্রয়োজন, তার জন্য তথায় ততটুকুই নির্ধারণ করেছে। সুস্থ মস্তিষ্কে চিন্তা করলে বিষয়টি খুব সহজেই বুঝে আসবে। তবে যাদের অন্তরে আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন, তাদের হাজারও দলিল-প্রমাণ দিলেও বুঝতে চাইবে না। আল্লাহ তাদের হিদায়াত দান করুন।

নারীদের সাক্ষ্যের মূল্যায়ন

ইসলামের বিধানসমূহ সর্বক্ষেত্রে শতভাগ বাস্তবিক ও কার্যকর হয়ে থাকে। ইসলামের বিধান কখনো এমন হয় না যে, এ বিধানে কারও কোনো অধিকার বিনষ্ট হয়। কিন্তু কতিপয় প্রবৃত্তিপূজারি ইসলামের অনেক বিধান নিয়েই হঠকারিতা প্রদর্শন করে। নিজেদের স্বার্থ

চরিতার্থ করার জন্য সত্য কথার ওপর আপত্তি তোলে। তেমনই একটি বিষয় হলো মহিলাদের সাক্ষ্যদান।

সাক্ষ্য প্রদানের মাসআলার ক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে, সাক্ষী হিসাবে দুজন পুরুষ থাকবে। আর যদি দুজন পুরুষ সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত না থাকে, তবে একজন পুরুষ ও দুজন নারীর সাক্ষ্যও যথেষ্ট হবে। এখানে দুজন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান।

এ বিষয়ে কুরআনে কারিমে ইরশাদ হচ্ছে:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

'আর তোমাদের মধ্যে দুজন পুরুষকে সাক্ষী রাখবে। কিন্তু যদি দুজন পুরুষ না থাকে, তাহলে তোমাদের পছন্দমতো সাক্ষীগণের মধ্যে একজন পুরুষ ও দুজন নারী যথেষ্ট। এটা এ জন্যই যে, নারীদ্বয়ের একজন ভুলে গেলে অপরজন তাকে স্মরণ করিয়ে দেবে। (সুরা আল-বাকারা: ২৮২)

ইসলামের বিধিবিধান সর্বদা বাস্তবসম্মত ও কল্যাণকর হয়ে থাকে। ফলে মানুষের কল্যাণ ও উপকার নিশ্চিত হয় এবং অকল্যাণ ও অনিষ্ট দূরীভূত হয়। বলা বাহুল্য যে, সাক্ষ্যদানের বিধানের ক্ষেত্রেও প্রকৃত কল্যাণ নিশ্চিত করা হয়েছে। একজন পুরুষের সাক্ষ্যকে দুজন নারীর সাক্ষ্যের সমান বলা হয়েছে। আর এ বিধান মানুষের ফিতরাত ও বাস্তবতার সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল।

সকলের নিকট এ বিষয়টি সুনিশ্চিত যে, একজন মহিলা যদিও পরিপূর্ণ সঠিক ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়, তথাপি তার মাঝে লজ্জার দিকটি প্রবল থাকে। তার মাঝে নম্রতা ও দয়ার্দ্রতার আধিক্য বেশি থাকে। তাই যখন কোনো শক্ত কাজ বা কঠিন সময় আসে, তখন স্বাভাবিকভাবেই একজন মহিলার মাঝে অস্থিরতা কাজ করে, তার মাঝে কারও প্রতি ঝুঁকে যাওয়ার প্রবণতা আসে। বিশেষ করে যখন একজন মহিলাকে বিচারালয়ে নিয়ে আসা হয়, তখন এক পাশে বিচারক, অন্যদিকে সৈন্য-সামন্ত, বাদী-বিবাদী দ্বারা সে বেষ্টিত থাকায়, অস্থিরতায় ভোগে সে। এটা তার দুর্বলতা, যা তার থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে হয় না; বরং এটা তার স্বভাব ও ফিতরাতের মধ্যেই রয়েছে।

অন্যদিকে মানুষের মাঝে কৃত লেনদেন ও তর্ক-বিতর্ক থেকে মহিলাদের অবস্থান দূরে থাকে। কেননা, নারীর কাজ সব ঘরকেন্দ্রিক। পরিবারকে সঠিকরূপে সামলানো, সন্তানদের তত্ত্বাবধান করাই তার মূল দায়িত্ব। তাই সে তার কাজের কারণে অন্যদিকে খেয়াল করা বা মানুষের লেনদেন, তর্ক-বিতর্কের খবরাখবর রাখা বা তাতে সম্পৃক্ত হওয়া সম্ভব হয় না। তাই সংগত কারণেই নারীর সাক্ষ্য পুরুষের সাক্ষ্যের সমান নয়।

পূর্বোক্ত আয়াতে দুজন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান হওয়ার কারণও বলে দেওয়া হয়েছে যে, সাধারণত নারীরা অনেক বিষয় ভুলে যায়। তাই তাদের একজনের ওপর নির্ভর করা পুরোপুরি নিরাপদ নয়। এ জন্য বলা হয়েছে, নারীদ্বয়ের একজন ভুলে গেলে অপরজন তাকে স্মরণ করিয়ে দেবে।

দুজন নারীর সাক্ষ্য কেন একজন পুরুষের সাক্ষীর সমান, তার কারণ বর্ণনার ক্ষেত্রে এ আয়াতটি পরিপূর্ণ। এটি সকল কারণকে একত্র করে ফেলেছে। কেননা, تَضِلَّ শব্দটির পরিব্যাপ্তি ব্যাপক। এটি ভুল, ভয়, লজ্জা ও হতবুদ্ধি হওয়ার সকল দিককে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। তাই সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে কারও কোনো অধিকার বিনষ্ট হওয়ার পথ স্বাভাবিকভাবেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু অনেকে পাগলের প্রলাপ বকে যে, এখন তো নারীরা পুরুষদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে। পুরুষদের সাথে মিশছে। তাই এখন আগের যুগের নারীদের মতো দুজনের সাক্ষ্য এক পুরুষের সাক্ষ্যের সমান হওয়ার কোনো যৌক্তিকতা নেই! কেননা, এখনকার নারীরা আগের মতো লজ্জাশীল নয়, তারা আগের মতো নরম মনের ও দুর্বল চিত্তেরও নয়।

এরা মূলত নারীদের নারীত্বকে হরণের কথা বলে। কেননা, নারীত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হলো, দয়ানুভূতি ও কোমলতা থাকা। নারীরা যদি তাদের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য ও গুণ থেকে বেরিয়ে যায়, তবুও তারা পুরুষ তো আর হতে পারে না। এমতাবস্থায় তারা নারীও থাকে না, আবার পুরুষও হয় না; বরং এতদুভয়ের মাঝামাঝি থাকে। এমন নারীদের রাসুলুল্লাহ অভিশাপ দিয়েছেন। নারীদের এমন বেসুরো রূপকে ইসলাম প্রত্যাখ্যান করে।

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

'নারীর রূপধারণকারী পুরুষদের এবং পুরুষের বেশ ধারণকারী নারীদের রাসুলুল্লাহ অভিশাপ দিয়েছেন।

আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ

'মহিলার পোশাক পরিধানকারী পুরুষকে এবং পুরুষের পোশাক পরিধানকারী নারীকে রাসুলুল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন।

আয়িশা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الرَّجُلَةَ مِنَ النِّسَاءِ

'জাতে মহিলা কিন্তু সাজে পুরুষ, এমন নারীদের রাসুলুল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন। '

সুতরাং আমাদের সমাজে কথিত বুদ্ধিজীবীরা নারী উন্নয়নের নামে যা করছে, তা চরম বোকামিপূর্ণ একটি কাজ। নারীকে নারীর জায়গায় রেখেই তার থেকে যথোপযুক্ত কাজ আদায় করে নিতে হবে। যুক্তি ও বিবেক এমনই বলে। ইসলামও তা সমর্থন করে প্রত্যেকের দায়িত্ব, কাজ ও বৈশিষ্ট্য আলাদা আলাদা করে দিয়েছে। কিন্তু ইসলামের শত্রুরা যা করছে, সভ্য ভাষায় বলতে গেলে বলা যায়, নারীদের নারীত্ব বিনষ্ট করে তারা তাদের অসৎ উদ্দেশ্য ও স্বার্থ উদ্ধার করছে। এটাকে কেউ উন্নয়ন বললে তা হবে তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ও আল্লাহর আইনের সাথে স্পষ্ট বিদ্রোহ।

পঞ্চম মূলনীতি : আনুগত্য ও মান্যতা

আনুগত্য এমন একটি স্তম্ভ, যার ওপর পুরো শাসনব্যবস্থা নির্ভর করে। মুসলিম জনগণ খলিফার পূর্ণ অনুগত না হলে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শরয়ি বিধিবিধান বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না, শরিয়তের ওপর পরিপূর্ণভাবে আমল করাও সম্ভব হবে না। আনুগত্য না থাকলে মূলত একটি দেশের ভিত্তিই নষ্ট হয়ে যায়। এমন শাসন থাকা মূলত না থাকারই নামান্তর। এ জন্য ইসলামে আনুগত্যের গুরুত্ব অনেক বেশি। আনুগত্য করা ছাড়া নাগরিকদের বিকল্প

পথ নেই। ইসলামি রাষ্ট্রে থাকতে হলে তাদের আনুগত্য করেই চলতে হবে। খলিফা বা আমিরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ এবং দুনিয়া ও আখিরাত-উভয় জগতের জন্য ক্ষতিকর।

আমিরের আনুগত্য বিষয়ক আলোচনাটি আমরা কয়েকটি অংশে ভাগ করে করতে পারি। যথা:

ক. আমিরের আনুগত্য করা ফরজ

মুসলিম শাসক হলো শরয়ি বিধিবিধান বাস্তবায়ন করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। ইসলামের হুকুম-আহকাম বাস্তবায়নে খলিফা কোনো ধরনের শৈথিল্য প্রদর্শন করবে না; বরং তিনি অনমনীয় হয়ে স্বীয় দায়িত্ব পালন করে যাবেন। খলিফা আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে নিজের মনের চাহিদামতো অথবা আল্লাহর আইনের বিপরীত অন্য কোনো আইন দিয়ে বিচারকার্য পরিচালনা করবেন না; বরং আল্লাহর বিধান অনুযায়ীই শাসনকার্য পরিচালনা করবেন।

এ কারণেই মুসলিম জনগণের ওপর মুসলিম শাসকের আনুগত্য করা ওয়াজিব। তার অবাধ্য হওয়া বা বিদ্রোহ করা জায়িজ নেই। মানুষ যদি তাদের শাসকের আনুগত্য না করে অবাধ্য হয়ে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তাহলে সে আল্লাহর শরিয়ত থেকে বের হয়ে গেল; বরং প্রকৃত অর্থে কেমন যেন সে তো শরিয়তের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করল।

কথাটি এভাবেও বলা যায়, ব্যক্তি-শাসকের আনুগত্য করা কিংবা তার সন্তুষ্টি অর্জন করা ওয়াজিব নয়; বরং তার আনুগত্যের উদ্দেশ্য হলো, শরিয়তের হুকুম-আহকাম বাস্তবায়ন করা। কারণ, শাসক ব্যতীত শরয়ি সকল বিধিবিধান বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। শাসকই জনগণকে শরিয়তের বিধান অনুযায়ী পরিচালনা করবে আর জনগণ তা মেনে চলবে। সুতরাং মুসলিম শাসকের অবাধ্য হওয়া মানে শরিয়তেরই অবাধ্য হওয়া এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা মানে শরিয়তের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করা।

মুসলিম শাসকের আনুগত্য করা ওয়াজিব, এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা আদেশ করে বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ

'হে ইমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসুলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বশীল (শাসক ও বিচারক) আছে, তাদেরও। '(সুরা আন-নিসা: ৫৯)

এখানে مِنكُمْ তথা 'তোমাদের মধ্য থেকে' বলে এটা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, মুসলমানদের শাসক হতে হবে তাদের মধ্য থেকেই মুসলমান, ইসলামের আকিদা-বিশ্বাসে বিশ্বাসী, শরিয়তের বিধিবিধানসমূহ পালনকারী। যে ব্যক্তি মুসলমান নয় বা ইসলামের আকিদায় বিশ্বাসী নয় কিংবা শরিয়তের বিধিবিধান পালনকারী নয়, সে কখনো মুসলমানদের শাসক বা বিচারক হতে পারে না। মুসলমানদের শাসক বা বিচারক হওয়ার কোনো অধিকারও তার নেই।

শরিয়ত অনুযায়ী বিচারের জন্য মূলনীতি গ্রহণের উৎস দুটি:

১. কুরআনে কারিম।

২. হাদিসে রাসুল।

সুতরাং যেকোনো সমস্যা-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হোক অথবা তাদের মধ্যে কোনো ধরনের মতানৈক্য দেখা দিক না কেন, তাদের সে সমস্যার সমাধান কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী করতে হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

'অতঃপর যদি তোমরা কোনো বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়ো, তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি প্রত্যর্পণ করো, যদি তোমরা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসে বিশ্বাসী হয়ে থাকো। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক থেকে উত্তম।'(আন-নিসা:৫৯)

মুসলিম জনগণের ওপর তাদের আমিরের আনুগত্য করা ওয়াজিব। তারা তাদের আমিরের আনুগত্য করলে তাদের থেকে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি দূর হয়ে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও শৃঙ্খলা ফিরে আসবে।

ইবনে উমর(রা:) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন:
'প্রত্যেক মুসলিমের ওপর আমিরের আদেশ শোনা ও মান্য করা ওয়াজিব; চাই সেটা পছন্দের হোক বা অপছন্দের। তবে গুনাহের কাজের আদেশ করলে ভিন্ন কথা। সুতরাং যখন কোনো গুনাহের কাজের আদেশ করা হবে, তখন আর তার কথা শোনা ও মানা যাবে না। '

ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়- সর্বাবস্থায় আমিরের আনুগত্য করতে হবে।

যদি এ ক্ষেত্রে আনুগত্যকারী কোনো ব্যক্তিগত ক্ষতির সম্মুখীন হয়; তবুও তার জন্য আমিরের আদেশ অমান্য করার সুযোগ নেই।

আবু হুরাইরা(রা:)থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন:

'তোমার সচ্ছলতায়-অসচ্ছলতায়, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় এবং তোমার ওপর কাউকে প্রাধান্য দেওয়া হলেও আমিরের কথা শোনা ও তার আনুগত্য করা তোমার জন্য ওয়াজিব। '

আমির যদি আল্লাহর আইন সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করে এবং পরিপূর্ণভাবে ইসলামের বিধান মেনে চলে, তাহলে তার আনুগত্য করা আবশ্যক; চাই তার বাহ্যিক আকার-আকৃতি যতই কুৎসিত হোক না কেন।

খ. সাধ্যের ভেতর আনুগত্য

কারও আদেশ পালনের ক্ষেত্রে শক্তি ও সামর্থ্যের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ থাকবে। শক্তি ও সামর্থ্যের বাইরে আনুগত্যের আদেশ নেই। কারণ, সামর্থ্যের বাইরে কোনো কিছু অর্জিত হয় না। ইসলামও কাউকে শক্তি ও সামর্থ্যের বাইরে কোনো কিছু চাপিয়ে দেয় না।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

'আল্লাহ কারও ওপর তার সাধ্যাতীত কোনো কাজের দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না। '

সাধ্যের অতিরিক্ত কোনো কিছু চাপিয়ে দেওয়ার মানে ব্যক্তিকে বিপদের মধ্যে ফেলা। আর এমনটি করা ইসলামে নিষিদ্ধ। কারণ, এতে ব্যক্তি যখন তা আদায়ে সক্ষম হবে না, তখন তার মধ্যে হতাশা ও ক্ষোভ সৃষ্টি হবে। আর এতে তার মধ্যে আমিরকে মানার যে প্রবণতা ছিল, তা নষ্ট হয়ে যাবে।

ইবনে উমর(র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:
'আমরা যখন রাসুলুল্লাহ-এর নিকট শ্রবণ ও আনুগত্যের বাইআত দিতাম, তখন তিনি বলতেন, তোমাদের সামর্থ্যানুসারে মান্য করো। '

গ. আমিরের বিরুদ্ধে অন্যায় বিদ্রোহ

অন্যায়ভাবে আমিরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না। এ ব্যাপারে হাদিসে অনেক বড় সতর্কবাণী এসেছে। আব্দুল্লাহ বিন উমর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি:

مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ، ثُمَّ مَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

'যে ব্যক্তি আনুগত্য ছেড়ে দিল এবং দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যুবরণ করল, সে জাহিলি মৃত্যুর মতো মৃত্যুবরণ করল।'

বস্তুত ইসলামে আনুগত্য করার গুরুত্ব অনেক বেশি। কারণ, আমিরের আনুগত্য করা মানে রাসুলুল্লাহ-এর আনুগত্য করা। আর রাসুলুল্লাহ -এর আনুগত্য করার অর্থ আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করা।

আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ বলেন:
'যে আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহর আনুগত্য করল। আর যে আমার অবাধ্য হলো, সে আল্লাহর অবাধ্য হলো। যে আমিরের আনুগত্য করল, সে আমার আনুগত্য করল। আর যে আমিরের অবাধ্য হলো, সে আমার অবাধ্য হলো। '

ঘ. আমিরের আনুগত্য হবে বিনয়ের সাথে

আমিরের আনুগত্য করতে হবে বিনয় ও আগ্রহ নিয়ে, মহব্বত ও ইকরামের সাথে। কোনোভাবেই আমিরকে অসম্মান করা যাবে না। তাকে কোনো প্রকার কষ্ট দেওয়া চলবে না। পাপিষ্ঠ ও ফাসিক লোকেরাই কেবল ন্যায়পরায়ণ শাসকের অবাধ্য হতে পারে।

আবু বাকরা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি:

وَمَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللهِ فِي الدُّنْيَا، أَهَانَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'যে ব্যক্তি দুনিয়ায় আল্লাহর খলিফাকে অপদস্থ করবে, আল্লাহ তাকে কিয়ামত দিবসে লাঞ্ছিত করবেন। '

ঙ. আমিরের স্বল্প ত্রুটিতে করণীয়

আমিরের মধ্যে যদি ব্যক্তিগত কিছু দুর্বলতা দেখা দেয়, তিনি যদি নিজ স্বার্থে ন্যায়পরায়ণতা থেকে কিছুটা দূরে সরে যান, নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্য কারও প্রতি সামান্য জুলুমও করে ফেলেন, কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিপূর্ণভাবে শরিয়তের অনুসরণ করেন, ইসলামের প্রতিটি বিধান মেনে চলেন, তাহলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না। কারণ, সামান্য ও তুচ্ছ কিছু ভুলের কারণে শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে জমিনে ফিতনা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা আছে। এতে করে দেশে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি সৃষ্টি হবে।

সুতরাং শরিয়তের সীমালঙ্ঘন হয়নি-এমন ব্যক্তিগত ভুল-ত্রুটির কারণে শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না; বরং শাসকের কথা শুনতে হবে এবং তার আনুগত্য করতে হবে।

চ. আমিরের মাঝে অপছন্দনীয় কোনো কিছু দেখলে করণীয়

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ বলেছেন:

'যে ব্যক্তি তার আমিরের কোনো কিছুতে অসন্তুষ্ট হয়, সে যেন ধৈর্যধারণ করে। কারণ, যে ব্যক্তি শাসকের আনুগত্য থেকে এক বিঘত পরিমাণও বের হয়ে গেল, সে জাহিলি মৃত্যুর মতো মৃত্যুবরণ করল।'

ছ. আমিরের ভুল হলে করণীয়

আমিরের ভুল হলে মুসলমানদের কর্তব্য হলো, উত্তম নসিহতের মাধ্যমে এবং সুন্দর ও হিকমতপূর্ণ ভাষায় তাকে সতর্ক করা। তাকে তার ভুলত্রুটি থেকে ফিরিয়ে সৎ পথে আনার চেষ্টা অব্যাহত রাখা। হয়তো এক সময় আমির তার ভুল বুঝতে পারবে এবং সঠিক পথে ফিরে আসবে।

আমিরের আনুগত্য নিঃশর্ত নয়; বরং তা শরিয়তের বিধানের সাথে শর্তযুক্ত। অর্থাৎ শাসক যখন আল্লাহর অবাধ্যতার আদেশ করবে, তখন তার আনুগত্য করা যাবে না।

ইবনে উমর থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ বলেন:

'প্রত্যেক মুসলিমের ওপর আমিরের আদেশ শোনা ও মান্য করা ওয়াজিব; চাই সেটা পছন্দের হোক বা অপছন্দের। তবে গুনাহের আদেশ করলে ভিন্ন কথা। সুতরাং যখন কোনো গুনাহের কাজের আদেশ করা হবে, তখন আর তার কথা শোনা যাবে না, তার আদেশ মানা যাবে না। '

উবাদা বিন সামিত থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

আমরা রাসুলুল্লাহ-কে বাইআত দিলাম এ কথার ওপর যে, আমরা সুখে-দুঃখে, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, আমাদের ওপর কাউকে প্রাধান্য দিতে হলেও আমরা তাঁর কথা মানব ও আনুগত্য করব। আমরা শাসক বা আমিরের সাথে বিবাদে লিপ্ত হব না। তিনি বলেন, তবে হ্যাঁ, যদি তোমরা তার মধ্যে স্পষ্ট কুফরি দেখতে পাও, যে ব্যাপারে তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে দলিল আছে, তাহলে ভিন্ন কথা। '৪১২

সুতরাং কোনো শাসক যখন ইসলামি রীতিনীতি ছেড়ে দেবে এবং শরয়ি বিধানের বিপরীত সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, পুঁজিবাদী শাসনব্যবস্থার মতো কুফরের বিধান গ্রহণ করবে, তখন পূর্ণরূপে সে শাসকের আনুগত্য বর্জিত হবে। কারণ, ইসলামের বিপরীতে এগুলোর প্রত্যেকটিই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম ও কুফরে বাওয়াহ বা স্পষ্ট কুফরি। সুতরাং কোনো শাসক ইসলামি শরিয়তের বিপরীতে-এসব কুফরি ব্যবস্থার কোনো একটা গ্রহণ করলে সাধারণ মুসলমানদের তাকে মান্য করা তো দূরে থাক; বরং তাদের ওপর এসব কুফরি ব্যবস্থার ভিত্তিমূল উৎখাত করে শরিয়াব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক।

ষষ্ঠ মূলনীতি : বাইআত

البيعة আল-বাইআত শব্দটি البيع আল-বাইয়ু থেকে নির্গত। এর অর্থ হলো مبادلة مال بمال তথা বস্তু বিনিময়করণ। البيعة আল-বাইআত শব্দটির প্রকৃত অর্থ হলো, বিক্রয় আবশ্যক করার চুক্তি। তবে পরবর্তী সময়ে শব্দটি مبايعة মুবাইয়া অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে। مبايعة মুবাইয়া শব্দের অর্থ হলো, আনুগত্য ও সাহায্যের ব্যাপারে ওয়াদা প্রদান করা। ৪১৩

ইবনে খালদুন বলেন, 'বাইআত হলো আনুগত্যের ওয়াদা। বাইআত প্রদানকারী তার ও সকল মুসলমানের বিষয়াদির প্রতি লক্ষ করার অধিকার তার আমিরের নিকট অর্পণ করার অঙ্গীকার

করল যে, সে এ ব্যাপারে তার সাথে বিবাদে জড়াবে না এবং মতানৈক্য করবে না। তার আমির তাকে যে বিষয়ে দায়িত্ব দেবেন, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সর্বাবস্থায় সে আমিরের আনুগত্য করবে।

অর্থাৎ শরিয়তের সীমার মধ্যে থেকে কোনো অবস্থাতেই তার অবাধ্য হওয়া যাবে না এবং বিদ্রোহ করা যাবে না। অন্য কথায় বলা যায়, বাইআত বলা হয়, নেক ও সৎ কাজে আমিরের আদেশ শোনা ও তার আনুগত্য করার অঙ্গীকারকে। কিন্তু গুনাহ বা অবাধ্যতার ক্ষেত্রে কোনো আনুগত্য নেই। যদি সে গুনাহের কাজের আদেশ দেয়, তবে তার কোনো কথা শোনা যাবে না। এর ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, ওকালাত তথা প্রতিনিধিত্ব করার সাথে বাইআতের সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন ওকালাতের মধ্যে দুটি পক্ষ থাকবে:

১. موكل মুয়াক্কিল - প্রতিনিধি নিয়োগকারী।

২. وكيل উকিল - প্রতিনিধি।

মুয়াক্কিল উকিলকে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে তার প্রতিনিধি হয়ে কাজ করার অধিকার দেয় এবং তাদের দুজনের মধ্যে এ বিষয়ে চুক্তি হয়। ফলে চুক্তিকৃত বিষয়কে সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার জন্য উকিল তাতে হস্তক্ষেপ করতে পারে। কিন্তু ওই বিষয়টির ক্ষতি হয়-এমন কোনো কাজ সে করতে পারবে না। কারণ, তা হবে চুক্তি বহির্ভূত কাজ।

অনুরূপভাবে বাইআতের ক্ষেত্রেও দুটি পক্ষ রয়েছে:

প্রথমপক্ষ হলো বাইআত প্রদানকারী ব্যক্তিবর্গ। আর তারা হলো মুসলিম জনগণ। প্রথমে 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' খলিফা নির্ধারণ করে তাকে বাইআত দেবেন। অতঃপর মুসলিম জনসাধারণ তাকে এই শর্তে বাইআত দেবে যে, তিনি তাদের ইসলাম অনুযায়ী পরিচালনা করবেন এবং তাদের মধ্যে শরিয়তের প্রতিটি আদেশ বাস্তবায়ন করবেন।

দ্বিতীয় পক্ষ হলো বাইআত গ্রহণকারী তথা আমির বা খলিফা। তিনি জনগণের কাছ থেকে এই শর্তে বাইআত গ্রহণ করবেন যে, তিনি তাদের পুরোপুরি শরিয়ত অনুযায়ী পরিচালনা করবেন।

আর এটিই হলো বাইআতের অঙ্গীকার। প্রত্যেক মুসলিম তার পক্ষ থেকে শাসককে হাতে হাত রেখে বা মৌখিকভাবে বাইআত দেবে। তবে বাইআতের বিষয়টা যাতে মজবুত ও দৃঢ় হয় সে জন্য বাইআত দেওয়ার সময় মুসাফাহা করার মতো একজনের হাতের ওপর আরেকজনের হাত রাখবে।

ইবনে খালদুন বলেন, 'অঙ্গীকার দৃঢ় ও মজবুত করণার্থে যখন তারা আমিরকে বাইআত প্রদান করবে, তখন তার এক হাতের মধ্যে তাদের হাত রাখবে।

বাইআতের গুরুত্ব

ইসলামি শরিয়তে বাইআতের গুরুত্ব অপরিসীম। মুসলিমদের একতাবদ্ধ থাকা এবং তাদের শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে বাইআত অনেক বড় ভূমিকা রাখে। বাইআতের দুটি দিক রয়েছে। এক. জনগণ। দুই. শাসক। জনগণ বাইআত প্রদান করে এই অঙ্গীকার করে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত শাসক তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করবে এবং তাদের মধ্যে আল্লাহর শরিয়ত বাস্তবায়ন করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিচ্ছিন্ন হওয়া বা বিদ্রোহ করার কোনো অধিকার নেই।

অন্যদিকে জনগণের পক্ষ থেকে শাসকের প্রতি এই আস্থা ও তাকে এই দায়িত্ব অর্পনের কারণে শাসক সাধারণ মানুষের প্রতি আরও সদয় হবেন, মানুষের প্রতি তার ভালোবাসা আরও বৃদ্ধি পাবে এবং তার ইখলাসে পূর্ণতা আসবে। তিনি আরও দৃঢ়ভাবে আল্লাহর বিধান মেনে চলবেন। মানুষের মধ্যে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করবেন। এ ক্ষেত্রে তিনি চুল পরিমাণও ছাড় দেবেন না। আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে কোনো কিছুই তাকে টলাতে পারবে না।

এসব কিছুই জনগণের সাথে শাসকদের মহব্বত-ভালোবাসা বৃদ্ধির মাধ্যম, যা তাদের সম্পর্ককে আরও দৃঢ় ও মজবুত করে তোলে। তাদের মাঝে দূরত্ব কমে যায়। পরস্পর মহব্বত ও ভালোবাসা, ইকরাম ও সম্মানবোধ সৃষ্টি হয়। ফলে মুসলিম উম্মাহ হয়ে ওঠে সুদৃঢ় শক্তিশালী, সীসাঢালা মজবুত এক প্রাচীর। কোনো কিছুই তাদের রুখতে পারে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

'হে নবি, ইমানদার নারীরা যখন আপনার কাছে এসে আনুগত্যের শপথ করে বলে যে, তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তাদের সন্তানদের হত্যা করবে না, জারজ সন্তানকে স্বামীর ঔরস থেকে গর্ভজাত সন্তান বলে মিথ্যা দাবি করবে না এবং ভালো কাজে আপনার অবাধ্যতা করবে না, তখন তাদের বাইআত গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু।' (আত-তাওবা:৭১)

ইসলামি রাষ্ট্রপ্রধান

মুসলমানদের ইমাম বা খলিফা হওয়ার যোগ্য সেই ব্যক্তি, যিনি তাদের কল্যাণ ও সফলতার দিকে পরিচালনা করতে সক্ষম হবেন, তাদের মাঝে শরিয়তের বিধান বাস্তবায়ন করবেন। যিনি মানুষের মাঝে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবেন, মানুষের মধ্য থেকে অন্যায় ও জুলুম প্রতিহত করবেন। মুসলমানদের রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার যোগ্য তিনি, যিনি মুসলমানদের কল্যাণের জন্য নিরলসভাবে কঠিন পরিশ্রম করার যোগ্যতা রাখেন।

ইসলামি রাষ্ট্রপ্রধানের গুরুত্বপূর্ণ অনেক দায়িত্ব রয়েছে। যেমন হদ ও কিসাস বাস্তবায়ন করা, মুলমানদের নামাজে ইমামতি করা, বিভিন্ন অঞ্চলের আমির/গভর্নর নিয়োগ দেওয়া, মানুষদের জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করা, জিহাদের জন্য বাহিনী গঠন করা ও বাহিনীর আমির নির্ধারণ করা, দক্ষ ও বিচক্ষণ সমরবিদদের সাথে পরামর্শ করে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিকল্পনা সাজানো, জাকাত, ফাই, খারাজ, গনিমতসহ অর্থ সংগ্রহের বিভিন্ন খাত থেকে অর্থ সংগ্রহ করা।

মুসলিম শাসকের দায়িত্বসমূহ

মুসলিম শাসকের দায়িত্বের পরিধি ব্যাপক। সংক্ষেপে তার কিয়দাংশ উল্লেখ করছি। একজন মুসলিম শাসককে দশটি বিষয় ভালোভাবে পালন করতে হবে। যথা:

১. দ্বীনের হিফাজত

খলিফা দ্বীন হিফাজতের মূলনীতি অনুযায়ী কাজ করবেন। কেউ বিদআত সৃষ্টি করলে অথবা কোনো সংশয়বাদী দ্বীন থেকে সরে গেলে তখন খলিফা তার সামনে স্পষ্ট দলিল পেশ করে

তার সন্দেহ দূর করবেন। যদি এর পরেও সংশয়বাদী বা বিদআতকারী সঠিক পথে না আসে, তবে তাকে যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদান করবেন। যাতে করে সে কোনো ধরণের বিশ্রঙ্খলা ও ফিতনার বিস্তার ঘটাতে না পারে এবং উম্মত তার পথভ্রষ্টতা থেকে বেঁচে থাকতে পারে।

২. শরয়িভাবে বিবাদ মীমাংসাকরণ

খলিফা বিবাদে লিপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যকার বিরোধ মিটিয়ে দেবেন। যাতে করে সবদিকে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা হয়, জালিমের জুলুম বন্ধ হয়ে যায় এবং মাজলুম আর নির্যাতিত না হয়।

৩. জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ

খলিফাকে তার নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। যেন মানুষ তাদের জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে নিরাপদে সারা দেশে ভ্রমণ করতে পারে এবং সফরে তাদের জান ও মালের ক্ষতির কোনো শঙ্কা না থাকে।

৪. হদ ও কিসাস বাস্তবায়ন

খলিফা প্রকাশ্যে জনসম্মুখে অপরাধমূলক কাজের শাস্তি বাস্তবায়ন করবেন। যাতে করে আল্লাহ কর্তৃক পবিত্র কাজ ও বিষয়বস্তু নিরাপদ থাকে এবং বান্দার হকগুলো ক্ষতি ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়।

৫. সীমান্তের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ

শক্তিশালী প্রতিরক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে সীমান্তে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। যাতে কোনোভাবেই শত্রুরা দেশের ভেতরে প্রবেশ করে মানুষের জান ও মালের ক্ষতি না করতে পারে।

৬. জিহাদের ইবাদত পালন

ইসলামের বিরোধিতাকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা খলিফার গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্ব। অমুসলিমদের প্রথমে ইসলাম গ্রহণের জন্য দাওয়াত দেবে। তারা যদি ইসলাম কবুল করে অথবা জিজিয়া দেয়, তাহলে তাদের ছেড়ে দিতে হবে। অন্যথায় তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ

পরিচালনা করবে, যাতে করে ইসলাম সকল ধর্মের ওপর বিজয়ী হয়ে যায় এবং আল্লাহর কালিমা সবার ঊর্ধ্বে থাকে।

৭. ফাই ও জাকাত সংগ্রহ

শরিয়ত মোতাবেক ফাই ও জাকাত সংগ্রহ করা খলিফার দায়িত্ব। এ ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি পরিহার করে মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে হবে।

৮. অভাবীদের ভাতা প্রদান

বাইতুল মাল থেকে অভাবীদের জন্য ভাতা নির্ধারণ করা এবং সময়মতো তা প্রাপকের নিকট পৌঁছে দেওয়া খলিফার দায়িত্বসমূহের একটি।

৯. বিশ্বস্ত কর্মী নিয়োগদান

সৎ ও বিশ্বস্ত লোকদের রাষ্ট্রের বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োগ দেওয়া খলিফার দায়িত্ব। যাতে রাষ্ট্রের প্রতিটি বিভাগ দুর্নীতিমুক্ত থাকে এবং সুচারুভাবে দায়িত্ব আদায় হয়।

১০. কর্মকর্তাদের তদারকি

খলিফাকে রাষ্ট্রের প্রতিটি বিষয় ও সকল পরিস্থিতির প্রতি সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। যেন তার নিয়োগকৃত কর্মকর্তা কোনো ধরনের দুর্নীতির সাথে জড়িয়ে না পড়ে এবং জনগণ তাদের অধিকার পেতে অসুবিধায় না পড়ে।

এটিই হলো মুসলিম শাসকের দায়িত্বের সংক্ষিপ্ত, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ একটি তালিকা। নিঃসন্দেহে এই দায়িত্বগুলো অনেক বড় এবং খুবই ভারী। এ দায়িত্ব বহনে অনেক বড় বড় ব্যক্তিত্বেরও অনেক কষ্ট হয়ে যায়। তাই এমন বড়, সূক্ষ্ম ও ভারী দায়িত্ব পালন করতে হলে আমিরকে হতে হবে দৃঢ় সংকল্পী, অগাধ জ্ঞান ও বুদ্ধির অধিকারী, অভিজ্ঞ আলিম ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি। সাথে সাথে তাকে হতে হবে দৃঢ় ইমানদার, মুত্তাকি ও সঠিক আকিদা-বিশ্বাসে অটল, যা তাকে অন্যদের থেকে আলাদা করে রাখবে।

ইসলামের দন্ডবিধি

ইসলামি বিধানের বড় একটি অধ্যায় হলো, হদ-কিসাস বা দণ্ডবিধি। এই অধ্যায়টি বিস্তৃত ও প্রশস্ত। এতে আল্লাহর হক ও বান্দার হক উভয়টিই শামিল। কোনো বান্দা যখন অন্যায়ভাবে সীমালঙ্ঘন করবে, তখন তাকে স্বীয় অপরাধের কারণে এই দুনিয়াতেই শাস্তি ভোগ করতে হবে, যাতে সে পরবর্তী সময়ে ওই ধরনের অপরাধে আর জড়িয়ে না পড়ে এবং অন্য সকল মানুষ দণ্ড কার্যকরণ থেকে শিক্ষা নিয়ে এ ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক হয়ে যায়।

ইসলামে দণ্ডবিধি মোট তিন প্রকার:

১. কিসাস

২. হদ

৩. তাজির

ক. কিসাস

শাব্দিক অর্থ হলো অনুরূপ করা বা সমান করা। শরিয়তের পরিভাষায়, 'হত্যা বা জখমের ক্ষেত্রে অনুরূপ নীতিভিত্তিক ন্যায়বিচারকে কিসাস বলে।' যদি কেউ ইচ্ছাকৃত হত্যা করে, তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। তবে যদি নিহতের অভিভাবকরা ক্ষমা করে দেয়, তাহলে ভিন্ন কথা। কিসাস প্রয়োগ করা ইসলামি রাষ্ট্রপ্রধানের কাজ, কোনো ব্যক্তি বিশেষের কাজ নয়।

সুতরাং কোনো নিরপরাধ লোককে অন্যায়ভাবে হত্যা করলে সাজাস্বরূপ হত্যাকারীকে হত্যা করা হবে। অথবা হত্যা করেনি, কিন্তু কারও আংশিক ক্ষতি করেছে, যেমন অন্যায়ভাবে কারও হাত, পা বা আঙুল কেটে ফেলেছে অথবা এ সকল অঙ্গপ্রতঙ্গ ভেঙে ফেলেছে অথবা অন্যায়ভাবে আঘাত করে কারও মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে, কারও দাঁত ভেঙে দিয়েছে, তাহলে প্রহারকারীকেও অনুরূপ শাস্তি দিতে হবে। অর্থাৎ জানের বিনিময়ে জান, হাতের বিনিময়ে হাত, পায়ের বিনিময়ে পা, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং আঘাতের বিনিময়ে আঘাত করার শাস্তি প্রদান করা হবে। এটাকেই কিসাস বলা হয়। সংক্ষেপে বলা যায়, হত্যা বা আঘাতের ক্ষেত্রে অনুরূপ শাস্তি প্রদানের বিচারের নাম কিসাস।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى

'হে ইমানদারগণ, তোমাদের প্রতি নিহতদের ব্যাপারে কিসাস গ্রহণ করা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে।'

আঘাতের বিনিময়ে আঘাত করার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُون َ

'আমি এ গ্রন্থে তাদের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চোখের বিনিময়ে চোখ, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং জখমসমূহের

বিনিময়ে সমান জখম। অতঃপর যে ক্ষমা করে, সে গুনাহ থেকে পবিত্র হয়ে যায়। আর যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানানুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই জালিম। '

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون َ

'হে বুদ্ধিমানগণ, কিসাসের মধ্যেই রয়েছে তোমাদের জন্য জীবন, যাতে তোমরা সাবধান হতে পারো। '৪৯৭

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيم ٌ

'হে ইমানদারগণ, তোমাদের প্রতি নিহতদের ব্যাপারে কিসাস গ্রহণ করা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির বদলায়, দাস দাসের বদলায় এবং নারী নারীর বদলায়। কিন্তু যদি কেউ তার ভাই কর্তৃক কোনো বিষয়ে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়, তাহলে ন্যায়সংগতভাবে পাওনা (রক্ত বিনিময়) সাব্যস্ত করা এবং সদ্ভাবে তা পরিশোধ করা কর্তব্য। এটি তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সহজকরণ এবং বিশেষ অনুগ্রহ। এরপরও যে সীমালঙ্ঘন করবে, তার জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। '(সুরা আল-বাকারা:১৭৮)

একটি বিশেষ মাসআলা

পেটে থাকা শিশুকে যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে, তাহলে এটাকেও অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হবে এবং এই অপরাধের কারণে হত্যাকারীর ওপর গুররা)الغرة(ওয়াজিব হবে। গুররা বলা হয় দিয়তের বিশ ভাগের এক ভাগকে।

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

'দুই প্রতিবেশী মহিলার মধ্যে কথা কাটাকাটি ও চিৎকার চেঁচামেচি শুরু হলো। কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে এক মহিলা অপর মহিলাকে একটি পাথর মারল। এতে আঘাতপ্রাপ্ত মহিলাটির সন্তানের গর্ভপাত ঘটল, যার চুল গজিয়েছিল। সাথে আঘাতপ্রাপ্ত মহিলাটিও নিহত হলো। তখন হত্যাকারী মহিলার ওপর দিয়তের ফয়সালা করা হলো। নিহত মহিলার চাচা বলল, হে আল্লাহর রাসুল, সে একটি বাচ্চা শিশু প্রসব করেছে, যার চুল গজিয়েছিল। তখন

হত্যাকারী মহিলার বাবা বলল, সে মিথ্যাবাদী। আল্লাহর কসম, শিশুটি তার মায়ের পেট থেকে জীবিত বের হয়নি-পৃথিবীতে এসে খায়ওনি এবং পানও করেনি। আর এমন শিশুর জন্য কোনো দিয়ত নেই। তখন রাসুলুল্লাহ বললেন, এটি কি জাহিলি যুগের কবিতার ন্যায় কবিতা এবং জাহিলি জ্যেতির্বিদদের মন্ত্র? নিশ্চয় শিশুর জন্য গুররা (দিয়তের বিশ ভাগের এক ভাগ) নির্ধারিত। '

খ. হদ

حد হদ শব্দের আভিধানিক অর্থ বাধা দেওয়া, প্রতিরোধ করা। পরিভাষায় হদ বলা হয়, এমন নির্দিষ্ট শাস্তিকে, যা আল্লাহ তাআলার অধিকার হিসাবে সাব্যস্ত। ৫

যখন আল্লাহ তাআলার নির্দিষ্ট কিছু নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করা হবে, তখন হদ কার্যকর করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে হদ কার্যকর করা থেকে বিরত থাকা বা এতে কোনো ধরনের শিথিলতা করা বা হদের ক্ষেত্রে কমবেশ করার কারও কোনো অধিকার নেই।

আয়িশা (রা:) থেকে বর্ণিত যে, উসামা বিন জাইদ যখন স্বর্ণালংকার ও আসবাবপত্র চুরিকারী মাখজুম গোত্রের এক নারীর ব্যাপারে সুপারিশ করেছিলেন, তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেছিলেন:

'তুমি কি আল্লাহর হদের ব্যাপারে সুপারিশ করছ?' অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে খুতবা দিলেন এবং বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তীরা তো এ কারণেই ধ্বংস হয়েছে যে, যখন তাদের মধ্যকার সম্মানিত কোনো লোক চুরি করত, তখন তারা হদ প্রয়োগ না করে তাকে ছেড়ে দিত। আর যখন কোনো দুর্বল অসহায় লোক চুরি করত, তখন তারা তার ওপর হদ প্রয়োগ করত। আল্লাহর কসম! ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদও যদি চুরি করত, তাহলেও আমি তার হাত কাটতাম।'

হদ প্রকরণ

হদ পাঁচ প্রকার:

১. চুরির হদ

২. জিনার হদ

৩. মদপানের হদ

৪. অপবাদের হদ

৫. ডাকাতির হদ

৬. জাদুর হদ

৭. সমকামিতার হদ

নিম্নে হদের প্রকারগুলো নিয়ে আলোচনা করা হলো:

১. চুরির হদ:

কারও অনুপস্থিতিতে বা অমনোযোগিতার সুযোগ নিয়ে তার রক্ষিত মাল নিয়ে যাওয়াকে চুরি বলা হয়। চুরি করা অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ। এতে সমাজের স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হয় এবং মানুষের মালের নিরাপত্তা থাকে না, ফলে সমাজে এক ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। ইসলামের বৈশিষ্ট্য হলো, বিশৃঙ্খলা দূর করে সমাজে স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনা। আর এতে যদি কিছুটা কঠোরতা করতে হয় তবুও তা করতে হবে। সুতরাং চুরির মাধ্যমে কেউ যদি সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, তাহলে ইসলামের বিধান হলো, তার হাত কেটে দেওয়া হবে। এতে করে সে যেমন আর চুরি করতে পারবে না বা চুরি করার সাহস পাবে না, সাথে অন্যরাও চুরি করার সাহস হারিয়ে ফেলবে। ফলে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসবে।

কিছু দুষ্কৃতিকারী বলে, ইসলামের বিধান অনেক কঠিন ও বর্বর। সামান্য চুরির কারণে একজন মানুষের হাত কাটা হবে!?

এ ধরনের অভিযোগ ও অপবাদ আরোপ করা কেবল তাদের পক্ষেই সম্ভব, যারা ইসলাম ও ইসলামের বিধান সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ অথবা ইসলাম ও ইসলামের বিধানের ব্যাপারে

শত্রুতা পোষণ করে। কোনো মুসলমান এ ধরনের অভিযোগ করতে পারে না। আর যদি কোনো মুসলমান এ ধরনের অভিযোগ আনে, তাহলে সে মুরতাদ তথা দ্বীন ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়। কারণ, যে মুসলিম নামধারী ব্যক্তি ইসলামের কোনো বিধানের ব্যাপারে অভিযোগ করে, কোনো বিধানকে নিয়ে কটাক্ষ করে, তাতে কোনো দোষ বা ত্রুটি আছে বলে মনে করে, কোনো বিধানকে অসম্পূর্ণ মনে করে-তাহলে সে ইসলাম থেকে খারিজ ও মুরতাদ হয়ে যায়।

ইসলামে চুরির হদ হলো হাত কাটা। পবিত্র কুরআনে কারিমে মহান আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

'যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে, তাদের কৃতকর্মের সাজা হিসাবে তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও। আল্লাহর পক্ষ থেকে এটি হুঁশিয়ারি। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। '৫০২

কারও ব্যাপারে চুরির অভিযোগ উঠলেই যে তার হাত কাটা ওয়াজিব হয়ে যায়, বিষয়টা মোটেও এমন নয়; বরং চুরির অপরাধে কারও হাত কাটতে হলে তিনটি শর্ত পাওয়া অপরিহার্য। তিনটি শর্ত পাওয়া গেলেই কেবল চোরের হাত কাটতে হবে, অন্যথায় নয়। শর্ত তিনটি নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

এক. চুরির সময় চোরের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা এবং আর্থিক সচ্ছলতা থাকতে হবে। তাকে চুরির সময় সম্পূর্ণ সুস্থ পাওয়া গেলে তবেই তার মাঝে এ শর্তটি পাওয়া গেছে বলে ধর্তব্য হবে। পাগল বা অচেতন অবস্থায় চুরি করেনি, এমন হতে হবে। সে কাজ করতে সক্ষম হবে। সে যদি এমন হয়ে থাকে, তাহলে তাকে সীমালঙ্ঘনকারী হিসাবে বিবেচনা করা হবে এবং সে শাস্তির উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে। আর যদি সে দারিদ্র্য ও ক্ষুধার কারণে বাধ্য হয়ে চুরি করে এবং তার সামনে কোনো কাজ করে জীবিকা নির্বাহের কোনো পথ না থাকে, তাহলে তার হাত কাটা হবে না। কারণ, এগুলো এমন ওজর, যার কারণে শরয়ি হদ মওকুফ হয়ে যায়।

মুআজ, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ও উকবা বিন আমির থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন:

إِذَا اشْتَبَهَ عَلَيْكَ الْحَدُّ، فَادْرَأْهُ

'হদের ব্যাপারে তোমাদের কোনো সন্দেহ সৃষ্টি হলে তোমরা হদ প্রয়োগ থেকে বিরত থাকো।' (সুরা আল-মায়িদা: ৩৮)

অনন্যোপায় লোকদের হারাম খাওয়ার অপরাধ ক্ষমার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন:

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

'অবশ্য যে লোক অনন্যোপায় হয়ে পড়ে এবং নাফরমানি ও সীমালঙ্ঘনকারী না হয়, তার জন্য কোনো পাপ নেই। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহান ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু। '(সুরা আল-বাকারা: ১৭৩)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন:

فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

'অতএব যে ব্যাক্তি তীব্র ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ে, কিন্তু কোনো গুনাহের প্রতি প্রবণতা না থাকে; তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা ক্ষমাশীল।'(সুরা আল-মায়িদা: ৩)

তাই যখন চুরির সাথে কোনো সন্দেহ যুক্ত থাকবে, তখন হদ মওকুফ হয়ে যাবে। যখন চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তি আর্থিক অসচ্ছলতায় থাকবে, তখনও হদ মওকুফ হবে। যখন উক্ত ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক ভারসাম্য ঠিক না থাকবে, তখনও হদ মওকুফ হবে।

দুই. চুরির মাল সংরক্ষিত স্থানে থাকতে হবে। যখন চোর চুরি করে, তখন সে সম্পদ নিরাপদ ও সংরক্ষিত স্থানে ছিল বলে প্রমাণিত হতে হবে। যদি চুরিকৃত মাল নিরাপদ ও সংরক্ষিত স্থানে না থাকে; বরং প্রকাশ্য কোনো স্থানে অরক্ষিত অবস্থায় থাকে, তাহলে চোরের হাত কাটা হবে না। কারণ, অনেক দুর্বল হৃদয়ের মানুষ আছে, যারা মালামাল সামনে পাওয়ার কারণে লোভ সামলাতে না পেরে চুরি করে। মূলত সেই সম্পদ যদি তার চোখের সামনে না থেকে নিরাপদ স্থানে সংরক্ষিত থাকত, তাহলে হয়তো সে চুরি করত না। কারণ, চুরি করা তার পেশা নয়, কিন্তু সামনে সম্পদ দেখে মনের কুমন্ত্রণায় সে চুরি করেছে। এ ক্ষেত্রে তার ওপর চুরির হদ প্রয়োগ হবে না।

এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, নিরাপদ সংরক্ষিত জায়গা বলতে কী বোঝায়? প্রত্যেক চোরই তো চুরি করার পর নিজের ওপর হদ প্রয়োগ হওয়া থেকে বাঁচার জন্য এই দাবি করবে যে, ওই সম্পদকে সে অরক্ষিত অবস্থায় পেয়েছে, তাই চুরি করেছে। কিন্তু হয়তো বাস্তবতা আসলে ভিন্ন, সে মূলত রক্ষিত স্থান থেকেই সম্পদ চুরি করেছিল। এখন শাস্তির ভয়ে মিথ্যে বলছে।

মূলত নিরাপদ সংরক্ষিত স্থান বলতে ওই স্থানকেই বলা হয়, প্রত্যেক অঞ্চলে যেটাকে সংরক্ষিত স্থান হিসাবে ধরা হয়। এখানে নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম নেই, যার ভিত্তিতে বলা হবে, এটা সংরক্ষিত স্থান আর ওটা অসংরক্ষিত স্থান। তাই যে এলাকায় যে সকল স্থানকে সংরক্ষিত স্থান হিসাবে গণ্য করা হয়, সে অঞ্চলে চুরির হদ প্রয়োগের জন্য সেটাই সংরক্ষিত স্থান হিসাবে ধরা হবে। সুতরাং কেউ যদি সমাজের দৃষ্টিতে সংরক্ষিত সম্পদ চুরি করে, তবেই কেবল তার হাত কাটা হবে, অন্যথায় নয়।

তিন. চুরিকৃত সম্পদের মূল্য নিসাব পরিমাণ হতে হবে। যদি চুরিকৃত সম্পদের মূল্যমান নিসাব পরিমাণ সম্পদের মূল্যমান থেকে কম হয়, তাহলে চুরির হদ প্রয়োগ হবে না। নিসাবের পরিমাণ কতটুকু, এ নিয়ে আহলে ইলমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে সবচেয়ে অগ্রগণ্য মত হলো, দশ দিরহাম(বর্তমানে দশ দিরহামে দুই ভরি সাত মাশা তথা আড়াই তোলার একটু বেশি রুপা হয়। আধুনিক পরিমাপে হয় ৩০.৬১৮ গ্রাম রুপা।) বা তার সমমূল্যের অন্য যেকোনো সম্পদই নিসাবের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং কেউ যদি দশ দিরহাম বা তার সমমূল্যের অন্য কোনো সম্পদ অথবা তার চেয়ে বেশি মূল্যের কিছু চুরি করে, সাথে তার মধ্যে পূর্বোল্লিখিত শর্ত দুটিও পাওয়া যায়, তাহলে হদ হিসাবে তার হাত কাটা হবে।

এখানে একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, চুরির হদ প্রয়োগ করতে হলে উল্লিখিত তিনটি শর্ত একসাথে থাকতে হবে। তিনটি শর্তের দুটি পাওয়া যায়, কিন্তু একটি শর্ত পাওয়া যায়নি; যদি অবস্থা এমন হয়, তাহলে হদ প্রয়োগ হবে না। কারণ, একটি শর্ত না পাওয়ার কারণে এতে এক ধরনের সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। আর সন্দেহযুক্ত বিষয়ে শরিয়তের হদ প্রয়োগ করা যায় না; বরং সন্দেহ হদকে রহিত করে দেয়।

অন্যদিকে হাদিসে নির্দেশনা এসেছে, কোনোভাবে যদি হদ প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকা যায়, তাহলে বিরত থাকাই নীতি। আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ বলেছেন:

'যদি হদ প্রতিরোধের কোনো ব্যবস্থা থাকে, তার মাধ্যমে তোমরা হদ প্রয়োগ প্রতিরোধ করো।'

অন্য হাদিসে এসেছে:

'তোমরা যথাসম্ভব মুসলমানদের ওপর হদ প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকো। যদি হদ প্রয়োগ না করে বের হওয়ার কোনো পথ থাকে, তাহলে রাস্তা ছেড়ে দাও। কারণ, খলিফার মাফ করে ভুল করাটা শাস্তি দিয়ে ভুল করার চেয়ে উত্তম। '৫০৮

ওপরের আলোচনা থেকে আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে গেল যে, চোরের হাত তখনই কাটা হবে, যখন তার চুরির ব্যাপারে আর কোনো সন্দেহ বাকি থাকবে না। যখন সন্দেহাতীতভাবে চুরির বিষয়টা প্রমাণিত হবে এবং হদ থেকে বাঁচানোর সকল পথ বন্ধ হয়ে যাবে, কেবল তখনই চোরের ওপর চুরির হদ প্রয়োগ হবে।

২. জিনার হদ

জিনা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও জঘন্য একটি কাজ। জিনাকারী ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও জাতির শত্রু। জিনার কারণে মানুষের প্রকৃত পরিচয় ও বংশ নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। কারণ, জিনার ব্যাপকতার কারণে প্রকৃতভাবে কে' কার সন্তান, এটা নির্ণয় করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

ইসলামের দৃষ্টিতেও জিনা অত্যন্ত জঘন্য একটি অপরাধ ও কবিরা গুনাহ। সংগত কারণেই জিনার ক্ষেত্রে ইসলাম কঠিন হদ নির্ধারণ করেছে। সমাজ থেকে যেন জিনা নির্মূল হয়ে যায়, সে ব্যাপারে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

জিনার হদের পরিমাণ

অবিবাহিত নারী-পুরুষের জিনার হদ হলো, একশ বেত্রাঘাত। আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারিমে বলেন:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

'ব্যভিচারী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ-তাদের প্রত্যেককে একশ করে বেত্রাঘাত করো। আল্লাহর বিধান কার্যকরণে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে দয়ার উদ্রেক না হয়, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হয়ে থাকো। আর মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। '(সুরা আন-নুর: ২)

আর বিবাহিত নারী-পুরুষের জিনার হদ হলো মৃত্যু নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত পাথর মারতে থাকা। উবাদা বিন সামিত থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ বলেছেন:

'তোমরা আমার নিকট থেকে বিধান জেনে নাও। তোমরা আমার নিকট থেকে বিধান জেনে নাও। আল্লাহ তাআলা নারীদের সতীত্ব রক্ষার জন্য পথ বাতলে দিয়েছেন। অবিবাহিত নারী-পুরুষ জিনা করলে শাস্তি একশ বেত্রাঘাত। আর বিবাহিত নারী-পুরুষ জিনা করলে একশ বেত্রাঘাত ও প্রস্তরাঘাতে হত্যা।

৩. মদপানের হদ

মদ মানুষের স্বাভাবিক অবস্থা পরিবর্তন করে ফেলে। মদপান করলে মানুষের আকল ও বুদ্ধি-বিবেক ঠিক থাকে না। তখন সে উন্মাদের মতো অস্বাভাবিক আচরণ করতে থাকে।

মদ কাকে বলে, এ বিষয়ে আহলে ইলমদের মাঝে কিছুটা মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন, আঙুর, খেজুর, জলপাই, জব, গম ইত্যাদি দিয়ে তৈরি নেশা জাতীয় প্রতিটি জিনিসই মদ। আবার কেউ কেউ বলেছেন, শুধুমাত্র আঙুর দিয়ে তৈরি নেশা জাতীয় বস্তুই মদ। তবে মদের গুণাগুণ যার মধ্যে পাওয়া যাবে, সেটার হুকুমও মদের মতোই হারাম। প্রকৃত মদ কাকে বলে, এ নিয়ে কিছুটা মতভেদ থাকলেও সকলেই কিন্তু একটি বিষয়ে একমত যে, মদ যেরকম হারাম তদ্রূপ প্রতিটি নেশা জাতীয় বস্তুই হারাম। যে জিনিস মানুষের আকলকে পরিবর্তন করে ফেলে সেটাই হারাম।

আব্দুল্লাহ বিন উমর (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

'প্রতিটি নেশা জাতীয় দ্রব্যই মদ। আর প্রত্যেক নেশা জাতীয় জিনিসই হারাম। '

বড় বড় অপরাধ ও গুনাহের কারণে দুনিয়াতেই কঠিন শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে। মদপান করা সে সকল অপরাধেরই একটি। মদপানকারীর হদ বা শাস্তি হলো আশি বেত্রাঘাত।

৪. অপবাদের হদ

এখানে অপবাদ বলতে বুঝানো হয়েছে, সতী নারীকে জিনা-ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ দেওয়া। কেবল নোংরা চরিত্রের অধিকারী, ধারণাপ্রবণ অবিশ্বাসীরাই এমন অন্যায়মূলক কথা বলার দুঃসাহস দেখিয়ে সতী স্বাধীন ও পবিত্র-চরিত্রের নারীদের অপবাদ দিতে পারে; তাদের মর্যাদা, পবিত্রতা ও সততার ওপর আঘাত করতে পারে।

একজন স্বাধীন সতী নারী সব ধরনের অপবাদ থেকে নিজেকে সর্বাত্মকভাবে রক্ষা করে। সে নিজের সতীত্ব রক্ষা ও নিজেকে পবিত্র রেখে সব ধরনের অপবাদ থেকে আত্মরক্ষাকে ইমান ও আকিদার পর সবচেয়ে বড় ও পবিত্র দায়িত্ব মনে করে। সে কিছুতেই তার ওপর মিথ্যা অপবাদ সহ্য করতে পারে না এবং তা মেনে নিতে পারে না। অন্যদিকে কিছু জঘন্য নোংরা চরিত্রের অধিকারী লোক সতী-সাধ্বী নারীর পরিচ্ছন্ন, শুভ্র ও পবিত্র চরিত্রের ওপর কলঙ্কের দাগ দেওয়ার অপচেষ্টা চালায়। এ অপরাধ ছোট বা সাধারণ কোনো অপরাধ নয়, বরং এটি বড় ও জঘন্য একটি অপরাধ।

স্বাধীন সতী নারীদের অপবাদদাতাদের কঠিন শাস্তির ধমকি দিয়ে মহান আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারিমে বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

'যারা সতী-সাধ্বী, নিরীহ ইমানদার নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা ইহকালে ও পরকালে ধিকৃত হবে এবং তাদের জন্য রয়েছে গুরুতর শাস্তি। '(আন-নুর: ২৩)

আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ বলেন:

'তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক অপরাধ থেকে বেঁচে থাকো। সাহাবিগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, সেগুলো কী? তিনি বললেন, আল্লাহ সাথে শরিক করা, জাদু করা, অন্যায়ভাবে কাউকে

হত্যা করা, অন্যায়ভাবে নিরপরাধ লোককে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, এতিমের মাল ভক্ষণ করা, যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা ও সতী-সাধ্বী সরলমনা ইমানদার নারীদের অপবাদ দেওয়া।'

যারা সতী-সাধ্বী সরলমনা ইমানদার নারীদের অপবাদ দেয়, ইসলাম তাদের জন্য কঠিন শাস্তি আবশ্যক করেছে। যাতে তারা তাদের এই নিকৃষ্ট কাজের সাজা পায় এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের অপরাধ করার দুঃসাহস না পায়। অন্যরাও যেন এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং এ ধরনের অশ্লীল কথা মুখে উচ্চারণ করার দুঃসাহস না দেখাতে পারে।

সতী নারীদের মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُون(۝

'যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর স্বপক্ষে চারজন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত না করে, তাদের আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য কবুল করবে না। আর এরাই নাফরমান। '(আন-নুর: ৪)

কেউ সতী-সাধ্বী সরলমনা ইমানদার নারীদের মিথ্যা অপবাদ দিলে তার ওপর হদ ওয়াজিব হয়ে যায়। আর তার হদ হলো আশিটি বেত্রাঘাত; যেমনটি উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়াও আজীবনের জন্য তার কোনো ধরনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। যদিও সাক্ষ্য গ্রহণ করা-না করার মাসআলার ক্ষেত্রে আহলে ইলমদের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, অনুতপ্ত হয়ে খাঁটি মনে তাওবা করলে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। আর অন্যরা বলেছেন, কোনো অবস্থাতেই তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না।

৫. ডাকাতির হদ

ডাকাতি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, অস্ত্র বা শক্তি দেখিয়ে কারও সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া। এক্ষেত্রে ডাকাতির চারটি প্রকার রয়েছে। প্রত্যেক প্রকারের জন্য আলাদা আলাদা বিধান। এক ডাকাতি করতে এসে শুধু সম্পদ লুট করবে, কিন্তু কাউকে হত্যা করবে না। দুই সম্পদ নেবে না, কিন্তু কাউকে হত্যা করবে। তিন সম্পদও নিয়ে যাবে এবং কাউকে হত্যাও করবে। চার:

সম্পদ ছিনতাই বা হত্যা কোনোটিই করবে না; বরং শুধু ভয় ও ত্রাস সৃষ্টি করবে। সুতরাং প্রথম প্রকারের ক্ষেত্রে অপরাধীর হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে অর্থাৎ ডান হাত ও বাম পা কিংবা বাম হাত ও ডান পা কেটে ফেলা হবে। দ্বিতীয় প্রকারের ক্ষেত্রে অপরাধীকে অন্য কোনো শাস্তি দেওয়া ছাড়া সরাসরি হত্যা করা হবে। তৃতীয় প্রকারের ক্ষেত্রে অপরাধীর হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে তারপর তাকে শূলীতে চড়িয়ে হত্যা করবে। চতুর্থ প্রকারের ক্ষেত্রে তাকে দেশান্তর করবে। ৫২১

আল্লাহ তাআলা বলেন:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ(ٌ

'যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদের হত্যা করা হবে অথবা শূলীতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হস্তপদসমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে দেওয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এটি হলো তাদের জন্য পার্থিব লাঞ্ছনা। আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। '(সুরা আল-মায়িদা: ৩৩)

আনাস বিন মালিক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

'উকল গোত্রের কিছু লোক মদিনায় আসল। (কিন্তু মদিনার আলো-বাতাস তাদের অনুকূলে ছিল না। তাই তারা অসুস্থ হয়ে পড়ল।) তখন রাসুলুল্লাহ তাদের উটের দুধ ও মূত্র পান করতে নির্দেশ দিলেন। তারা যখন তা পান করল, তখন সুস্থ হয়ে গেল। এরপর তারা উটের রাখালদের হত্যা করে জন্তুগুলো ছিনতাই করে নিয়ে গেল। রাসুলুল্লাহ-এর নিকট সকাল বেলা এই সংবাদ পৌঁছল। তখনই তিনি তাদের ধাওয়া করে ধরার জন্য একদল লোক পাঠালেন। দুপরের আগেই তাদের ধরে নিয়ে আসা হলো। তখন তিনি তাদের হাত পা কাটার এবং চোখ উপড়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তাদের উত্তপ্ত রোদের মধ্যে ফেলে রাখা হলো, এমনকি তারা পানি পান করতে চাইলে তাদের পানি পর্যন্ত দেওয়া হলো না। আর এভাবেই তাদের মৃত্যু হলো। '৫২৩

'যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সাথে যুদ্ধ করে' এ কথা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যারা ডাকাতি করে মানুষের ধন-সম্পদ লুট করে নিয়ে যায়। এর জন্য প্রয়োজনে মানুষও হত্যা করে এবং জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। ফলে দেশের স্থিতিশীলতা নষ্ট হয়। মানুষের মধ্যে এক ধরনের ভয় ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে, নিজেদের জানমালের ব্যাপারে তারা সর্বদা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে।

সুতরাং এই নির্দয় বিপথগামী লোকদের ব্যাপারে কোনো ধরনের দয়া, সহানুভূতি ও নমনীয়তা দেখানোর কোনো সুযোগ নেই। কারণ, তারা দয়া ও কোমল আচরণ পাওয়ার উপযুক্ত নয়; বরং তারা কঠিন শাস্তির উপযুক্ত। যাতে এর মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর দেহ থেকে এই পচা দূষিত অংশটুকু বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং সমস্ত মুসলিম উম্মাহ আতঙ্কমুক্ত নিরাপদ জীবনযাপন করতে পারে। তাদের জন্য ইসলামের নির্ধারিত হদ বা শাস্তি হলো, উল্লিখিত কুরআনের আয়াতে যা বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ শুধু মালামাল লুটের ক্ষেত্রে বিপরীত দিক থেকে তার হাত-পা কেটে দেওয়া হবে। আর শুধু হত্যার ক্ষেত্রে তাকেও হত্যা করা হবে। আর যদি সে লুট ও হত্যা উভয়টি করে তাহলে বিপরীত দিক থেকে হাত-পা কেটে তারপর শূলীতে চড়িয়ে হত্যা করা হবে। যেন এ ভয়ংকর শাস্তি দেখে জীবনে আর কেউ ডাকাতির সাহস না করে। এটাই ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে, সে কোনো ধরনের অপরাধকে সামান্য পরিমাণ প্রশ্রয় না দিয়ে গোড়া থেকে সেটাকে উপড়ে ফেলে। আর লুট বা হত্যা কোনোটিই না করলে বিশৃঙ্খলা ও ফাসাদ সৃষ্টি করার অপরাধে তাকে দেশ থেকে বের করে দেওয়া হবে।

সমাজ ও জাতির শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য ইসলাম এই পাঁচ ধরনের হদ বা শাস্তি নির্ধারণ করেছে। এই হদগুলো এমন যে, এগুলো বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের নমনীয়তা দেখানো যাবে না। আর ক্ষমা করার তো প্রশ্নই আসে না। এ ক্ষেত্রে কারও থেকে কোনো ধরনের সুপারিশও গ্রহণীয় হবে না। কারণ, এ ক্ষেত্রে সামান্য পরিমাণ নমনীয়তা উম্মাহকে কঠিন ঝুঁকি ও বিপদের মধ্যে ফেলতে পারে।

বি.দ্র.: আমরা যে সকল কিসাস ও হুদুদের কথা উল্লেখ করলাম, ইসলামি রাষ্ট্রই কেবল এগুলো বাস্তবায়ন করতে সক্ষম। আর এ সকল বিধান বাস্তবায়ন করার দায়িত্বও ইসলামি রাষ্ট্রেরই। রাষ্ট্র তার শক্তি ও প্রভাব দিয়ে অপরাধ দমনের জন্য এ সকল কিসাস, হুদুদ ও তাজিরসহ ইসলামের প্রতিটি বিধানই বাস্তবায়ন করবে। রাষ্ট্র ব্যতীত অন্য কেউ এ সকল বিধান বাস্তবায়ন করতে সক্ষম নয়। কারণ, একমাত্র রাষ্ট্রেরই হুদুদ ও কিসাসগুলো বাস্তবায়ন করা ও তার পরবর্তী বিশৃঙ্খলা কঠিন হাতে দমন করার শক্তি আছে।

৬. জাদুর হদ

জাদু করা হারাম বা কুফর। অর্থাৎ কিছু জাদু আছে কুফর, যেমন: কুরআনের অবমাননা করা, তারকারাজি বা শয়তানের উপাসনা করা, কুফরি কালাম বা কাজ করা; আর কিছু আছে হারাম, যা কুফরি বা শিরকি কাজ না করে পাথর নিক্ষেপ ইত্যাদির মাধ্যমে করা হয়। ৫২৪

জাদুকরের শাস্তি নিয়ে ফুকাহায়ে কিরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমাদ -সহ অধিকাংশ ফুকাহায়ে কিরামের মতে জাদুকরের শাস্তি হলো হত্যা

জুনদুব (র) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبُهُ بِالسَّيْفِ

'জাদুকরের হদ বা শাস্তি হলো তরবারি দিয়ে তার গর্দান উড়িয়ে দেওয়া। '

উমর(রা:) তার মৃত্যুর এক মাস পূর্বে এক চিঠিতে লিখেছিলেন:

أَنِ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ

'তোমরা প্রত্যেক পুরুষ ও মহিলা জাদুকরকে হত্যা করো।

জাদুকরকে হত্যার বিষয়ে ফুকাহায়ে কিরামের মাঝে কিছু শর্ত থাকা ও না থাকা নিয়ে ইখতিলাফ আছে। হানাফি মাজহাবমতে জাদু যদি কুফরি হয় কিংবা কুফরি না হলেও এর কারণে জমিনে ফাসাদ ও কারও ক্ষতি হয়, তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। মালিকি মাজহাবমতে যদি তার কুফরি ইসলামি আদালতে সাব্যস্ত হয় কিংবা সে প্রকাশ্যে কুফরিমূলক জাদু করে বেড়ায়, তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। শাফিয়ি মাজহাব মতে জাদুর মাধ্যমে কাউকে হত্যা করা হলে তবেই তাকে হত্যা করা হবে। আর হাম্বলি মাজহাব অনুসারে জাদুকর কুফরি কাজের মাধ্যমে জাদু করলে তখন তাকে হত্যা করা হবে; যদিও তার জাদু দ্বারা কাউকে হত্যা করা না হোক।

৭. সমকামিতার হদ

ইসলামে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও জঘন্য পাপগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো সমকামিতা। এটা এমন পাপ, যা সুস্থ রুচি পরিপূর্ণভাবে ঘৃণা করে এবং স্বাভাবিক বিবেক এটাকে পুরোপুরি অস্বীকার করে। এ অপরাধের জন্য আল্লাহ তাআলা লুত আ.-এর জাতিকে এমন ভয়ংকর আজাব দিয়েছিলেন, যা পৃথিবীর অন্য কোনো জাতিকে দেননি। এটা হারাম ও নিকৃষ্ট কবিরা গুনাহ হওয়ার ব্যাপারে কারও কোনো দ্বিমত নেই। তবে এর শাস্তি বা হদ নিয়ে মতানৈক্য পাওয়া যায়।

আল্লামা ইবনে কাইয়িম জাওজিয়া(র) বলেন, 'ইমাম মালিকও ইমাম আহমাদ(র)-এর মাজহাবে সমকামিতার শাস্তি হত্যা করা; চাই সে বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত হোক। আবু বকর(রা:) আলি(রা:), খালিদ বিন ওয়ালিদ(রা:), আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর(রা:), আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস(রা:), খালিদ বিন জাইদ(রা:), আব্দুল্লাহ বিন মামার(র) , জুহরি(র), রবিআ বিন আব্দুর রহমান (রহ), ইসহাক বিন রাহুয়া (র)-সহ প্রমুখ এমনই বলেছেন। আর ইমাম শাফিয়ি(রহ) -এর মাজহাবমতে সমকামিতার শাস্তি হুবহু জিনার শাস্তির মতোই। বিবাহিত হলে পাথর নিক্ষেপে হত্যা এবং অবিবাহিত হলে একশ বেত্রাঘাত। আতা বিন আবু রাবাহ(রহ)., হাসান বসরি(রহ), সাইদ বিন মুসাইয়িব(র), ইবরাহিম নাখয়ি(র), কাতাদা(র) , আওজায়ি(র), আবু ইউসুফ(র) , মুহাম্মাদ(রহ)-সহ অনেকে এমন মতই পোষণ করেন। আর ইমাম আবু হানিফা(রহ) ও ইমাম হাকিম(রহ)-এর মতে এর জন্য নির্দিষ্ট কোনো শাস্তি নেই; বরং তাকে তাজির করা হবে। '

অনেক ফকিহ এ মাসআলায় সমকামীকে হত্যার ব্যাপারে সাহাবিদের ইজমার কথা বর্ণনা করেছেন। হাদিস থেকেও এ মতটি শক্তিশালী বলে সাব্যস্ত হয়। ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

'তোমরা কাউকে লুত আ.-এর জাতির মতো কুকর্মে লিপ্ত হতে দেখলে কর্তা ও যার সাথে করা হয়েছে, উভয়কে হত্যা করো। '

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন, 'সমকামিতার ব্যাপারে একদল উলামায়ে কিরাম বলেন, এর শাস্তি জিনার শাস্তির মতোই। আর কারও মতে এর চেয়েও নিম্ন শাস্তি (তথা তাজির) হবে। তবে বিশুদ্ধ মত সেটাই, যেটার ওপর সাহাবায়ে কিরাম এ-এর ইজমা হয়েছে যে, সমকামিতায় লিপ্ত উভয় ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে; চাই তারা বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত হোক। '

এ মাসআলায় দলিল-প্রমাণাদির দিকে তাকালে ইমাম মালিক ও ইমাম আহমাদ -এর মতই শক্তিশালী বুঝা যায়। তাছাড়া এ মতের ওপর সাহাবায়ে কিরামের ইজমাও রয়েছে। তাই বিচারকের উচিত এক্ষেত্রে কোনো নমনীয়তা না দেখিয়ে তাদের কঠিনভাবে হত্যা করা। হত্যা কীভাবে করবে, সে ব্যাপারে কয়েকটি পন্থা রয়েছে। কারও মতে আগুনে পুড়িয়ে মারা হবে। কারও মতে পাহাড় বা উঁচু কোনো স্থান থেকে ফেলে দিয়ে তার ওপর পাথর নিক্ষেপ করে মারা হবে। আর কারও মতে প্রচণ্ড দুর্গন্ধময় জায়গায় তাকে কোনোরূপ খাবার-দাবার না দিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত ফেলে রাখবে। তবে অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম তাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যার কথা বলেছেন। মোটকথা, ভয়ংকর শাস্তি দিয়ে তাকে মারার ব্যাপারে সবাই একমত।

গ. তাজির

হদ ও কিসাসের মতো শাস্তির আরেকটি প্রকার হচ্ছে তাজির। যে সমস্ত অপরাধের জন্য শরিয়াহ কর্তৃক নির্দিষ্ট কোনো শাস্তি নেই, সেসব অপরাধের জন্য তাজিরের ব্যবস্থা রয়েছে। তাজিরের সীমা ও পরিমাণের ব্যাপারে স্পষ্ট কোনো নস নেই। রাষ্ট্রের অভিজ্ঞ আলিম ও ফকিহরা বসে বিভিন্ন অপরাধের শাস্তি নির্ধারণ করবেন। এটি বিচারকের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। বিচারক অপরাধের বিবেচনায় শাস্তির পরিমাণ নির্ধারণ করবেন। কেউ ব্যক্তিগতভাবে তাজিরের দায়িত্ব নিতে পারবে না। তবে যাদের ওপর শিষ্টাচারের দায়িত্ব, তারা তাজিরের দায়িত্ব পালন করতে পারবে। যেমন: অভিভাবক, পিতা, স্বামী প্রমুখ তাদের অধীনদের শিষ্টাচার ঠিক রাখার জন্য সীমিত পরিসরে তাজিরের দায়িত্ব পাবে।

আভিধানিক অর্থে তাজির تعزير তাজির শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে মর্যাদা প্রদান, সম্মান প্রদর্শন। এর আরেকটি অর্থ হচ্ছে, শিষ্টাচার শিক্ষাদান, শাস্তিপ্রদান।

পারিভাষিক অর্থে তাজির যে সকল অপরাধের নির্দিষ্ট শরয়ি হদ নেই, সে সকল অপরাধের জন্য শাস্তি প্রদান করে শিক্ষা প্রদান করা।

বিস্তারিত বলতে গেলে, যে সকল অপরাধের ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহমতে কোনো শাস্তি নির্ধারিত নেই, সে সকল অপরাধের ক্ষেত্রে শাস্তি প্রদানকে তাজির বলে। এ ক্ষেত্রে অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী সেই শাস্তিগুলো নির্ধারণ করবেন ইসলামি হাকিম বা বিচারক। বিচারক অপরাধীকে তার অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করবেন।

তবে বিচারককে অবশ্যই ন্যায়পরায়ণ, সত্যবাদী ও গভীর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হতে হবে। যে বিচারক ন্যায়পরায়ণতার সাথে মানুষের বিচার করেন, বিচারের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের পক্ষপাতিত্ব করেন না, আবেগতাড়িত হয়ে কাউকে অন্যায়ভাবে শাস্তি দেন না, ব্যক্তি বিদ্বেষবশত কারও ওপর অন্যায় ফয়সালা করেন না; বরং তিনি ন্যায়বিচারের মাধ্যমে সমাজ থেকে ফিতনা- ফাসাদ, অন্যায়-অপরাধ দূর করতে সচেষ্ট; সর্বদা তিনি তটস্থ থাকেন যে, তার ভুল ও অন্যায় বিচারের মাধ্যমে সমাজে না জানি ফিতনা-ফাসাদ ছড়িয়ে পড়ে-এমন বিচারকই বিভিন্ন অপরাধের তাজিরভিত্তিক শাস্তি নির্ধারণের অনুমতিপ্রাপ্ত।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

'আর তোমরা এমন ফাসাদ থেকে বেঁচে থাকো, যা বিশেষত শুধু তাদের ওপর পতিত হবে না, যারা তোমাদের মধ্যে জালিম। আর জেনে রেখো যে, আল্লাহর আজাব অত্যন্ত কঠোর। '(সুরা আল-আনফাল: ২৫)

তাজিরের কতিপয় উদাহরণ:

আমরা এখানে এমন কিছু অপরাধের কথা উল্লেখ করছি, কুরআন-হাদিসে যার নির্দিষ্ট কোনো শাস্তির কথা উল্লেখ নেই। এ ধরনের অপরাধগুলোর শাস্তি নির্ধারণ করবেন ইসলামি হাকিম বা বিচারক।

১. রমজান মাসে দিনের বেলা প্রকাশ্যে আহার করা

রমজান মাসে দিনের বেলা প্রকাশ্যে আহার করার মাধ্যমে সে এই মাসের পবিত্রতা নষ্ট করল। একটি ফরজ বিধানকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করল। ফরজ বিধান পালনকারী রোজাদারদের মনে কষ্ট দিল। আর এতগুলো অপরাধের কারণে হাকিম বা বিচারক তাকে শাস্তি প্রদান করবেন। যেহেতু এই অপরাধের জন্য নির্ধারিত কোনো শাস্তি নেই, তাই বিচারক চাইলে অপরাধীকে জেলে আটকে রাখা বা দেশান্তর কিংবা বেত্রাঘাত করার শাস্তি নির্ধারণ করতে পারবেন।

২. রাস্তাঘাটে মহিলাদের উত্যক্ত করা

মহিলাদের ইভটিজিং করা অত্যন্ত নোংরা ও খারাপ একটি কাজ। ইসলাম নারীকে সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছে এবং নারীর সম্মান রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছে। কেউ যদি কোনো নারীকে ইভটিজিং করে, তাহলে এ কুকর্মের মাধ্যমে সে নারীর সম্মান ও মর্যাদার ওপর আঘাত হানল। আর ইসলামি রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো, উত্যক্তকারীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া; যাতে অপরাধী ভবিষ্যতে এ ধরনের অপরাধ করতে আর সাহস না পায় এবং অন্যরাও এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।

৩. অহেতুক মানুষকে কষ্ট দেওয়া

অহেতুক রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়ানো, রাস্তার পাশে অনর্থক বসে থাকা, সময় নষ্ট করা, শিস দেওয়া, বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি করে অথবা নোংরা ও খারাপ কথার মাধ্যমে রাস্তার মানুষদের বিরক্ত করা অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ ও জঘন্য কাজ। প্রতিটি মুসলিম সন্তান যেন সুশিক্ষিত কর্মঠ ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী হয়, এ বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করা ইসলামি রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব।

তাই যারা বখাটে হয়ে অহেতুক রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়াবে, রাষ্ট্র তাদের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করবে, যাতে কোনো মুসলিম সন্তান বখে না যায়।

৪. ধূমপান করা

কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী ব্যক্তি কখনো ধূমপান করতে পারে না। কেবল বিকৃত রুচি, অসুস্থ হৃদয় ও বিকল মস্তিষ্কের লোকেরাই ধূমপান করে থাকে। ধুমপানের মাধ্যমে মানুষ দুধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে থাকে:

এক. শারীরিক ক্ষতি। ধুমপানের কারণে যক্ষা, হৃদরোগ, ফুসফুসের ক্যান্সার, ব্রেন ক্যান্সারসহ অনেক বড় বড় রোগ মানুষের শরীরে বাসা বাঁধে।

দুই. আর্থিক ক্ষতি। ধুমপানের কারণে অযথাই মানুষের অনেক অর্থ নষ্ট হয়।

তাই ইসলামি বিচারক মানুষকে ধূমপান করার কারণে শাস্তি প্রদান করবেন। যাতে তারা শারীরিক ও অর্থিক ক্ষতি থেকে বেঁচে সুস্থ ও সচ্ছলভাবে জীবনযাপন করতে পারে।

৫. অরক্ষিত মাল চুরি করা

কেউ যদি অরক্ষিত মাল চুরি করে, তাহলে তার ওপর হদ প্রয়োগ হয় না ঠিক, কিন্তু হাকিম চোরের জন্য একটা শাস্তি নির্ধারণ করবেন। কারণ, এটা পূর্ণ অর্থে চুরি না হলেও এর মাধ্যমে চুরি করার অভ্যাস হয়ে যেতে পারে। তাই প্রথমেই এর শাস্তির ব্যবস্থা করলে সামনে থেকে এ বিষয়ে সে পূর্ণ সতর্ক থাকবে।

৬. নিসাব-নিম্ন সম্পদ চুরি করা

কেউ যদি রক্ষিত মাল চুরি করে, কিন্তু তা নিসাব পরিমাণ না হয়, অথবা রক্ষিত মাল চুরি করতে গিয়ে চুরি করার পূর্বেই ধরা পড়ে, তাহলেও তার ওপর হদ প্রয়োগ করা না হয়েও বিচারক তাকে শিক্ষাপ্রদ একটা শাস্তি দেবেন, যাতে করে সামনে সে আর এ ধরনের কাজ করার সাহস না পায় এবং মানুষও এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

৭. গালি-গালাজ করা

একে অপরকে অন্যায়ভাবে গালিগালাজ করা, অন্যায়ভাবে মিথ্যা অপবাদমূলক কথা বলা যেমন একজন অপরজনকে ফাসিক, কাফির, মুনাফিক, খবিস, চোর ইত্যাদি বলা। এ ধরনের কথা বলা বা গালি দেওয়ার মাধ্যমে অন্যজনকে খাটো করা হয়। তার সম্মানের ওপর আঘাত দেওয়া হয়। তাই যারা এমন করবে ইসলামি রাষ্ট্র তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করবে।

৮. জিনার নিম্নবর্তী গুনাহ করা

ইমাম মাওয়ারদি জিনার নিম্নবর্তী কিছু গুনাহের তাজির বর্ণনা করে বলেন, 'যদি তাজিরের শাস্তিটা জিনা জাতীয় কোনো কাজে হয়ে থাকে, তবে জিনাকারী ও জিনাকারিণীর অবস্থা বিবেচনায় শাস্তির মাত্রায় কমবেশ হবে। যদি উভয়কে এ অবস্থায় পাওয়া যায় যে, উভয়ের যৌনাঙ্গ এখনো মিলিত হয়নি, তবে তাদের সর্বোচ্চ তাজিরের শাস্তি ৭৫ চাবুক মারা হবে। যদি তাদের উভয়ের মাঝে শরীরের নিম্নভাগে কাপড় জড়ানো থাকে এবং তারা দুজন

কাছাকাছি তো থাকে, কিন্তু সহবাসের কর্ম থেকে বিরত থাকে, তবে ৬০ চাবুক মারা হবে। যদি তাদের উভয়কে পূর্বের অবস্থায় পাওয়া যায়, কিন্তু কাছাকাছি না পাওয়া যায়, তবে ৪০ চাবুক মারা হবে। যদি তাদের খালি বাড়িতে পাওয়া যায়, তাদের গায়ের পোশাক গায়েই থাকে, এমতাবস্থায় তাদের ৩০ চাবুক মারা হবে। যদি রাস্তায় কথা বলা অবস্থায় তাদের পাওয়া যায়, তবে ২০ চাবুক মারা হবে। যদি তাদের ইশারা ইঙ্গিতে মনোভাব আদান-প্রদান করতে দেখা যায়, তবে ১০ চাবুক মারা হবে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য

হদ ও কিসাসের মতো তাজির বাস্তবায়ন করার দায়িত্বও ইসলামি রাষ্ট্রের। কোনো একক ব্যক্তি এই দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন করতে পারবে না এবং কারও একার পক্ষে এগুলো বাস্তবায়ন করা সম্ভবও নয়। কারণ, একাকী কেউ এগুলো বাস্তবায়ন করতে গেলে তাকে অনেক সময় বাধার সম্মুখীন হতে হবে এবং বাস্তবায়ন করার পর বিশৃঙ্খলার সম্ভাবনা থাকবে। সেই বাধার মোকাবেলা ও বিশৃঙ্খলা দমন করার শক্তি কারও একার নেই। তবে যদি কোনো একক ব্যক্তি এগুলো বাস্তবায়ন করে ফেলে, তাহলে মৌলিকভাবে যদিও তা বৈধ হবে, কিন্তু আইনগতভাবে তা বৈধ হবে না।

কিসাস ও হুদুদ ব্যতীত অন্য সব অপরাধই তাজিরের আওতায় পড়বে। তাজিরের শাস্তির পরিমাণ পরিবর্তনযোগ্য। কতিপয় ফুকাহায়ে কিরামের নিকট তাজিরের শাস্তি সর্বোচ্চ উনচল্লিশটি বেত্রাঘাত হতে পারবে, এর বেশি হতে পারবে না। তাজির তো পরিবর্তনযোগ্য, কিন্তু কিসাস ও হুদুদের ক্ষেত্রে তাজিরের মতো এই শিথিলতার কোনো অবকাশ নেই।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

‘কিয়ামতের দিন একজন শাসককে আনা হবে, যে কিনা নির্ধারিত শাস্তির চেয়ে অধিক প্রহার করেছিল। অতঃপর আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন, তুমি আমার নির্দেশিত শাস্তির চেয়ে কেন বেশি প্রহার করলে? জবাবে সে বলবে, (আপনার নাফরমানির কারণে) আমি ক্রোধান্বিত হয়েছিলাম। আল্লাহ বলবেন, আচ্ছা! তাহলে আমার চেয়ে তোমার ক্রোধ বেশি হয়ে গেছে? এরপর আরেকজন শাসককে আনা হবে, যে কিনা শাস্তি প্রদানে কম করেছিল। আল্লাহ তাআলা তাকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কেন শাস্তি কম দিয়েছিলে? সে জবাব দেবে, দয়াপরবশ

হয়ে। আল্লাহ বলবেন, আচ্ছা! তাহলে আমার দয়ার চেয়ে তোমার দয়া অধিক হয়ে গিয়েছিল? তারপর তাদের উভয়কে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার আদেশ করা হবে’

শরীয়াহ আইন কী অমানবিক নাকি সকলের জন্যই কল্যাণকর?

জবাব দেওয়ার আগে পাঠকের কাছে প্রশ্ন, শারীয়াহ আইন অমানবিক এই কনসেপ্ট আমাদের মাঝে কে ঢুকিয়ে দিয়েছে?আমরা কি সঠিক জ্ঞান রেখেই,সঠিক পন্থায় পড়াশোনা করে শারীয়াহ’কে অমানবিক বলছি?নাকি পাশ্চাত্যের শেখানো মুখস্থ বুলি আওড়াচ্ছি?

‘শরিয়াহ আইন’ হলো চোরের হাত কেটে দেওয়া (এর জন্য সুনির্ধারিত শর্ত-শারায়েত আছে। যে কেউ চোর নয় এবং যেকোনো কিছুর জন্যও হাত কাটা নয়)। চোরের শাস্তি নিশ্চিত হলে ছিনতাইকারী, উটকো ঝামেলাকারীরাও আইনের আওতায় এসে দমে যেতে বাধ্য হবে। আপনাকে মন্ত্রী হয়ে পুলিশ প্রোটেকশনে থেকেও মোবাইল হারাতে হবে না। যাত্রাবাড়ী গাবতলীতে বাসের জানালা দিয়ে থাবা মেরে আপনার মোবাইল নিয়ে দৌড় দেবে না। ফ্যামিলি নিয়ে নিরিবিলি কোথাও গিয়ে উটকো মস্তানদের খপ্পরে পড়তে হবে না। রাতের দুইটায় সায়েদাবাদ বাস স্ট্যান্ডে নেমে ছিনতাইকারীর কবলে পড়ে সব খোয়াতে হবে না। মলম পার্টি আপনার ব্যাগ টাকা-পয়সা হাতিয়ে নিতে পারবে না। কুরবানির গরুর গাড়িতে চাঁদাবাজি হবে না। সর্বত্র আপনি হবেন নির্বিঘ্ন।

বিবাহিত কেউ অবৈধ যৌনাচারে লিপ্ত হলে পাথর নিক্ষেপে হত্যা এবং অবিবাহিত কেউ এই কাজে জড়ালে ১০০ বেত্রাঘাত ভোগ করতে হবে (এর জন্যও সাক্ষীসাবুদ এবং স্বীকারোক্তি প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ। কাউকে ফান্দে ফেলতে অথবা মানহানি ঘটাতে চাইলে উলটো নিজেকে কঠিন সাজা ভোগ করতে হবে)। সুতরাং অবৈধ মিলন করে সন্তান উৎপাদন এবং তাকে ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে বেঁচে যাবার সুযোগ এখানে নেই। এবরশন হবে না। সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে বাবা-মা শঙ্কিত থাকতে হবে না। সমাজে সম্মান খোয়া যাবার আশঙ্কা কমে যাবে। ভুল করে ফেলে সতীত্ব হারিয়ে সারাজীবন কাঁদতে হবে না। ‘বিয়ের প্রলোভনে ধর্ষণ’ ঘটবে না। যেখানে সাময়িক উত্তেজনায় পরস্পর সম্মতিতে অবৈধ যৌনাচারই নিষিদ্ধ, সেখানে ধর্ষণ করার দুঃসাহস কেউই করবে না। পরকীয়া থেমে যাবে; আপনার সুখের সংসার ভাঙবে না। দেশে বউ থুয়ে বিদেশ গিয়ে টেনশন পোহাতে হবে না।

বিনা অপরাধে কারও রক্ত ঝরালে তার কিসাস বা সমপরিমাণ সাজা ভোগ করতে হবে। এই আইনে খুন করে বেঁচে যাবার সুযোগ থাকবে না। চাই সেটা সেজান জুসের মতো ঘটনা হোক; নারায়ণগঞ্জের সেই সেভেন মাডার ঘটুক; রানা প্লাজা ধসে পড়ুক; মুনিয়া মারা পড়ুক; জমি নিয়ে বিরোধ লাগুক। রক্তের মূল্য এখানে রক্ত। ভিক্টিমের ক্ষমা ছাড়া বা আইনের কাছে নতি স্বীকার ছাড়া টাকার জোরে বেঁচে যাবার সুযোগ নেই। এই আইন জারি হলে সন্ত্রাসের নৈরাজ্যও কমে যাবে। অবৈধ অস্ত্র নিয়ে ক্যাডারগিরি বন্ধ হবে। ক্ষমতার দাপটে কেউ আপনাকে খুনের হুমকি দিতে পারবে না। আপনার জমি দখল করতে খুন করে লাশ গুম করে ফেলেও বেঁচে যেতে পারবে না। 'বন্দুকযুদ্ধে নিহত' বলে কেউ পার পেয়ে যাবে না; সবাইকে বিচারের আওতায় আসতে এবং আনতে হবে।

'শরিয়াহ আইন'-এ পতিতাবৃত্তি বন্ধ। দুর্নীতি বন্ধ। ঘুষ বন্ধ। সুদ বন্ধ। টেন্ডারবাজি বন্ধ। কালোবাজারি বন্ধ। বাজার সিন্ডিকেট বন্ধ। বিদেশে টাকা পাচার বন্ধ।

'শরিয়াহ আইন' চালু হলে সরকারি-বেসরকারি কোনো খাতেই দুর্নীতির সুযোগ থাকবে না। চাকরির শেষ দিনে রাবির ভিসি অবৈধভাবে কাউকে নিয়োগ দিতে পারবে না। থানা কোর্ট রেজিস্ট্রি অফিস—কোথাও সরকার নির্ধারিত অর্থের অতিরিক্ত এক টাকাও খরচ হবে না। ৫ মিনিটের কাজে ৫ মিনিটই লাগবে, সপ্তাহ ধরে চরকির মতো ঘুরতে হবে না। রাস্তার মোড়ে মোড়ে ট্রাফিক আর ক্ষমতাসীন ক্যাডারদেরকে চাঁদা দেওয়া লাগবে না। আপনার ১০ টাকার গাড়িভাড়া ১০ টাকাই থাকবে, চাঁদার কারণে ১৫ টাকা গুণতে হবে না। 'শরিয়া আইন' চালু হলে চাকরির জন্য ঘুষ দিতে হবে না। আপনার অধিকার কিংবা সম্পত্তি ফিরিয়ে দিতে বিচারক ঘুষ খাবে না। 'শরিয়া আইন' চালু হলে বিপদে পড়ে ব্যাংক অথবা কারও থেকে ঋণ নিয়ে মাসে মাসে আপনাকে চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ গুণতে হবে না। ১ লাখ টাকা ধার নিয়ে চক্রবৃদ্ধিতে সুদ গুণে আপনাকে ২ বছরে সুদে-আসলে ১ লাখ টাকার বিনিময়ে আড়াই লাখ টাকা বা আরও বেশি গুণতে হবে না। 'শরিয়া আইন' চালু হলে রাস্তায় নারী-পুরুষের উগ্র চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে। বেপর্দার সুযোগ থাকবে না। যার দরুন বিভিন্ন অঞ্চলে সহস্র বছর ধরে চলে আসা ঐতিহ্য সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে ধসে যাবে না। রাস্তায় নারীর উদম চলাফেরা উস্কে দেওয়া কখনোই সভ্য সমাজের নিদর্শন নয়। পুঁজিবাদ ব্যবস্থা নিজেদের স্বার্থে এই সংস্কৃতি চালু করেছে এবং এর মাধ্যমেই তারা নারীকে পণ্য বানিয়ে নিতে পেরেছে। নারী স্বাধীনতা নামে বেপর্দার প্রসার ঘটিয়ে পণ্য হয়ে যাওয়া নারীদের ভদ্র সমাজে স্বাভাবিক জীবনযাপনের একটা সুযোগ তৈরি করা হয়েছে এবং এই পণ্য; তার উৎপাদক ও খদ্দেররাই ভদ্র সমাজকে সেক্যুলার সমাজে পরিণত করেছে। 'শরিয়া আইন' সাংস্কৃতিক এই আগ্রাসন

রুখে দাঁড়াবে, বখে যাওয়া নারী-পুরুষদের উগ্রপনা থামাবে, তরুণ ও যুবকদের চরিত্র রক্ষায় কাজ করবে, হাজার বছরের ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনবে এবং বজায় রাখবে।

গণতন্ত্রের বর্তমান নিয়মে যতই বলুক, দেশ জনগণের, বাস্তবে যে তা নয়, এটা বোধহয় বলে বোঝানো লাগবে না। এখানে যা-কিছু ঘটে, সরকার নিজের মতো করে নিয়ন্ত্রণ করে। অথচ 'শরিয়া আইন'-এ সরকার-জনগণ মিলেমিশে দায়িত্ব পালন করতে হয়। এখানে দায়িত্ব পালনের জন্যই তিনি সরকার, নিজের মনগড়া আইন, মতবাদ, ট্যাক্স ইত্যাদি চাপিয়ে দেওয়ার কোনো সুযোগ তার নেই। উদাহরণ দিই, বিবাহিত কেউ অবৈধ যৌনাচারে লিপ্ত হলো, তাদের শাস্তি রজম বা পাথর মেরে হত্যা করা। এই শাস্তি কার্যকর করবে জনগণ, সরকারের কাজ হলো অপরাধীকে ধরে এনে জনসমাবেশে উপস্থিত করা। এই নিয়ম ইসলামের, সরকারের এখানে দায়িত্ব পালন ছাড়া ভিন্ন কিছু করার সুযোগ নেই। সে চাইলেই দুর্নীতি করতে পারবে না, রাষ্ট্রপতি বিশেষ ক্ষমা ঘোষণা করতে পারবে না।

হ্যাঁ, এই সুন্দর আইনগুলো জারি করে দেশে শৃঙ্খলা রক্ষাই 'শরিয়াহ আইন'। এই 'শরিয়া আইন' শুধু অপরাধীদের জন্যই কঠোর, শান্তিকামীরা চায় উলটো এই আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হোক। ইতিহাসে ব্যাপক চর্চিত ও পরীক্ষিত আইন এটি। পৃথিবীর নানান অঞ্চল ও শাসন এই আইন অনুসরণ করে সমৃদ্ধ হয়েছে, যার ভিত্তিতেই আজকের এই আধুনিকতা। চিকিৎসা বিজ্ঞান পড়তে যান, আপনাকে সেই পেছনের কালের পুরোনো কালির গবেষণা পড়তে হবে। সামরিক ব্যবস্থাপনায় এখনো সারা দুনিয়ায় ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রণীত প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। 'শরিয়া আইন' পালন করার ফলেই তারা দ্রুত এসব করতে পেরেছেন এবং গবেষণা ও উন্নয়নে আমাদের জন্য নমুনা রেখে গেছেন। এখনো চাইলেই আমরা সেটার চর্চা করে সবদিক থেকে সমৃদ্ধ হতে পারি। মুসলিম দাবিদার অথবা মুসলমান নাগরিকদের প্রতিনিধিত্ব করা যেকোনো সরকারই এই আইনগুলো বাস্তবায়ন করে একইসঙ্গে দেশ নিয়ন্ত্রণ, উন্নয়ন, জনসেবা ইত্যাদি সহজেই করে ফেলতে পারেন। জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত হলে শান্তি বজায় থাকলে সরকারের ক্ষমতাও অনেকটা নিশ্চিত হয়ে যায়। বিশ্বাস না হয় অন্তত একটা আইন নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে দেখুন না, কী সুন্দর বদলে যায় সব।

শরীয়াহ নিয়ে ছয়টি ভুল ধারণা

শরীয়াহ নিয়ে আমাদের মধ্যে অনেক ভুল ধারণা কাজ করে। এ ধারণাগুলো দীর্ঘদিনের প্রপাগ্যান্ডা, অপব্যাখ্যা, অজ্ঞতা এবং আংশিক জ্ঞানের ফসল। লম্বা সময় ধরে এসব ভুল ধারণার প্রচার ও প্রসারের জন্য কাজ করেছে ওরিয়েন্টালিস্টরা আর ধর্মনিরপেক্ষতা ও

প্রগতির নামে মুসলিমবিশ্বে ইসলামবিদ্বেষ ছড়ানো সুশীলরা। সেই সাথে দুঃখজনক বাস্তবতা হলো, শরীয়াহর ব্যাপারে অনেক ভুল ধারণার দায়ী আমরা নিজেরাও। ইসলামকে আধুনিক প্রমাণ করতে গিয়ে গত দেড় শ বছরে নানান অপব্যাখ্যা নিয়ে হাজির হয়েছে পশ্চিমা চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত অনেক ব্যক্তি, দল ও সংগঠন। শরীয়াহর পতাকা উচিয়ে তোলার দাবি করা অনেকেই একে বিকৃত করেছে। তারা শরীয়াহর স্লোগানকে ব্যবহার করেছে নিজেদের বৈধতা তৈরির জন্য। তবে অবশ্যই ব্যতিক্রম আছে এবং তা আল্লাহ-এর রহমতের কারণেই।

এ বিষয়ে আলোচনা অনেক বিস্তৃত এবং এমন ভুল ধারণাগুলোর সংখ্যা কম না। এ লেখায় এমন কয়েকটি বহুল প্রচলিত ভুল ধারণা নিয়ে আমরা আলোচনা করব। এ আলোচনার পেছনে প্রথম উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ-এর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাতের ইচ্ছে, যখন তাঁর মনোনীত শরীয়াহর ব্যাপারে আমাদের অন্তরে পূর্ণ সন্তুষ্টি থাকবে। আমাদের অন্তরগুলো হবে সব ধরনের সংশয় ও সন্দেহ থেকে মুক্ত।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো শরীয়াহর চেতনা, শরীয়াহর প্রতি ভালোবাসা, শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার দায়িত্বের কথা ছড়িয়ে দেয়া। এটি আল্লাহর যমীনে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার একটি আবশ্যিক শর্ত।

শরীয়াহর বিকল্প আসলে কী? শরীয়াহ না থাকার অর্থ কী?

শরীয়াহর বিকল্প হলো জাহিলিয়্যাহ। শরীয়াহ না থাকার অর্থ হলো জাহিলিয়্যাহ-

অন্ধকার, অজ্ঞতা। সব অর্থে, সব দিক দিয়ে।

আজ আমরা নব্য জাহিলিয়্যাহর সময়ে বসবাস করছি। চারদিক থেকে আমাদের ঘিরে রেখেছে অন্ধকার আর অজ্ঞতা। জাহিলিয়্যাহর উন্মাদনা আমাদের ভুলিয়ে রেখেছে আল্লাহ-এর মনোনীত শরীয়াহর কথা। জাহিলিয়্যাহ আমাদের শরীয়াহর পথ থেকে বিচ্যুত করেছে এবং আমাদের ওপর প্রতিষ্ঠা করেছে যুলুম আর কুফরের শাসন।

তাহলে আসুন শরীয়াহ নিয়ে বহুল প্রচলিত কিছু ভুল ধারণা নিয়ে আলোচনা করা যাক।

ভুল ধারণা : ১

শরীয়াহকে ঐচ্ছিক বিষয় মনে করা।

কেউ কেউ মনে করেন শরীয়াহ গ্রহণ না করেও মুসলিম থাকা সম্ভব। এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা; বরং শরীয়াহকে গ্রহণ করা এবং আমাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন শরীয়াহ অনুযায়ী পরিচালনা করা ঈমানের দাবি। এটি দ্বীনের একটি মৌলিক নীতি। শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা করতেই হবে এবং শরীয়াহ ছাড়া অন্য সব ব্যবস্থা বাতিল। যে এ কথা বিশ্বাস করে না তার পক্ষে মুসলিম থাকাই সম্ভব না।

আল্লাহ বলেছেন,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

অতএব তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের মীমাংসার ভার তোমার ওপর ন্যস্ত না করে, অতঃপর তোমার ফয়সালার ব্যাপারে তাদের মনে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ না থাকে, আর তারা তার সামনে নিজেদের পূর্ণরূপে সমর্পণ করে। [তরজমা, সূরা আন-নিসা, ৬৫]

এবং তিনি বলেছেন,

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا : وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

মু'মিনদের যখন তাদের মাঝে ফয়সালা করার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয়, তখন মু'মিনদের জবাব তো এই হয় যে, তারা বলে, আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম, আর তারাই সফলকাম। [তরজমা, সূরা আন-নূর, ৫১]

এবং তিনি বলেন,

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

তারা কি তবে জাহিলিয়্যাতের বিধান চায়? আর নিশ্চিত বিশ্বাসী কওমের জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহর চেয়ে কে অধিক উত্তম? [তরজমা, সূরা আল-মা'ইদা,

৫০]

এবং,

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

অতঃপর (হে নবী) আমি তোমাকে দ্বীনের (সঠিক) পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছি, কাজেই তুমি তারই অনুসরণ করো, আর যারা জানে না তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ কোরো না। [তরজমা, সূরা আল-জাসিয়া, ১৮]

ইসলামী শরীয়াহ ব্যাতীত অন্য কোনো শাসনব্যবস্থা, কোনো তন্ত্রমন্ত্র গ্রহণ করার সুযোগ নেই। শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যিক। এ কথা প্রত্যেক মুসলিমকে বিশ্বাস করতে হবে। এ কথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস না করলে, আল্লাহ যমীনে আল্লাহর আইন বাস্তবায়নের আকাঙ্ক্ষা না থাকলে ঈমানদারই হওয়া যাবে না।

এটা হলো মৌলিক শর্ত। চিন্তা শুরু করতে হবে এই ধাপ থেকে।

এই ধাপে আসার পর বিভিন্ন ইজতিহাদি বিষয়ে ভিন্নমতের সুযোগ আছে। কিন্তু সেই ভিন্নমতের ভিত্তি হতে হবে শরীয়াহ। অর্থাৎ আমরা সবাই শরীয়াহ অনুসরণ করে আল্লাহ-কে সন্তুষ্ট করতে চাই। আমরা সবাই এই সন্তুষ্টি অর্জনের সর্বোত্তম পথটা খুঁজছি, যাতে করে তাঁর ইচ্ছে ও নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতে পারি-এই অবস্থানের আসার পর পথ ও পদ্ধতি নিয়ে ভিন্নমত হতে পারে।

এমন অনেক দল ও আন্দোলন আছে, যারা শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার দাবিকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে। তারা শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার স্লোগান তোলে কিন্তু তাতে আন্তরিকতা থাকে না। এ ধরনের কোনো দলের বিরোধিতা করা আর শরীয়াহর বিরোধিতা করা, দুটো ভিন্ন বিষয়। শরীয়াহর ব্যাপারে ভুল ইজতিহাদ ত্যাগ করা এক বিষয়, আর আর শরীয়াহর কর্তৃত্বকে প্রত্যাখ্যান করা

আরেক বিষয়। কিন্তু আজ এ নিয়ে অনেকেই বিভ্রান্তিতে ভোগেন। প্রথমটি করা সঠিক। কিন্তু দ্বিতীয়টি, অর্থাৎ শরীয়াহর কর্তৃত্বকে অস্বীকার করা হলো কুফর।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো মানুষ এ দুটি বিষয়কে আজ হরহামেশাই মিলিয়ে ফেলে। যার ফলে তৈরি হয় অনেক বিভ্রান্তি।

ভুল ধারণা: ২

শরীয়াহকে আজকের যুগের জন্য অপ্রতুল, অপর্যাপ্ত কিংবা অ-পরিপূর্ণ মনে করা। এমন মনে করা যে শরীয়াহর অন্য কিছুর প্রয়োজন আছে।

আজ অনেকেই মনে করেন শরীয়াহ শাসন দিয়ে বর্তমান সময়ের চাহিদা মেটানো যাবে না। অনেকে বিশ্বাস করেন পরিপূর্ণভাবে শরীয়াহ অনুসরণ করা আজ সম্ভব না। আধুনিক সময়ে রাষ্ট্র শরীয়াহ দিয়ে চলবে, এ চিন্তাটাই অনেকের কাছে অবাস্তব। তারা মনে করে শরীয়াহ যুগের চাহিদা মেটাতে অক্ষম। কেউ কেউ এটা সরাসরি বলে ফেলে। আর কেউ কেউ এ চিন্তাগুলো প্রকাশ করে নানান প্রশ্নের মোড়কে।

এ ধরনের মানুষদের অনেকেই মনে করেন শরীয়াহতে অসম্পূর্ণতা আর কমতি আছে। আর এগুলো মেটানোর জন্য গণতন্ত্রের মতো আদর্শগুলো থেকে কিছু কিছু জিনিস ধার করা দরকার।

নিঃসন্দেহে এটা একটা মারাত্মক ভুল ধারণা।
এই ভুল ধারণার পেছনে বড় একটা কারণ হলো আমাদের আজকের বাস্তবতা। আজ আমরা এমন একটা সিস্টেমের অধীনে থাকি, যা ইসলামের দৃষ্টিতে পুরোপুরি অবৈধ। অবৈধ এ সিস্টেমের প্রভাব আমাদের জীবনে পড়ে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ঢুকে পড়ে বিভিন্ন ক্ষতিকর, হারাম বিষয়। হারামের সাথে সহাবস্থানে আমরা অভ্যস্ত হয়ে যাই।

ইসলাম নিয়ে আমাদের আলোচনার বিশাল একটা অংশ বরাদ্দ থাকে আমাদের জীবনে জোর ঢুকে পড়া এই হারাম বিষয়গুলো নিয়ে।

'অমুক জিনিস কি হারাম?

'কেন হারাম?'

'আচ্ছা এই হারামের বিকল্প কীভাবে তৈরি করা যায়?'

'আচ্ছা অল্প কিছুটা হারাম কি মেনে নেয়া যায় না?'

আমাদের চিন্তা আটকে থাকে এমন নানান প্রশ্নের গোলকধাঁধায়।

অথচ শরীয়াহর ব্যাপ্তি কিন্তু শুধু হারাম-হালাল নির্ধারণের মধ্যে সীমাবদ্ধ না; বরং শরীয়াহর উদ্দেশ্য হলো এমন এক বাস্তবতা তৈরি করা, যেখানে এই হারামগুলো এবং সেগুলোর প্রয়োজনই থাকবে না। কিন্তু শরীয়াহর পরিপূর্ণ ছবিটা আজ আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। সেটা নিয়ে আলোচনা করার, বোঝার, ভাবার ফুরসত হয় না আমাদের। কালেভদ্রে আমরা এ নিয়ে কথা বলি। তাই আজ অনেকেই শরীয়াহ বলতে বোঝেন নিছক কিছু বাধানিষেধ, আর শাস্তিকে। বিয়ে, তালাক, উত্তরাধিকার, ইত্যাদির মতো অল্প কিছু ক্ষেত্রে আমাদের শরীয়াহর কথা মনে পড়ে। অথচ শরীয়াহ একটি পূর্ণাঙ্গ, পরিপূর্ণ ব্যবস্থা। কুরআন, সুন্নাহ, খালিফাহগণের আমল, ইসলামী শাসনের হাজার বছরের ইতিহাস এবং আলিমগণের ইস্তিমবাতো। যে গভীর ও বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যায়, তার দিকে তাকালে যে কেউ বিস্মিত হয়ে যাবে।

কীভাবে আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ এবং শাসক নির্বাচন করা হবে তার বাস্তবসম্মত পদ্ধতি শরীয়াহতে দেয়া আছে। শাসকও যেমন-তেমন হলে হবে না। এমন শাসক হতে হবে যে, মানুষের কাছে গৃহীত হবে এবং ইসলামী আইন অনুযায়ী সাধারণ মুসলিমদের প্রতি তাঁর চুক্তি অনুযায়ী আমল করতে বাধ্য থাকবে।

শরীয়াহ সুদকে নিষিদ্ধ করছে এবং বিভিন্ন ধরনের অংশীদারীকে হালাল করেছে। শারীয়াতে (ডিউটি, ট্যাক্স) হারাম করা হয়েছে। অন্যদিকে খারাজ, উশর, ওয়াকফ ইত্যাদি থেকে অর্থায়নের পদ্ধতি দেয়া হয়েছে।

শরীয়াহতে মালিকানার ব্যাপারে বিস্তারিত নির্দেশনা এসেছে। পানি, জ্বালানি এবং চারণভূমির জনমালিকানার (public ownership) কথা এসেছে।

শরীয়াহতে একচেটিয়া ব্যবসা (মনোপলি) আর দলবেঁধে লুটপাট করার পুঁজিবাদের (ক্রোনি ক্যাপিটালিযম) উত্থানের পথ বন্ধ করার উপায় বলে দেয়া হয়েছে। শরীয়াহতে নির্দেশিত হয়েছে যুদ্ধ ও শান্তি-বিষয়ক কূটনীতি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূলনীতি।

শরীয়াহ আমাদের শিক্ষা দিয়েছে দুর্বল এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্তদের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়ার, যদিও তারা কাফির হয়।

কিন্তু আমরা এগুলো নিয়ে কথা বলি না। আসলে শরীয়াহতে কত বিস্তারিত ও সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা দেয়া আছে সেটা আমাদের অধিকাংশেরই অজানা।

শরীয়াহ আমাদের এ কাজগুলো করার শিক্ষা দেয় আখিরাতের জন্য। শরীয়াহ আমাদের দেয় ইবাদতের এক পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ ধারণা, যা দুনিয়াবি কোনো ব্যবস্থায় পাওয়া যায় না। নিজের সাথে সৎ হয়ে শরীয়াহর এ বিস্তৃতি ও বিধানগুলোর দিকে তাকালে যে কেউ আল্লাহ-এর এই আয়াতের যথার্থতা ও গভীরতা অনুধাবন করবে,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের ওপর আমার নিআমত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম

ইসলামকে। [তরজমা, সূরা মা'ইদা, ৩]

আমাদের এক সমৃদ্ধ, স্বয়ংসম্পূর্ণ ভান্ডার আছে। কিন্তু আমরা সেটা ভুলে বসে আছি। সেটা ফেলে সমাধান খুঁজছি নানা তন্ত্রমন্ত্রে। শরীয়াহ নিয়ে এবং শরীয়াহর এ দিকগুলো নিয়ে আজ কথা বলা হয় না। স্কুলে এগুলো পড়ানো হয় না; বরং স্কুলে শিশুদের জাহিলিয়্যাহর শিক্ষা দেয়া হয়। অথচ শরীয়াহ থেকে উৎসারিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়ানো হয় এবং তা থেকে তারা উপকৃতও হয়।

শরীয়াহ বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছে, সমাধান দিয়েছে। সেই সাথে অবিচার বন্ধ করা এবং নির্দেশনা দেয়ার জন্যে সীমাও ঠিক করে দেয়া হয়েছে শরীয়াহতে। প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে রাখা হয়েছে ইজতিহাদের জায়গাও।

আল্লাহ এর এ আয়াত নিয়ে একটু চিন্তা করে দেখুন,

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ

আর আমি তোমার ওপর কিতাব নাযিল করেছি প্রতিটি বিষয়ের স্পষ্ট বর্ণনা, হিদায়াত, রহমত ও মুসলিমদের জন্য সুসংবাদস্বরূপ। [তরজমা, সূরা আন-নাহল,

৮৯]

আল্লাহ বলছেন যে, তিনি প্রতিটি বিষয়ের স্পষ্ট বর্ণনা নাযিল করেছেন। তাহলে এটা কী করে সম্ভব যে, আল্লাহ আমাদের যথাযথ রাজনৈতিক ব্যবস্থা দেননি? এটা কী করে সম্ভব যে, তিনি আমাদের জন্য এমন কোনো ব্যবস্থা ঠিক করে দেননি, যা মানুষের জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে?

এট কি আদৌ হতে পারে?
এ বিষয়ে আরও আলোচনার জন্য আগ্রহী পাঠকরা নিচের বইগুলো দেখতে পারেন। শরীয়াহর অনন্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে বেশ কিছু উপকারী আলোচনার জন্য দেখতে পারেন মাক্বাসিদ আশ-শরীয়াহ নিয়ে ইবনু আশুর এর বই। এ ছাড়া এমন আলোচনা আছে

আল্লাল আল-ফাসি-এর মাক্বাসিদ আশ-শরীয়াহ ওয়া মাকারিমুহা গ্রন্থে। শরীয়াহর রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও ইতিহাস নিয়ে চমৎকার আলোচনা পাবেন ড. হাকিম আল- মুতা'ইরির লেখাতেও। যেমন তার গ্রন্থ মাইলস্টোন্স অফ দা গাইডেড স্টেট।

শরীয়াহ অনুসরণ করা, বাস্তবায়ন করা আমাদের ওপর আবশ্যিক। কিন্তু এটা আল্লাহ - এর রাহমাহ যে, কেবল বিশ্বাস আর মহান আল্লাহ-এর বড়ত্বের ওপর নির্ভর করে শরীয়াহর শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেয়ার মতো অবস্থায় তিনি আমাদের রাখেননি; বরং শরীয়াহর সৌন্দর্য ও কার্যকারিতা তিনি আমাদের সামনে স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন। আমাদের দেখিয়েছেন এ ব্যবস্থার

শ্রেষ্ঠত্ব ও উপকারিতা। শরীয়াহ নিছক তত্ত্ব হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং রাজত্ব করেছে বাস্তবতা হিসেবে। আর এ শরীয়াহ তো তত্ত্ব হবার জন্য নাযিলও হয়নি। নবুওয়্যাতের যুগ, খুলাফায়ে রাশেদীনের শাসন, সালাফ সালেহিনের সময়ে এবং তারপর হাজার বছরের বেশি সময় ধরে শরীয়াহর সাফল্যের উদাহরণ আমাদের সামনে আছে।

এ ক্ষেত্রে খুলাফায়ে রাশেদীনের ইতিহাস নিয়ে ড. আলি আস-সাল্লাবির বইগুলো দ্রষ্টব্য। এ বইগুলো পড়লে পাঠক বুঝতে পারবেন, শরীয়াহ শাসনের অধীনে থাকা কীভাবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। কীভাবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বয়ে আনে রাহমাহর স্পর্শ। তবে বলাই বাহুল্য এ নিয়ে আরও অনেক গবেষণা, পরীক্ষা ও বাস্তবায়নের কাজ পড়ে আছে।

ভুল ধারণা: ৩

শরীয়াহ, আর শরীয়াহর প্রয়োগে ভুল বা বিচ্যুতির মধ্যে পার্থক্য বুঝতে না পারা।

মুসলিম শাসকদের ভুল বা বিচ্যুতির অনেক উদাহরণ ইতিহাসে পাওয়া যায়। সমস্যা হলো আমরা অনেকেই ধরে নিই, এই ভুলগুলোর উৎস বা কারণ হলো শরীয়াহ। অথবা আমরা ধরে নিই, এই ভুল বা বিচ্যুতিগুলো ঠেকানোর কোনো ব্যবস্থা শরীয়াহতে নেই।
যেমন আমরা ধরে নিই, শরীয়াহ শাসনের ক্ষেত্রে শাসক যুলুম করতে পারে।

ইতিহাসে এমন আমরা এমন অনেক শাসক দেখেছি, যারা মোটাদাগে, সামগ্রিকভাবে শরীয়াহ দিয়ে শাসন করেছেন। মুসলিমদের স্বার্থ এবং সম্মান রক্ষা করেছেন, মুসলিমদের শত্রুদের তটস্থ করেছেন এবং জিহাদের মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলিমদের ভূমি বিস্তৃত করেছেন। কিন্তু তাদের এসব অবদান সত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন যুলুমের অভিযোগ আছে।

সমস্যা হলো, আমরা ধরে নিচ্ছি এই যুলুম শরীয়াহ শাসনের ফলাফল। কিন্তু আসলে এগুলো হলো শরীয়াহ থেকে তাদের বিচ্যুতির ফল।

এ ধরনের শাসকদের ব্যাপারে আমাদের আচরণ কেমন হবে?

শরীয়াহ আমাদের ভারসাম্য রক্ষা করতে বলে।

একদিকে মুসলিমদের ঐক্য রক্ষা, শত্রুদের মোকাবিলায় শক্তি মজবুত রাখা জরুরি।

অন্যদিকে শাসকের যুলুমের সমর্থন না করা, একে অনুমোদন না দেয়া, তাদের আগ্রাসনের নিন্দা করা এবং আগ্রাসন ও যুলুম থেকে তাদের বিরত রাখার চেষ্টা করাও জরুরি।

শরীয়াহ আমাদের এ দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য করার শিক্ষা দেয়।

এ তো গেল ওই শাসকদের কথা, যারা সামগ্রিকভাবে ইসলাম দিয়ে শাসন করা সত্ত্বে বিভিন্ন সময় যুলুম করছেন।

অন্যদিকে আজ আমরা যেসব স্বৈরাচারী শাসক দেখি, তাদের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্কই নেই। এই শাসকেরা বরং শরীয়াহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ক্রুসেইডার ও যায়োনিস্টদের সাথে হাত মিলিয়েছে এবং ইসলামের নাম ও নিশানা মিটিয়ে দিতে চাচ্ছে। এদের অনুগত দরবারি কিছু আলিম আছে। শাসকদের গদি রক্ষার জন্যে এই দরবারি আলিমরা সাধারণ মানুষের সামনে কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা তুলে ধরে। শরীয়াহর বিভিন্ন দলীলকে আউট অফ কন্টেক্সট ও বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে। ক্ষমতার গোলামি করা এই আলিমরা ইসলামের অপব্যাখ্যা করে আজকের শাসকদের বৈধতা তৈরি করতে চায়।

এর প্রতিক্রিয়ায় দেখা যায়, কিছু মানুষ স্বৈরাচারী শাসকদের কার্যকলাপ আর আগেকার মুসলিম শাসকদের যুলুমের উদাহরণ টেনে এনে শরীয়াহর ওপর দোষারোপ করে। আর সমাধান হিসেবে বলে গণতন্ত্রের কথা।

কিন্তু শাসকের একনায়কতন্ত্র এবং স্বেচ্ছাচার শরীয়াহতে বৈধ না। শরীয়াহর সাথে এর কোনো সম্পর্কও নেই; বরং মুসলিম হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হলো শরীয়াহর নির্দেশিত পন্থায় এর প্রতিবাদ করা এবং শাসককে যুলুম থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করা।

আর শাসকের যুলুম শুধু শরীয়াহ শাসনের ক্ষেত্রে হয় না। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্রসহ সব ধরনের শাসন ব্যবস্থায় এটা হয়ে থাকে; বরং যে ব্যবস্থার কথা বলে আজ শরীয়াহর সমালোচনা করা হয়, সেখানে যুলুম হয় আরও বেশি। সারা দুনিয়ার নব্বই শতাংশের বেশি সম্পদ আজ অল্প

কিছু মানুষ আর কর্পোরেশানের হাতে কুক্ষিগত হয়ে আছে। এটা হলো পুঁজিবাদের ফলাফল। এর চেয়ে বড় যুলুম আর কী হতে পারে? এই অল্প কিছু লোক নিয়ন্ত্রণ করছে দুনিয়ার সব বড় বড় মিডিয়া। প্রপাগ্যান্ডার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের ব্রেইনওয়াশ করছে। নিজেদের ইচ্ছেমতো জনমত তৈরি করে দিয়ে লাগিয়ে দিচ্ছে যুদ্ধের আগুন। সাধারণ মানুষের লাশের ওপর দাঁড়িয়ে টাকা গুনছে অস্ত্র বিক্রেতা, তেল কোম্পানি আর মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলো। মিডিয়া আর পপ কালচারের মাধ্যমে ওরা উস্কে দিচ্ছে অনৈতিকতা, অধঃপতন এবং পশুর মতো যৌনতা। ধ্বংস করছে মানুষের দুনিয়া আর আখিরাতকে।

কীভাবে এই সীমাহীন যুলুম আল্লাহ-এর নাযিল করা হিদায়াতের বিকল্প হতে পারে?

ভুল ধারণা: ৪

শরীয়াহতে দুনিয়াবি বিষয়গুলোকে তেমন গুরুত্ব দেয়া হয় না। তাই শরীয়াহর অধীনে দৈনন্দিন জীবন অনেক কঠিন হয়ে যাবে।

আমরা প্রায়ই অনেককে বলতে শুনি-লোকেরা যতদিন শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার দাবি না তুলে কেবল দুনিয়াবি বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকবে ততদিন তাদের অবস্থার উন্নতি হবে না।

সাধারণ মানুষ যে মনে করে শরীয়াহতে দুনিয়াবি বিষয়গুলো গুরুত্ব দেয়া হয় না, তার পেছনে এ ধরনের কথার একটা বড় ভূমিকা আছে।

শরীয়াহ অথবা দুনিয়া, বিষয়টাকে এভাবে উপস্থাপন করা উচিত না। মহান আল্লাহ * এভাবে বিষয়টি উপস্থাপন করেননি। এ ধরনের বক্তব্যের কারণে মানুষ ভাবতে শুরু করে যে শরীয়াহ শাসন দিয়ে মুসলিমদের বর্তমান অবস্থা কিংবা জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করা সম্ভব না। আর এমন অবস্থায়, সুন্দর জীবনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে হাজির হয় আল্লাহর শত্রুরা। স্বাভাবিকভাবেই অনেক মুসলিম তখন তাদের ফাঁদে পা দেয়।

আল্লাহর শরীয়াহ উদ্দেশ্য কি মানুষকে দুনিয়ার শাসকদের গোলামি থেকে মুক্ত করা না? মানুষের প্রয়োজনগুলো পূর্ণ করা, তাদের সম্পদ লুট হওয়া থেকে রক্ষা করার মাধ্যমে তাদের স্বীয় রবের ইবাদতে মনোনিবেশের সুযোগ দেয়া কি শরীয়াহর উদ্দেশ্য না? শরীয়াহ কি

দুনিয়াবি জীবনের সংকীর্ণতা ও যুলুম থেকে মুক্ত করে মানুষকে আখিরাতের প্রাচুর্য ও বিশালতার সাথে যুক্ত করে দেয় না?

যেমনটা সাহাবী রিবি' ইবনু আমর বলেছিলেন-

আল্লাহ আমাদের পাঠিয়েছেন, মানুষকে সৃষ্টির দাসত্ব থেকে স্রষ্টার দাসত্বে নিয়ে আসতে। সমস্ত বাতিল ধর্মের জুলুম থেকে মানুষকে মুক্ত করে দ্বীন ইসলামের ইনসাফের দিকে আনতে। এবং দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে দুনিয়া ও আখিরাতের প্রশস্ততার দিকে নিয়ে যেতে।]

ভুল ধারণা: ৫

শরীয়াহকে সামগ্রিকভাবে না দেখে কেবল রাষ্ট্রীয় শাসনের সাথে সম্পর্কিত মনে করা।

অনেকে শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটা এমনভাবে উপস্থাপন করেন যেন এটা কেবল রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কিছু পরিবর্তনের ব্যাপার। অল্প কিছু পদ্ধতি বদলে নিয়ে কিছু অদল- বদল করলেই শরীয়াহ শাসন প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবে।

কিন্তু বাস্তবতা হলো, যে কলুষিত জীবনব্যবস্থার অধীনে আমরা বর্তমানে আছি, শরীয়াহর কাজ হলো একে আমূল বদলে দিয়ে ইসলামের ভিত্তির ওপর আমাদের জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করা। যেন পুঁজিবাদ, ভোগবাদ, বস্তুবাদের মোহ আমাদের মধ্যে আর না থাকে। যাতে যন্ত্রের মতো কেবল লাভ-লোকসান আর কার্যকারণের হিসেব কষতে কষতে আমাদের জীবন কেটে না যায়। কারণ, শরীয়াহ একটি স্বতন্ত্র এবং নিখুঁত ব্যবস্থা। এটি এমন এক প্রাসাদ, যার কোনো মেরামতের কিংবা সংস্কারের প্রয়োজন নেই। এই প্রাসাদ কোনো ত্রুটিপূর্ণ ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠেনি।

ভুল ধারণা: ৬

শত্রুর মুখোমুখি হবার আশঙ্কায় শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা বাদ দেয়া।

শরীয়াহ ব্যাপারে ব্যাপকভাবে প্রচলিত আরেকটি ভুল ধারণা হলো, আজকের বিশ্বব্যবস্থা কোনোভাবেই শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা করতে দেবে না। তারা সর্বশক্তি দিয়ে এর বিরোধিতা করবে।

তাই এ চেষ্টা বাদ দেয়াই ভালো। কাফিরদের মোকাবিলা করা সম্ভব না। আমরা বরং অন্য কোনো উপায়ে মুসলিমদের স্বাধীন আর মুক্ত করার চেষ্টায় মনোযোগ দিই।

যারা এমনটা মনে করেন তাদের বলছি-হে আমার ভাই, শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা করার মানে হলো, এই বিশ্বব্যবস্থার গোলামি থেকে মুক্তি। আজ পৃথিবীর কোনো অঞ্চলে শরীয়াহ প্রতিষ্ঠিত হবার তাৎপর্য কেমন হবে জানেন?

মনে করুন, পৃথিবীর সব মানুষ বিশাল বিশাল জেলখানায় বন্দী। এমন অবস্থায় সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে ভয়ংকর জেল ভেঙে একসাথে কয়েক কোটি মানুষ বেরিয়ে গেল। বাকিদের ওপর এর প্রভাব কেমন হবে? এটা বাকি বন্দীদের উজ্জীবিত করবে। তাদের উদ্বুদ্ধ করবে গোলামির শেকল ছিঁড়ে ফেলতে।

আজকে শরীয়াহর প্রতিষ্ঠা পুরো পৃথিবীর মানুষের জন্য এমনই এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। যারা গোলামির বাস্তবতাকে এখনো চেনেনি, তারাও তখন বুঝতে পারবে কীভাবে পুঁজিবাদ তাদের গোলাম বানিয়ে রেখেছে।

হ্যাঁ, এ মুক্তির দাম চড়া। এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই চড়া দামের ভয়ে জীবনভর শরীয়াহর বিকল্প খুঁজে বেড়িয়ে কোন লাভ হবে না। এ বিকল্পগুলো হলো কারাগারের অলিগলিতে বন্দীর নিষ্ফল ঘোরাঘুরির মতো। এসব করে অল্প কিছু সময়ের জন্য সূর্যের আলো দেখা যাবে, হয়তো পাওয়া যাবে দু-এক মুঠো ভালো খাবারের সন্ধান কিংবা মিলবে ঠান্ডা পানির খোঁজ। কিন্তু বন্দিত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না।

কিন্তু শরীয়াহর তরবারির আঘাতে যখন কারাগারের শিক ভেঙে ফেলা হবে, তখনই আসবে সত্যিকারের মর্যাদা, সম্মান, মুক্তি।

দশকের পর দশক গোলামির শেকল বয়ে চলা উম্মাহ কি রক্তের দাম না মিটিয়েই মুক্তি পাবে? আদৌ কি তা সম্ভব? লড়াই, আঘাত আর আত্মত্যাগ ছাড়া কি বন্দী কখনো অন্ধকূপ থেকে বেরোতে পারে? লোহার শিক ভাঙতে গেলে হাতে ব্যথা লাগা স্বাভাবিক। এ দাম যে চুকাতেই হবে। কিন্তু এই দাম, এই যখম, এই রক্তের বিনিময়ে আমরা কী পাচ্ছি?

দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মান এবং সঠিক পথের দিশা।

সেই মুক্তির পথ ও পদ্ধতি কী হবে, সেটা একটা ভিন্ন আলোচনা। হয়তো আগামীতে সেই আলোচনার সুযোগ হবে। তবে আমার এই আলোচনার মূল লক্ষ্য ছিল দুটি বিষয়ে পাঠকের সামনে স্পষ্ট করা,

১) এমন কোনো আদর্শ অনুসরণ না করা, যা শরীয়াহর গুরুত্ব অস্বীকার করে, অথবা শরীয়াহকে বর্তমানে অপ্রাসঙ্গিক মনে করে। আর এর দ্বারা আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

২) কারাগারের অলিগলিতে সময় নষ্ট না করে, সব সময়, শক্তি আর প্রচেষ্টা ওই পথে উজাড় করে দিতে হবে, যে পথ আমাদের রবকে সন্তুষ্ট করে।
মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

...যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, আল্লাহ তার অন্তরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। [তরজমা, সূরা আত-তাগাবুন, ১১]

শারীয়াহ'ই জরুরত!

পৃথিবীতে সবাই শান্তি চায়। সবাই দুদণ্ড আরামে দিনাতিপাত করতে চায়। কিন্তু সবাই শান্তির দেখা পায় না। এ বিষয়ে আলোচনার কোনো অন্ত নেই। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক সকল অঙ্গনে সবার একটিই কথা-শান্তি আর শান্তি। কিন্তু কোন পথে শান্তি তা কেউ বুঝতে চায় না। জানতে চেষ্টা করে না, কোন নীতি অনুসরণ করলে শান্তি ফিরে আসবে। অথচ একটু দৃষ্টিপাত করলেই তারা বুঝতে পারত যে, পৃথিবীতে একমাত্র ইসলামই পারে মানুষের কাঙ্ক্ষিত শান্তি ফিরিয়ে দিতে। ইসলামের বার্তা প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমেই পরিবার, সমাজ, দেশ ও জাতি সকলেই সমানভাবে শান্তি, নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা অর্জন করতে পারবে এবং সকল প্রকার অশান্তি, অস্থিতিশীলতা, অকল্যাণ, অন্যায় ও দুঃখ-কষ্ট থেকে রক্ষা পাবে।

শান্তির বাস্তবতা ও মানবজীবনে তার প্রভাবের বিবেচনায় বিষয়টি দীর্ঘ আলোচনার দাবিদার। কারণ, এটি মানবতার মূল স্তম্ভ। এ ব্যাপারে অনেক বই লিপিবদ্ধ হয়েছে। জাতীয়,

আন্তর্জাতিক, সামাজিক, রাজনীতিক, সাংস্কৃতিক এবং বিভিন্ন বিজ্ঞাপনসহ প্রচারমাধ্যমে শান্তি বিষয়ক লেখালেখি প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু এত কিছু করার পরও মানুষ আজ শান্তির খোঁজে দিশেহারা।

ইসলাম আল্লাহপ্রদত্ত ধর্ম। শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য এবং সঠিক পথে জীবন পরিচালনার জন্য ইসলামি আদর্শের বিকল্প নেই। মানবতাকে অশান্তি, অন্ধকার, ভ্রষ্টতা, ভয়, উদ্বেগ ও দুর্ভোগ থেকে বের করে শান্তি, আলো, হিদায়াত, সাহসিকতা ও জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আল্লাহ তাআলা ইসলামের বিধান অবতীর্ণ করেছেন। এটাই হচ্ছে বাস্তবতা। প্রায়োগিক ও তাত্ত্বিকভাবে যার বিস্তারিত বিবরণ ইসলামি ইতিহাসে ভরপুর এবং সোনালি অতীত যার বাস্তবতায় সমুজ্জ্বল।

বড় আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, বর্তমানে কিছু নিকৃষ্ট প্রকৃতির লোককে মুখে শান্তির বুলি আওড়াতে দেখা যায়। তারা কিনা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শান্তির ধ্বজাধারী। অথচ তারা পৃথিবীটাকে হত্যা-লুণ্ঠন ও নির্যাতনে জর্জরিত করে দিয়েছে। মাজলুম মানবতার কান্নার রোলে আজ পৃথিবীর আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। দুনিয়ার মানুষ যেন নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করতে পারে, ধ্বংস ও হত্যাযজ্ঞতা থেকে রক্ষা পায়; সে জন্য তারা বিশ্বকে তাদের কথিত শান্তির ডাকে সাড়া দিতে এবং তাদের মাথা থেকে যুদ্ধ-বিগ্রহের ভাবনা ঝেড়ে ফেলতে আহ্বান করে। বিভিন্ন গণমাধ্যম, প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া, বই-পুস্তকসহ সকল প্রচার মাধ্যমে দিন-রাত তারা তাদের মিথ্যা আশার বুলি প্রচার করে বেড়ায়।

নিঃসন্দেহে তাদের এসব আস্ফালন মিথ্যা চেঁচামেচি বৈ কিছু নয়। মূলত ওরা মানবতা ও শান্তির দুশমন। বাহ্যিকভাবে তারা পৃথিবীর মানুষদের প্রতি নিজেদের দয়ার্দ্র বলে প্রকাশ করতে চায় এবং বিশ্বের আনাচে-কানাচে শান্তি ও নিরাপত্তা পৌঁছে দেওয়ার দাবি করে। কিন্তু প্রকৃত বাস্তবতা সম্পূর্ণ এর বিপরীত। এই মিথ্যুক, ধোঁকাবাজরা প্রকৃত বাস্তবতা মানুষের নিকট গোপন রেখে নিজেদেরকে শান্তি ও কল্যাণের বন্ধু বলে প্রকাশ করে। তাদের স্বভাব-চরিত্র, মন-মস্তিষ্ক ভ্রান্ত মতবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যা যুগ যুগ ধরে মানবতাকে চুষে খাচ্ছে। জুলুম, মিথ্যা, ষড়যন্ত্র ও ধোঁকায় জাতিকে পিষে মারছে। যাদের মাঝে কেবল আমিত্ব, অহংকার ও দাম্ভিকতা পূর্ণ হয়ে আছে। তাদের এসব ভণ্ডামি ও মিথ্যাচারকে জানার জন্য তেমন কোনো গবেষণা করার প্রয়োজন পড়ে না; বরং বর্তমান সময়ে আমাদের বাস্তবিক অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা তা স্পষ্টরূপে বুঝতে পারছি। তাদের ধোঁকাবাজির যেই চিত্র আমাদের মেধায় অঙ্কিত

হয়, তা থেকেও আমরা কিছুটা ধারণা নিতে পারব। তাদের ইতিহাস সাধারণ জনগণের সাথে শান্তির নামে ধোঁকাবাজিতে ভরপুর।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, এসব ধোঁকাবাজ, প্রতারক, পাপিষ্ঠ ও মিথ করা শান্তি ও নিরাপত্তার ধর্ম ইসলামকে সাহায্য করার আশ্বাস দেয়। এরা শান্তির বাণী শুনিয়ে ইসলামের প্রতি দরদ দেখাতে ছুটে আসে; অথচ এদের অন্তর ইসলামের প্রতি ঘৃণা, বিদ্বেষ, শত্রুতা ও হিংসায় পরিপূর্ণ। এদের প্রথম শ্রেণিতে রয়েছে উপনিবেশবাদী, খ্রিষ্টবাদী ক্রুসেডার ও কমিউনিস্ট।

ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ আমাদের শেখায় দুনিয়া কীভাবে অর্জন করতে হবে,কীভাবে নিজেকে সর্বোচ্চ শান্তিতে রাখা যাবে সেটা হোক অন্যের ক্ষতি করে হলেও!

ইসলাম ভাববাদ ও বস্তুবাদের সম্মিলনে একটা ভারসাম্যপূর্ণ, মধ্যমপন্থী জীবন দর্শন দেয় যেখানে সঞ্চয় ও ভোগেরও নিয়ম আছে সাথে আত্মত্যাগের কথাও বলা আছে।ইসলাম আমাদের বিলাসিতা ত্যাগে উৎসাহিত করে মানবতা ও নৈতিকতা শেখায়। জীবনকে পরিচালনা করার জন্য ইসলাম কিছু মূলনীতি দিয়ে দেয়। কোনটা বৈধ, কোনটা অবৈধ, কোনটা হারাম, কোনটা হালাল।ইসলাম আমাদের জন্য ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে।কিন্তু সেক্যুলার আইনে শান্তি,সুষ্ঠ ন্যায়বিচারের কথা বলা হলেও আজ আমরা চারিদিকে শুধু দুর্নীতি,অন্যায়-অত্যাচারের ছড়াছড়িই দেখছি।কেউ তার ন্যায্য অধিকারটুকু ফিরে পাচ্ছেনা।কর্মক্ষেত্র থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত শুধু দুর্নীতি আর দুর্নীতি! অফিসে কর্মচারী দুর্নীতি করে ঠিকই প্রমোশন পেয়ে যাচ্ছে!ঘুষ দিয়ে যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও শিক্ষার্থী ভর্তি হচ্ছে পাবলিক ভার্সিটিতে!কেউ বা হয়ে যাচ্ছে ডাক্তার!যাকাতের প্রসার না ঘটিয়ে ধনী হচ্ছে আরও ধনী,আর গরিব হচ্ছে আরও গরিব!রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সংস্কারের নামে জনগণের কাছ থেকে মোটা অংকে টাকা নিয়ে কিংবা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করে হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে হাজার হাজার কোটি টাকা!কিন্তু সুষ্ঠ সংস্কার হচ্ছেনা।যতটুকুই হচ্ছে শুধুই যেনো সান্ত্বনা দেওয়া,শুধুই যেনো চোখ দেখানো!শিক্ষাব্যবস্থার নামে শেখানো হচ্ছে সমকামিতা ও ইসলামবিদ্বেষ!

সেক্যুলার রাষ্ট্রকাঠামোতে এতো কঠোর আইন,নজরদারি রাখার পর ও কেনো মানুষ নৈতিকতা শিখছে না?জবাবদিহিতার ভয় করছেনা?অপরাধপ্রবণতা কেনো দিনকে দিন বেড়েই চলছে?

কারণ শারীয়াহ নেই!আল্লাহর ভয় নেই!আল্লাহর আইন দিয়ে পরিচালনা না করে যদি মানবরচিত আইন প্রয়োগ করা হয় তখন হাজার হাজার সিসিটিভি ক্যামেরা ও গোয়ান্দা রেখেও মানুষের মধ্যে নৈতিকতা বাড়বেনা!সুযোগ পেলেই হাই সিকিউরিটি থাকা সত্ত্বেও আপনার ব্যাংক একাউন্ট হ্যাক হয়ে যাবে।এই হলো বাস্তবতা।

তাই শারীয়াহ''র কাছে আপনার ফিরতেই হবে।শারীয়াহ আইন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করলে আপনার হাজার হাজার সিসিটিভি ক্যামেরার ও প্রয়োজন নেই।কারণ আল্লাহর ভয় যখন বান্দার মধ্যে ঢুকে যাবে তখন সে গোপনেও অন্যায় করতে ভয় পাবে।

যদি একে কল্প কথায় মনে হয় তবে শারীয়াহ আইন প্রয়োগ করেই দেখুন না!বহু নিয়ম তো প্রয়োগ করেছেন,প্রয়োজনে নিয়মে পরিবর্তন ও এনেছেন!তাও তো পরিপূর্ণ সফলতা, ন্যায়বিচারের দেখা পাওয়া যাচ্ছেনা।ইসলামবিদ্বেষকে একটু একপাশে রেখে ভাবতে শিখুন।

চলুন একটা পর্যালোচনা করি,সেক্যুলার আইন প্রতিষ্ঠা করলে কেমন উন্নতি হয় আর শারীয়াহ আইন প্রতিষ্ঠিত করলে কেমন উন্নতি হয়!নিম্নে একটা জরিপ দেওয়া হলো যেখানে সমস্যা অনুযায়ী ধর্মহীন মানুষরা কী করে এবং ধার্মিক ও মুসলিম কী করে তা বুঝানো হয়েছে:

★সমস্যা - মদপান

•আমেরিকায় এক গবেষণায় এসেছে: প্রতি বছর সেদেশে ৩০ লাখ ভায়োলেন্ট ক্রাইম হয়।১৯। সেই কয়েদীদের ৪০%ই অপরাধের টাইমে মদ্যপ ছিল। অর্থাৎ ঐ সময় সুস্থ বিবেক থাকলে তারা অপরাধ করতো না।

•প্রতি বছর আমেরিকায় দেড় লাখ লোক। আর সারা দুনিয়ায় ৩০ লাখ মানুষ মারা যায় সরাসরি মদপানের দরুন।।

•মায়ের এলকোহল পানে বাচ্চাদের যে ডিফেক্ট হয় সেগুলোকে একসাথে বলে (Fetal Alcohol Spectrum Disorders). আমেরিকায় বছরে ৪০ হাজার শিশু এই সমস্যা নিয়ে জন্ম নেয়। এই প্রজন্মকে রক্ষা করা যেত।

• অতিরিক্ত মদপানের দরুন আমেরিকার আর্থিক ক্ষতি ২০০৬ সালে ছিল ২২৩ বিলিয়ন ডলার। যার ৭২% ক্ষতি হয়েছে কর্মদক্ষতা কমে গিয়ে, ১১% স্বাস্থ্যজনিত খরচে, ৯.৪% হয়েছে অপরাধের বিচার করতে গিয়ে।

ধর্মহীনতা/অধার্মিকতা

•অধার্মিক মানুষের মদপানের প্রবণতা বেশি। সবচেয়ে বেশি যারা নিজেদের এগনোস্টিক দাবি করে। (৭৬%)।

• ৭% অধার্মিক মদপানকে খারাপ মনে করে। মাত্র ১% নাস্তিক একে খারাপ মনে করে।

ধার্মিকতা

•ধার্মিক মানুষের মদপানের প্রবণতা কম।

•এলকোহল বিহেভিয়ারের উপর ধর্মীয় কমিটমেন্টের ইউনিক প্রভাব আছে। (Burkett and White, 1974).

ইসলাম

•মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোয় মাথাপিছু মদপান সর্বনিম্ন (<2.5 pure alcohol liters) বা প্রায় সর্বনিম্ন।

•ইউরোপীয়দের মাঝে গবেষণায়ও এসেছে, মুসলিম দেশ থেকে আসা ইমিগ্রান্টদের মদপানের প্রবণতা কম।

•এমনকি তাদের এই বিরত থাকার প্রবণতা পুরো স্কুলে মদপানের প্রবণতাকে প্রভাবিত করেছে।

★সমস্যা - ব্যভিচার

•ব্যভিচারের কারণে ৪০% বিবাহিত পরিবার ভেঙে যাচ্ছে। আমেরিকার ৫০% ১ম বিয়ে বিচ্ছেদে পর্যবসিত হয় (Bramlett & Mosher, 2001)। রিসার্চ জানাচ্ছে, মোট ডিভোর্সীর ৪২%- এরই বিয়ে থাকা অবস্থায় ব্যভিচারের ইতিহাস আছে (Janus, 1993)

•আর ব্যভিচারের ভিত্তিতে গঠিত পরিবারের (লিভটুগেদার) ৬৫%-ই ভেঙে যাচ্ছে। বিবাহিত পরিবারের চেয়ে এদের আলাদা হয়ে যাবার সম্ভাবনা ৪ গুণ বেশি। (Osborne, 2007)

• ফলে...

আমেরিকায় মোট জন্মের ৪১% শিশু এই বিয়ে ছাড়া বাবা- মায়ের সন্তান। ২০১৬ সালে ইউরোপ-আমেরিকার অর্ধেক শিশু বিবাহ-ছাড়া (out-of-wedlock) জন্ম।[১০]

•আমেরিকার ৫০% শিশু বাপ-মায়ের ডিভোর্স দেখে। এই ৫০%- এর ৫০% আবার বাপ-মায়ের ২য় বিয়েও ভাঙতে দেখে। বৃটেনে এক-তৃতীয়াংশ বাচ্চা ব্রোকেন ফ্যামিলির। আর সিঙ্গেল প্যারেন্ট বাচ্চাদের।

- তাদের স্বাস্থ্য ২০% কম।

-আচরণগত সমস্যা থাকে বেশি। সাইকোলজিস্টের সাহায্য প্রয়োজন পড়ে ৩০০% বেশি।

-আত্মহত্যা-প্রচেষ্টার সম্ভাবনা দ্বিগুণ।

-স্কুলে মারপিট ও চুরিচামারিতে লিপ্ত হবার সম্ভাবনা অনেক অনেক বেশি। সিঙ্গেল মা-বাবা ও লিভ- টুগেদারের বাচ্চাদের ৪২%-ই স্কুলে মারপিট করে।

-স্কুলে রেজাল্ট খারাপ হয় বেশি।

- স্কুল থেকে ঝরে পড়ার সম্ভাবনা দ্বিগুণ।

-কারাগারে যাবার সম্ভাবনা নর্মাল পরিবারের চেয়ে ১২ গুণ বেশি। ১৯২৯

- ভবিষ্যতে কিশোর অপরাধ ও প্রাপ্তপবয়স্ক অপরাধের প্রবণতা (Farrington, 1990)

ধর্মহীতা/অধার্মিকতা

•২০১৯ সালের এক ইনফিডেলিটি সার্ভেতে এসেছে, ধর্মকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করার সাথে ব্যভিচার কমার সম্পর্ক আছে। ব্যভিচারে লিপ্ত হবার সম্ভাবনা:

• ধর্ম খুবই গুরুত্বপূর্ণ: ৯%

•ধর্ম কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ: ১৯%

•ধর্ম তেমন জরুরি না ২৩%

•ধর্ম একেবারেই জরুরি না: ১৫%

ধার্মিকতা

• ধার্মিকতা যত বেশি, infidelity তত কম। (Fincham & May, 2017.)

•যত বেশি ধার্মিক তত ব্যভিচারের প্রতি নেগেটিভ এটিচ্যুড (Patrick ২০১৩)

ইসলাম

• ৬ লাখ ২০ হাজার মানুষের ডেটা থেকে Amy Adamczyk (Associate Professor of Sociology at John Jay College of Criminal Justice) পেয়েছেন: এভারেজে মুসলিমরা বিবাহবহির্ভূত সেক্সে জড়ায় সবচেয়ে কম। এরপর হিন্দুরা।(Adamczyk,২০১২)

★সমস্যা - জুয়া

•৫৩টা রিসার্চ রিভিউ করে ব্রিটেনের সরকারি সাইট একটি পেপার পাবলিশ করে।

• কোনো এলাকায় যত জুয়ার দোকান বেশি, সে এলাকার লোক দেউলিয়া ও গৃহহীন হয় বেশি। যা আবার অন্যান্য ক্ষতির কারণ: দাম্পত্য কলহ, মানসিক ও শারীরিক অসুখবিসুখ, অপরাধ ইত্যাদি।

• জুয়াড়িদের মাঝে পারিবারিক বন্ধন, দায়িত্ববোধ কম। সঙ্গীকে নির্যাতন, ডিভোর্স বেশি।

• জুয়াড়িদের স্বাভাবিক বার্ধক্যে উপনীত হয়ে মৃত্যু কম, আত্মহত্যার হার বেশি। তারা তো বটেই, এমনকি তাদের স্ত্রী-সঙ্গীদের মাঝেও মানসিক সমস্যার হার উচ্চ।

• জুয়াড়িদের মাঝে ড্রাগ এবিউজ ও এলকোহল আসক্তির হার বেশি।

• চুরি, ড্রাগব্যবসার হার বেশি।

• শুধু ব্রিটেনে জুয়ার ফলে অর্থনৈতিক দায় ১.২৭ বিলিয়ন ডলার (২০১৯-২০ সালে)

ধার্মিকতা

•প্রকাশ্য ধার্মিকতা যত বেশি, জুয়া খেলার হার তত কম। ধর্মকে যে যত জরুরি মনে করে, তার জুয়ায় অংশগ্রহণের হার তত কম। (Desmond Lam ২০০৬)

•কমপক্ষে সাপ্তাহিক ধর্মসভায় যেসব কিশোর যোগ দেয় তাদের মাঝে জীবনে একবারও জুয়ার প্রবণতা কম।

★সমস্যা - দান

ধর্মহীনতা/অধার্মিক

• অধার্মিকরা ব্র্যান্ডের প্রডাক্টের গুরুত্ব বেশি দেয়।
•ধার্মিকেরা আবেগ থেকে পণ্য কেনে কম (impulse purchase)। পণ্য ক্রয়ে খরচ করে কম।
•আগামী ৩ মাসে দান করবেন কি না, এই প্রশ্নে ৭৬% ধার্মিক হ্যাঁ বলেছে, অধার্মিকদের মাঝে ৫৬%।
• সেক্যুলারদের চেয়ে ধার্মিকদের দানের প্রবণতা ২৫% বেশি। স্বেচ্ছাসেবার প্রবণতা ২৩% বেশি।[১৯]

ইসলাম

• বৃটেনে মুসলিমরা অন্যান্যদের চেয়ে বেশি দান-খয়রাত করে।।
• আমেরিকায় মুসলিমরা বছরে বেশি দান করে অন্যান্যদের চেয়ে। ২০২০ সালে অন্যান্যরা যেখানে $১৯০৬-এ, সেখানে মুসলিমরা গড়ে $৩২০০। (Siddiqui, ২০২১)

★সমস্যা - ডিপ্রেশন ও আত্মহত্যা

• প্রতি বছর ৭ লাখ মানুষ আত্মহত্যা করে।
•১৫-১৯ বছর বয়েসীদের মৃত্যুর ৪র্থ •প্রধান কারণ আত্মহত্যা।।।
•ডিপ্রেশনে ভোগে দুনিয়ার ৫% মানুষ। প্রায় ২৮০ মিলিয়ন মানুষ। যাদের ৫-৮% আত্মহত্যা করে বসে।

ধর্মহীন/অধার্মিক

•৩৭১ জন ডিপ্রেশনের রোগীদের মাঝে ধর্মহীন রোগীরা বেশি আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে (Dervic, Oquendo et al. ২০০৪, ২০০৬, ২০১১)
• ৭০০ জন এডভান্সড ক্যান্সার রোগীর মাঝে গবেষণায় এসেছে, ধর্মহীন রোগিদের মাঝে আত্মহত্যার চিন্তা এসেছে বেশি (Spencer, Ray et al. ২০১২)
•অস্ট্রিয়াতে ৩৫৮ জন সমকামীর মাঝে দেখা গেছে, ধর্মহীনরা আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে বেশি (Kralovec, Fartacek et al. ২০১২)

• ২৬৩১টি আত্মহত্যাচেষ্টার ইতিহাস নিয়ে গবেষণায় এসেছে, ধর্মহীনেরা বেশি সিরিয়াস (clear intentionality, high case-fatality method, or serious injury) চেষ্টা করেছে (Carli, Mandelli et al. ২০১৪)

ধার্মিকতা

•২৪৮ জন ডিপ্রেশনের রোগীর মাঝে রিসার্চে এসেছে, যারা ধর্মীয় সমাবেশে বেশি যায়, তাদের মাঝে আত্মহত্যার চিন্তা স্কোর কমে এসেছে, যত বার বার গেছে, তত কমে এসেছে (Rushing, Corsentino et al. 2013)1

•৪৫৪ জন মনোবিজ্ঞান ছাত্রের মাঝে রিসার্চেই একই ফল (Robins and Fiske 2009)

•একই ফল এসেছে ৩৬৯৮৪ জনের উপর কানাডীয় রিসার্চে (Rasic, Belik et al.2009)

ইসলাম

•মুসলিমপ্রধান দেশগুলোতে আত্মহত্যার হার লাগাতারভাবে কম। (Lester ২০০৬, Klomek ২০১৬, Mirhashemi ২০১৬, Snowdon ২০২০)।

•অন্যান্য ধর্মগুলোর চেয়ে মুসলিমদের মাঝে আত্মহত্যাকে সমাধান হিসেবে মেনে নেবার মানসিকতা কম। (Saiz ২০২১)

রেফারেন্স:

•National Council on Alcoholism and Drug Dependence, www.sasc-dbq.org

•Alcohol-Related Violence: Prevention and Treatment, edited by Mary McMurran [15% of robberies, 63% of intimate partner violence incidents, 37% of sexual assaults, 45-46% of physical assaults and 40-45% of homicides (Greenfeld & Henneberg, 2001)]

•Deaths from Excessive Alcohol Use in the United States, CDC
Alcohol, 9 May 2022, WHO

•Fetal Alcohol Spectrum Disorders: FAQs of Parents & Families, Vincent C. Smith, MD, MPH, FAAP & Renee Turchi, MD, MPH, FAAP, 8/20/2019, Fetal Alcohol Spectrum Disorders Program, American Academy of Pediatrics

•Bouchery, E. E., Harwood, H. J., Sacks, J. J., Simon, C. J., & Brewer, R. D. (2011). Economic costs of excessive alcohol consumption in the U.S., 2006. American journal of preventive medicine, 41(5), 516-524.

•Pew Research Center, Americans' drinking habits vary by faith, MARCH 6, 2019

•Amundsen, Rossow, & Skurtveit., 2005; Bradby & Williams, 2006; Pedersen & Kolstad,2000; van Tubergen & Poortman, 2010

•Amundsen et al., 2005; van Tubergen & Poortman, 2010

https://twitter.com/spectatorindex/status/988307897955237888?lang=en

>> STEVE DOUGHTY (2010). Nation of broken families: One in three children lives with a single-parent or with step mum or dad. THE DAILY MAIL. Study by Office for National Statistics

•Wisconsin Department of Health and Social Services, Division of Youth Services, 'Family Status of Delinquents in Juvenile Correctional Facilities in Wisconsin' (1994).

•Jeffrey Dew (associate professor in the School of Family Life at Brigham Young University) JUNE 2, 2021, Does Religiosity Protect Against Infidelity? Institute for Family Studies

•Gambling-related harms evidence review: summary, Updated 30 September 2021, www.gov.uk

•Mutti-Packer, S., Hodgins, D. C., Williams, R. J., & Konkoly Thege, B. (2017). The protective role of religiosity against problem gambling: findings from a five-year prospective study. BMC psychiatry, 17(1), 356.

•Nonreligious Masses? Marketing Science, 2010;

•R. Shachar, T. Erdem, K. M. Cutright, G. J. Fitzsimons. Brands: The Opiate of the

•Didem Kurt, J. Jeffrey Inman, and Francesca Gino (July 23, 2018), Shoppers with Strong Religious Beliefs Spend Less and Make Fewer Impulse Purchases, Harvard Business Publishing

•YouGov Profiles analysis. Religious people give more often but they also prioritise different causes. 2021

•Archur C. Brooks, "Religious Faith and Charitable Giving," Policy Review 121 (2003): 39. ২০ Muslims give more to charity than others, UK poll says [NBC News ২০১৩)
•Suicide, 17 June 2021, WHO
•Nordentoft M., Mortensen P.B., Pedersen C.B. Absolute risk of suicide after first hospital contact in mental disorder. Arch. Gen. Psychiatry, 2011;68:1058-1064.
•Lawrence, R. E., Oquendo, M. A., & Stanley, B. (2016). Religion and Suicide Risk: A Systematic Review. Archives of suicide research: official journal of the International Academy for Suicide Research, 20(1), 1-21.
•Lew, B., Lester, D., Kölves, K. et al. An analysis of age-standardized suicide rates in Muslim-majority countries.

সমগ্র বিশ্বে ইসলাম প্রচার-প্রসার করা

পৃথিবীর সব দিকে, প্রতিটি প্রান্তে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দেওয়া ইসলামি রাষ্ট্রের মৌলিক একটি দায়িত্ব। ইসলামি রাষ্ট্রের মহান একটি লক্ষ্য হলো, পৃথিবীর সব জায়গায় যেন ইসলামি শিক্ষা ছড়িয়ে পড়ে, মানুষ যেন এই মহান ধর্ম সম্পর্কে ভালো করে বুঝতে পারে এবং স্বেচ্ছায় আগ্রহী হয়ে ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করে।

ইসলাম হলো সমস্ত মানবজাতির ধর্ম। আল্লাহ তাআলা ইহজগতে মানবজাতির জন্য একটি পথ প্রদর্শক আলোকবর্তিকা নির্ধারণ করে রেখেছেন, যাতে মানুষ তার সঠিক গন্তব্যে পৌছতে পারে। তাদের জন্য দিয়েছেন একটি পূর্ণাঙ্গ স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনবিধান, যার ওপর নির্ভর করে মানুষ সর্বস্থানে সদা কল্যাণের সাথে থাকতে পারে। এই জীবনবিধান এতই বিস্তৃত, পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ যে, মানুষ যখন যেখানেই থাকুক, ইসলাম তার জন্য সমস্ত কল্যাণের বিষয় নিশ্চিত করবে, তাকে সমস্ত অকল্যাণ ও ক্ষতি থেকে রক্ষা করবে।

ইসলাম একটি স্বভাবজাত ধর্ম। আল্লাহ তাআলা সমস্ত মানবজাতির জন্য এই ধর্মকে মনোনীত করেছেন। তিনি এই ধর্মের প্রতিটি মূলনীতি, প্রতিটি বিধান ও প্রতিটি বিশ্বাসকে এতটাই বিস্তৃত ও বাস্তবসম্মত করে দিয়েছেন যে, সর্বযুগে সব ভাষা-বর্ণ-গোত্রের মানুষের জন্য ইসলামই একমাত্র উপযুক্ত ও পূর্ণাঙ্গ ধর্ম হিসাবে বিবেচিত হয়। আল্লাহ তাআলা সমস্ত

মানবজাতিকেই এই ধর্ম গ্রহণ ও পালনের জন্য আহ্বান করেছেন, যাতে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে সুখ-সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারে।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে কারিমে বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِين

'হে ইমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক পরিহার করো। নিশ্চিতরূপে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। '(সুরা আল-বাকারা: ২০৮)

ইসলাম সর্বজনীন ধর্ম। এই ধর্ম কোনো একটি নির্দিষ্ট জাতি বা শ্রেণির জন্য নয়; বরং এই ধর্ম সমগ্র মানবজাতির ধর্ম। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُون

'আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে পাঠিয়েছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। '(সুরা সাবা: ২৮)

ইসলাম প্রচার-প্রসারের বিভিন্ন মাধ্যম

ইসলাম প্রচারের এই গুরুদায়িত্ব পূর্ণাঙ্গভাবে পালন করা একমাত্র ইসলামি রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব। কারণ, রাষ্ট্রের বিভিন্ন ধরনের মাধ্যম ও সক্ষমতা থাকে। যা কোনো ব্যক্তির বা দলের পক্ষে কখনই অর্জন করা সম্ভব হয় না। সুতরাং কোনো একক ব্যক্তি কখনোই ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব সঠিক ও পূর্ণাঙ্গভাবে আদায় করতে সক্ষম হবে না। কারণ, এটি এমন এক দায়িত্ব, যা আদায় করতে বিভিন্ন উপকরণ ও মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। এ সকল উপকরণ কেবল রাষ্ট্রই জোগান দিতে পারে। ইসলাম প্রচারের জন্য এ সকল মাধ্যম ও উপকরণ রাষ্ট্র প্রথমে মুসলমানদের মধ্যে প্রয়োগ করবে, অতঃপর পৃথিবীর সকল দিকের সকল মানুষের মধ্যে তা প্রয়োগ করবে। ইসলাম প্রচারের মাধ্যম বিভিন্ন রকমের হতে পারে। আমরা এখানে কয়েকটি উল্লেখ করছি।

ক. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

যে সকল মাধ্যম ও উপকরণ গ্রহণ করে রাষ্ট্র ইসলামি আকিদা ও বিশ্বাসের সত্যতাকে মানুষের মন-মগজ ও চিন্তা-চেতনার মাঝে প্রসারিত করতে পারবে সেগুলোর একটি হলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। দেশের স্কুল, মাদরাসা, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থাকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে। রাষ্ট্র এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব নেবে। সঠিক ও দৃঢ় ইসলামি আকিদা বিশ্বাসের অধিকারী খাঁটি মুমিন-মুত্তাকি ও পরহেজগার শিক্ষিত লোকদের হাতে এ বিভাগের দায়িত্ব থাকবে। তারা তাদের ছাত্র ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে গড়ে তুলবেন সঠিক ইসলামি আকিদা-বিশ্বাস ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী খাঁটি মুমিন, মুত্তাকি, পরহেজগার, শিক্ষিত, বিনয়ী, নিঃস্বার্থ ও পরোপকারী হিসাবে।

কোনোভাবেই এমন প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ফাসিক, পথভ্রষ্ট, চরিত্রহীন নীচু লোকদের হাতে থাকা চলে না। এরা মানুষের অন্তরে নোংরা ও পচা চিন্তা- চেতনার বিষাক্ত বিষ ঢুকিয়ে দেবে। যার ফলে জাতি দুশ্চরিত্র ও স্বার্থপর একটি প্রজন্ম পাবে। সুতরাং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই ফাসিক, পথভ্রষ্ট ও চরিত্রহীন নীচু লোকদের থেকে মুক্ত রাখতে হবে। তা না হলে এ সকল পথভ্রষ্ট লোক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নোংরামি ও অশ্লীলতায় পূর্ণ করে দেবে।

খ. ইলেকট্রিক মিডিয়া

ইসলামি আদর্শ প্রচারের আরেকটি মাধ্যম হলো, ইলেকট্রিক মিডিয়া তথা রেডিও, টেলিভিশন, স্যাটেলাইট ইত্যাদি। এ সকল মাধ্যম থেকে মুসলিম উম্মাহর সকল সংবাদ প্রচারিত হবে। এতে ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতি ও চিন্তা-চেতনা ব্যাপকভাবে প্রসারিত হবে। এ সকল প্রচারমাধ্যম ব্যক্তি, সমাজ ও জাতি গঠনে অনেক কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

বর্তমানে প্রচারমাধ্যমগুলোতে কেবল বিকৃত সংবাদ, খারাপ গান-বাজনা, অশ্লীল নাটক-সিনেমা, বিকৃত অঙ্গভঙ্গি করে যুবক-যুবতিদের নাচ-গানই প্রচার হয়। এ সকল অশ্লীল প্রচারণা সমাজ ও জাতিকে ধ্বংসমুখে পতিত করে। নির্লজ্জ বেহায়া মেয়েগুলো যখন পর্দার সামনে খোলামেলা পোশাকে অশ্লীল অঙ্গিভঙ্গির সাথে তাদের দেহ প্রকাশ করে, তখন যুবক-বৃদ্ধ সকল পুরুষের মনের মধ্যে নোংরা চিন্তা-চেতনা ও অবৈধ বাসনা বাসা বাঁধতে থাকে, যা ধীরে ধীরে ভয়ংকর টর্নেডো হয়ে বিস্ফোরিত হয়। এর ধ্বংসাত্মক প্রভাব থেকে জাতিকে রক্ষা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের বর্তমান সমাজের অবস্থা তো আমাদের চোখের সামনেই বিদ্যমান।

গ. প্রিন্ট মিডিয়া

দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্র-পত্রিকাতে মুসলিম উম্মাহর সকল সংবাদ ও পর্যালোচনা প্রকাশিত হবে। বিভিন্ন সমস্যা ও ইসলামি দৃষ্টিতে তার সমাধানের কথা বলা হবে। জাতির সামনে ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতি ও চিন্তা-চেতনা তুলে ধরা হবে প্রকৃষ্ট ভাষায়। অশ্লীলতা ও ধ্বংসের হাত থেকে জাতিকে রক্ষা করে সুন্দর ও নিরাপদ জীবনের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।

সুস্থ ধারার পত্র-পত্রিকা ও বই-পুস্তক ব্যক্তি, সমাজ ও জাতি গঠনে অনেক বড় ভূমিকা রাখে। কিন্তু আফসোস ও দুঃখজনক হলো, বর্তমানে যে সকল পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে, তা মিথ্যা ও বিকৃত সংবাদে ভরা থাকে। এতে বিভিন্ন অশ্লীল ছবি ও লেখা প্রকাশিত হয়। এ সকল পত্র-পত্রিকা সর্বদা মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে বিভিন্ন সংবাদ প্রচার করে।

ঘ. বইপুস্তক প্রকাশ

রাষ্ট্র বিভিন্ন ধরনের ইসলামি ও ধর্মীয় বই, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই, কবিতা ও সাহিত্যের বই প্রকাশ করবে। যাতে ইসলামের সৌন্দর্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতি তুলে ধরা হবে। মুসলিম মনিষীদের আলোকিত জীবনের আলোকময় বর্ণনা থাকবে।

নিঃসন্দেহে একটি ভালো বই যেমন একজন মানুষকে ভ্রষ্টতার অন্ধকার থেকে বের করে হিদায়াতের আলোর দিকে নিয়ে যেতে পারে। আবার একটি খারাপ বই একজন মানুষকে ধ্বংসের চূড়ান্ত গহ্বরে নিক্ষেপ করতে পারে। সুতরাং রাষ্ট্র সর্বদা খেয়াল রাখবে যে, কোনোভাবেই যেন খারাপ, নোংরা ও চরিত্র-বিধ্বংসী কোনো বই প্রকাশ না হয়। চরিত্র-বিধ্বংসী কোনো বই যেন কারও হাতে না পৌঁছায়, তা নিশ্চিত করতে হবে।

ঙ. অনুবাদ কর্ম

মুসলিম উম্মাহর দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ রয়েছে, এমন ভিনদেশি বিভিন্ন উপকারী ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই নিজ দেশের ভাষায় অনূদিত হবে। কারণ, মুসলিম তো সব ধরনের সংকীর্ণতা পরিহার করে জ্ঞানের সকল ঝর্ণা থেকেই পান করবে।

বিখ্যাত তাবেয়ি সাইদ বিন আবি বুরদা বলেন, (আমাদের সময়ে) এ কথাটি বলা হতো:

الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ يَأْخُذُهَا إِذَا وَجَدَهَا

'জ্ঞান হলো মুমিনের হারানো সম্পদ। যখনই তা খুঁজে পাবে, তখনই গ্রহণ করবে। ' -৫৩৮. মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা ৭/২৪০, হা. নং ৩৫৬৮১ (মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ)- হাদিসটি সহিহ

চ. দায়ি প্রেরণ

দায়িগণ বিভিন্ন বসতিতে গিয়ে মানুষের মধ্যে ইসলাম প্রচার করবেন, মানুষের মধ্যে ইসলামি দাওয়াত ছড়িয়ে দেবেন, তাদের ইসলামের দিকে আহ্বান করবেন, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করবেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞

'আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা আহ্বান জানাবে সৎকর্মের প্রতি, নির্দেশ দেবে ভালো কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে। আর তারাই হলো সফলকাম। '(সুরা আলি ইমরান: ১০৪)

উপরে আমরা যে সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম, পরিপূর্ণভাবে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে একক কোনো ব্যক্তি বা ক্ষুদ্র কোনো জামাআতের পক্ষে এ সকল পদক্ষেপ পুরোপুরিভাবে সম্পাদন করা সম্ভব নয়। কারণ, দুষ্কৃতিকারী ও ইসলামবিদ্বেষীর পক্ষ থেকে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে নানা বাধার সম্মুখীন হতে হয়। আর এ সকল বাধা প্রতিহত করার জন্য শক্তি ও সামর্থ্যের প্রয়োজন, যা কেবল একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব। কোনো ব্যক্তি বা ক্ষুদ্র কোনো জামাআতের পক্ষে তা প্রয়োগ করা খুবই কঠিন।

<u>রেফারেন্স:</u>

•বই-ইসলামী জীবনব্যবস্থা,হিউম্যান বিয়িং,চিন্তাযুদ্ধ,সংশয়বাদী,চিন্তাযুদ্ধ,আয়নাঘর,ডাবল স্টান্ডার্ড, সেকুলারিজমের ইসলামিকরণ ও অন্যান্য।

•কোর্স-আসিফ আদনানের(হাফি.) "পাশ্চাত্যবাদ কোর্স"

•আসিফ আদনান (হাফি.) ও ডা.শামসুল আরেফীন (হাফি.) এর ওয়েবসাইটের আর্টিকেলসমূহ ও অন্যান্য।

•অনলাইনের নানা লিখা ও লেকচারসমূহ।